উপনিষদের কথা

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি, এস, সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মূল্য— তিন টাকা
সাড়ে তিন টাকা (বাঁধাই)

প্রিণ্টার
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশব সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মুখবন্ধ

"উপনিষদের কথা" পুস্তকাকারে হইল। ১৩৪৬-৪৮ সনে ইহা প্রবন্ধাকারে "শিবম্" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আশাকরি শিক্ষানায়কগণ স্কুল পাঠ্যরূপে ইহা নির্ব্বাচিত করিবেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বালঘাতিনী পুতনার কার্য্য সাধন করিতেছে। পুতনা সুদৃশ্যা, হাবভাব বিলাসময়ী চমৎ-কারিণী মনোরমা বটে, কিন্তু বিষপূর্ণদেহা, বাল কৃষ্ণকে বিষপান করাইয়া হত্যা করিতে প্রবৃত্ত। এ দৃশ্য দর্শনে জাতির অনিষ্টপাত শঙ্কায় গ্রন্থকার সুকুমার-সরলমতি বালকগণের শুভবুদ্ধি উন্মেষের জন্য সরল ভাষায় ভাবগম্ভীর উপনিষদের রহস্য গল্পচ্ছলে রচনা করিয়াছেন।

বেদ আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ; বেদে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইটী কাণ্ড আছে। সংহিতাংশে মন্ত্রভাগ উহাতে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড, ব্রাহ্মণাংশে উপনিষৎ জ্ঞান কাণ্ড। যাহাদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বোধ নাই তাহারা কাণ্ডজ্ঞানহীন নরপশু এই নিন্দা বাক্য অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উপনিষদকে বেদান্ত কহে—উহা অধ্যাত্মবিদ্যার প্রকাশক। **'আত্মানং বিদ্ধি', "ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব" "আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"** নিজকে চেনো, নিজকে জানিতে ইচ্ছা কর, নিজ বিষয়ক উপদেশ শোনো, ভাবো, চিন্তন কর, ইহাই বেদান্তের সারোপদেশ। বেদান্ত একথা বলেন না—তুমি অন্ধ হইয়া আমার অনুসরণ কর; পরন্তু যুক্তি ও অনুভূতিবলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ কর। এইহেতু জনক-যাজ্ঞবল্ক, যাজ্ঞবল্ক-মৈত্রেয়ী, যাজ্ঞবল্ক-গার্গি ও উদ্দালক শ্বেতকেতু সংবাদ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা গ্রন্থ মধ্যে উত্তমরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে। অল্পবুদ্ধি ও তর্কশ্রবণ চিত্তকে সুস্থ করিবার পক্ষে

এই প্রণালী উপাদেয়। উপনিষদের অমোঘ বাণী মানবাত্মায় বলসঞ্চার করে, প্রজ্ঞার বৃদ্ধি করে। মানুষকে স্বাবলম্বী বীর্য্যবান ও নির্ভীক করে। নত মেরুদণ্ডকে সরল করে; ক্ষাত্রভাবের উদ্বোধন করে। জন্মমৃত্যু রহিত শাশ্বত সত্তার প্রতি দৃষ্টি সংপ্রসারিত করিয়া মহত্তর সত্তার সঙ্গে ঐক্য সাধন করে। প্রাচীন যুগে অপ্রবুদ্ধ বালকেও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইতো। দ্বিমাসোর্দ্ধসপ্তমবৎসরে ব্রাহ্মণ কুমার উপনয়নে গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুসেবা দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া বেদান্ত জ্ঞান লাভ করিত। "বালা অদূষিত ধিয়ঃ" বালকের চিত্তে বিষয়ানুরাগ বা দ্বেষ ভাব নাই এজন্য প্রহ্লাদ বালকগণকেও তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। মাতৃগর্ভস্থ শিশু প্রহ্লাদ মাতাকে লক্ষ্য করিয়া নারদের জ্ঞানোপদেশে তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। কুমার বয়সেই নচিকেতা যমরাজ হইতে আত্মবিদ্যা লাভ করেন। শ্বেতকেতুও বাল্য কালে পিতা উদ্দালক হইতে জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—মদালসা তাহার শিশু পুত্রগণকে স্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ করিতেন—

শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি,
সংসার মায়া পরিবর্জ্জিতোঽসি।
সংসার স্বপ্নং ত্যজ মোহনিদ্রাং,
মদালসা পুত্র মুবাচ চৈবং ॥

হে পুত্র! তুমি শুদ্ধবুদ্ধ নিরঞ্জন স্বরূপ। সংসারের মায়া, দুঃখ, কষ্ট, কাম, ক্রোধ তোমাতে নাই। এই সংসার স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী—মোহরাত্রি মাত্র।

এই সব উপাখ্যানে বালকও জ্ঞানোপদেশের পাত্র দেখা যায়। বালকগণই জাতির ভবিষ্যৎ। তাহারা জ্ঞানে, কর্ম্মে, সেবায় প্রবীণ হইলেই দেশের মঙ্গল। বর্ত্তমান যুগে কুসাহিত্যের বহুল প্রচার। সুকুমার মতি বালকগণ ইহা অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভ্রষ্ট হইয়া

বিলাসী ও কামাচারী হইয়া পরিতেছে। ঈশ্বর, ধর্ম্ম, পরলোকে অবিশ্বাসী হইতেছে। যে জাতির শিশুগণের এই অবস্থা ঘটে সে জাতির উন্নতি কোথায়? শৈশবে নিদ্রাভঙ্গে পিতার সঙ্গে যে শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম—তাহা এক্ষণেও স্মরণ আছে—

অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽস্মি নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

মনে হয় এই শ্লোকই আমার জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। গ্রন্থকার লোকহিতৈষণায় প্রবৃত্ত হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হউক।

অলমিতি—স্বামী প্রেমানন্দ গিরি

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	/০—৸০
উপনিষদের কথা	১— ৯০
শ্বেতকেতুর উপাখ্যান	১—১০০
নচিকেতার উপাখ্যান	১—১৩৫
পরিশিষ্ট	১৩৬

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে প্রকাশিত—

সদাচার ও স্তোত্রমালা ।০ মহাপুরুষ বাণী ॥০ স্বামী শিষ্য প্রসঙ্গ (১ম) ।৵০ কুম্ভমেলা বা কুম্ভযোগ ৴০ গুরুগীতা ৷৹০

মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি বিরচিত—উপাসনা ১৲, বৈদিক যুগে ১৲, আধ্যাত্ম-বিদ্যা ॥০, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী ।০ বেদান্ত সোপান ১৲ উপনিষদ রহস্য ॥০

বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি—উপনিষদের কথা ৩॥০

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি—শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের ইংরাজি জীবনী ১॥০ ভোলানন্দ চরিতামৃত ২॥০

স্বামী সনকানন্দ—আত্ম বিচার ॥৵০

অমরেন্দ্র রায়—স্বদেশ মঙ্গল ১৲ চণ্ডীদাস ১।০

নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি সম্পাদিত—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১০৲

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম—৪র্থ স্কন্ধ ১০৲ শ্রীহরি সাধক-কণ্ঠহার ১।০
(মূল, বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমেত)

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বক্তৃতা ও উপদেশ ১।০ আশাবতীর উপাখ্যান ।৵০, যোগসাধনা ।৵০ নিত্যকর্ম্ম বিধি ।৵০

জগবন্ধু মৈত্র—করুণাকণা ॥৵০ প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ ৩৲

সারদা বন্দো—বাবা গম্ভীর নাথ ।৵০ **সুরজা দেবী**—শ্রীশ্রীগৌরী মা ২৲

রত্নমালা দেবী—ভাগবতলীলামৃত ২৲

অজিতমল্লিক—উপাসনা ১॥০

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি সম্পাদিত ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি কর্ত্তৃক অনুদিত
ঈশকেনকঠোপনিষদ—(মূল বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমেত) ৩৲

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

উপনিষদের কথা।

তোমরা নিশ্চয়ই ঠাকুরমার কাছে কত রাক্ষস-রাক্ষসী, কত দেবতা অসুরদের যুদ্ধ, কত বড় বড় রাজার গল্প শুনেছ। আজ তোমাদিগকে উপনিষদের কথা শুনাবো। তোমরা যে সব গল্প শুনেছ, উপনিষদের কথা ঠিক সেরূপ নয়। উপনিষদেও রাক্ষস-রাক্ষসীর কথা আছে; ভূত প্রেতের কথা আছে; দেবতা অসুরের যুদ্ধের কথা আছে; কত রাজা, কত মুনি ঋষির কথা আছে; কিন্তু সে সব কথা অন্য ধরণের। তোমাদের দাদামহাশয় তাঁর গল্পের ঝুলি থেকে একটি গল্প বা'র ক'রে তোমাদিগকে শুনিয়েছেন, আমিও সেইরূপ উপনিষদ্ কথার ঝুলি থেকে একে একে বা'র করে তোমাদিগকে উপনিষদের কথা শুনাবো। এতদিন তোমরা ঠাকুরমার কাছে যে সব গল্প শুনে এসেছ, সেগুলি সত্য নয়। কিন্তু আমি তোমাদিগকে উপনিষদের যে সব গল্প শুনাবো সেগুলি মিথ্যা নয়, সেই গল্পগুলির মূলে রয়েছে এক চিরন্তন সত্য। এখন মিথ্যা কাকে বলে আর সত্যই বা কি, সেটা তোমাদের বুঝতে হ'বে; তাহলে কোনটা সত্য গল্প আর কোনটাই বা মিথ্যা তা' তোমরা বেশ বুঝতে পারবে। আমি যদি রামকে জিজ্ঞাসা করি "তোমার ঝুলিতে কটা আম আছে?' রাম যদি বলে আমার ঝুলিতে দশটা আম," কিন্তু শেষে যদি দেখা যায় রামের ঝুলিতে একটা আমও নাই, তাহলে আমরা বলি যে রাম মিথ্যা কথা বলেছে। যে জিনিসটা রামের ঝুলিতে কোন কালেই নাই, রাম সেই জিনিষটা স্বীকার করায় মিথ্যা কথা বলেছে, মিথ্যা আচরণ করেছে। আবার যদি রামকে জিজ্ঞাসা করি "রাম তোমার হাতে চক্‌চক্ ক'রছে, ওটা কি?" রাম যদি বলে "এটা একটা টাকা"। কিন্তু শেষে যদি

দেখা যায় রামের হাতে যে জিনিষটা চক্‌চক্ কর্‌ছিলো সেটা টাকা নয়, সেটা একখানা কাচের গোল টুকরো, তাহলে আমরা ব'লে থাকি রাম মিথ্যাবাদী। যে জিনিষটা যা নয়, সেই জিনিষটাকে তাই বলায় অর্থাৎ যে জিনিষটা টাকা নয়, শুধু একখানা গোল কাচ, রাম সেই গোল কাচকে টাকা বলায় মিথ্যা কথা বলেছে, মিথ্যা আচরণ করেছে। এখন মিথ্যার মানে বুঝতে পাচ্ছ। মিথ্যার একটা মানে হ'চ্ছে অসৎ অর্থাৎ যা কোন কালেই নেই, যেমন রামের ঝুলিতে কোন কালেই আম ছিল না। যেমন আমরা বলে থাকি আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি। আকাশে কিছু ফুল ফোটে না, যে স্ত্রীলোক বাঁজা তার সন্তান হয় না, খরগোসের কপালে শিং ওঠে না; কিন্তু কোন কিছুকে অসম্ভব ব'লে ব'লতে হ'লে, আমরা ঐ শব্দগুলি ব্যবহার ক'রে থাকি। সুতরাং মিথ্যা সেই জিনিষ যা তোমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাওনা, কাণ দিয়ে শুনতে পাও না, নাক দিয়ে তার ঘ্রাণ নিতে পার না, জিহ্বা দিয়ে তার কোন আস্বাদ পাও না, ত্বক দিয়ে তাকে স্পর্শ ক'রতে পার না। হাত দিয়ে তাকে ধ'রতে পার না, যে জিনিষটা একেবারে নাই সে জিনিষটাকে কেমন করে' দেখতে শুনতে পাবে? তাহলে বুঝতে পারছ যে মিথ্যার একটা মানে অসৎ। মিথ্যার আর একটা মানে হ'চ্ছে একটা জিনিষই আর একটা জিনিষের মত কোন সময়ে দেখায় কিন্তু বাস্তবিক সে জিনিষটা তা নয় যেমন রামের হাতের চক্‌চকে গোল কাচের টুকরা টাকার মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু বাস্তবিক সে টাকা নয়। লোকে অস্পষ্ট আলোকে যেমন একগাছা দড়িকে সাপ বলে মনে করে কিন্তু যখন আলো নিয়ে কাছে যায় তখন দেখতে পায়, যাকে সে সাপ বলে ঠিক করেছিল সেটা সাপ নয়, একগাছা দড়ি, সাপটা মিথ্যা; তাহলে দেখতে পাচ্ছ মিথ্যা তাকে বলি যার বাধ হ'য়ে যায়। অর্থাৎ যে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বস্তু আরোপিত হয় এবং তাকে ভাল করে দেখলে সেই

আরোপিত বস্তু আর দেখা যায় না। সেইজন্য আরোপিত বস্তুটী মিথ্যা। যেমন দড়িগাছটী আছে, সেই দড়িতে সাপ আরোপ করে সেই দড়িকে সাপ বলে মনে হয়, পরে ভাল করে দেখলে দড়িতে আর সাপ দেখা যায় না। সেইজন্য দড়িতে সাপ মিথ্যা, অসৎ; আর দড়ি হ'চ্চে সৎ। সৎ বা সত্য সেই বস্তু যা অখণ্ড, একরস, যার কোন বিকার হয় না। সত্য বস্তুটী মিথ্যার উল্টো। একরস কাকে বলে জান? যদি এক গেলাস জলে একখণ্ড লবণ ফেলে দাও, তারপর নল দিয়ে সেই গেলাসের নীচের জল পান করে দেখ, মধ্যের জল পান করে দেখ, উপরের জল পান করে দেখ, সব সময়েই দেখবে জল লোণা। লোণা যা তা লোণা হয়েই আছে, সেই রকম যা সত্য তা সকল সময়েই সত্য, সে এক সময় একরূপ আর অন্য সময় অন্যরূপ হয় না। তোমরা যে বলে থাক ঘট আছে, পট আছে, মানুষ আছে, গরু আছে, আকাশ আছে, বাতাস আছে; এই যে 'আছে' ক'রে সব জিনিষ বাস্তব ব'লে মনে করচ, তা সত্য নয়, কিন্তু সত্যের মত বলে বোধ হচ্চে। কারণ ঐ সব বস্তু সব সময় একরস থাকে না। মিনিটে মিনিটে তারা রূপ বদ্‌লাচ্চে। এখন সত্য ও মিথ্যার মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের হয়েছে। এইবার তোমাদিগের নিকট উপনিষদের কথা আরম্ভ ক'রব। প্রথমে তোমাদিগকে বৃহদারণ্যকোপনিষেদের কথা বলতে আরম্ভ করব। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌এ তিনটে শব্দ আছে, বৃহৎ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্। বৃহৎ মানে বড়। যতগুলি উপনিষৎ আছে তার মধ্যে এই উপনিষদ্‌খানি আকারে বড় সেই জন্য এই উপনিষৎকে বৃহৎ বলে। আর মুনি-ঋষিগণ অরণ্যে শিষ্যদিগকে এই উপনিষদের কথা উপদেশ করতেন, সেই জন্য এই উপনিসৎকে আরণ্যক বলে। আমি যেমন এই ভোগ-বিলাসবহুল, কোলাহলময় কলিকাতা শহরে বসে তোমাদিগকে এই উপনিষদের কথা বলচি; কিন্তু পূর্ব্বে ঋষিগণ দেশ

কাল-পাত্র বুঝে উপনিষদের কথা বলতেন। ঋষি মানে তোমরা এটা বুঝ না যে লম্বা লম্বা দাড়ি, লম্বা লম্বা নখ, মাথায় দীর্ঘজটা, সমস্ত শরীর ভস্মমাখা, আহার করেন শুধু ফল আর মূল, পান করেন শুধু জল আর বায়ু, আর ব'সে থাকেন চক্ষু বুজে কখন গাছতলায় কখন পর্ব্বতগুহায়। ঋষিরা ওসবের কাছ দিয়েও যেতেন না। তাঁহারা ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ। তাঁহাদের স্ত্রী ছিল, পুত্র কন্যা ছিল, গরু ছিল, ঘোড়া ছিল, ধনসম্পত্তি ছিল, আর ছিল বহু শিষ্য। তাঁরা ঘি খেতেন, দুধ খেতেন, আর যাঁরা আমার মতন অতিবৃদ্ধ তাঁরা গান্ধীজীর মতন চারি সের খাঁটী দুগ্ধ এবং ভাল ভাল তাজা ফলের রস খেতেন। তাঁরা অনেকে বাস করতেন অরণ্যে। কিন্তু সে অরণ্য মানে কণ্টক বন নয়। সে অরণ্য মানে তপোবন। সে বন দেবদারু প্রভৃতি ভাল ভাল বৃক্ষ এবং ফল ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সহরের কোলাহল ছিল না। সে অরণ্য শান্ত ও উপদ্রবহীন ছিল। সে বন ছিল তাঁদের তপোবন। সেই বনে তাঁহারা তপস্যা করতেন, যজ্ঞ করতেন আর শিষ্যদিগকে বেদ পড়াতেন এবং যাহাতে তাহারা আদর্শ গৃহী হ'তে পারে তাহাদিগকে সেই শিক্ষা দিতেন। এই সব ঋষিদিগের নিকট বৈরাগ্যবান্ বহু গৃহস্থও সত্য কি তাহা জানবার জন্য গমন করতেন। নির্জ্জনতার একটা মনভুলান শক্তি আছে, অরণ্যে কোলাহল নেই, জনতা নেই, মটরগাড়ী নেই, ট্রাম গাড়ী নেই; না আছে ধুলো, না আছে ধোঁয়া। নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল বায়ু, আর নির্ম্মল ছিল সেই অরণ্যবাসীদের মন। নির্ম্মলমনা ঋষিগণ তাঁদের নির্ম্মলচিত্ত শিষ্যদিগকে যাহা উপদেশ করতেন, সেই উপদেশ সমূহ শিষ্যদিগের নির্ম্মলচিত্তে ফলপ্রসূ হ'ত। এখন উপনিষৎ কাকে বলে সেটা একবার তোমাদের শোনা দরকার। উপনিষৎ এই কথাটায় উপ, নি আর সদ্ ধাতু এই তিনটে শব্দ আছে। 'উপ' মানে সমীপে,

আর 'নি' মানে নিশ্চয়, এবং সদ্ ধাতু মানে শিথিলী করণ ঢিলে করে দেওয়া, পাইয়ে দেওয়া, নিয়ে যাওয়া, নাশ করা। উপনিষৎ সেই বিদ্যা, যে বিদ্যা সংসাররবন্ধন শিথিল ক'রে দেয়, উপনিষৎ, সেই বিদ্যা যে মানুষকে পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছে দেয়, সেই বিদ্যা হচ্চে উপনিষৎ যাহা মানুষের সমস্ত পাপ নষ্ট করে এবং তাহাকে নিরতিশয় আনন্দলাভের যোগ্য ক'রে দেয়। উপনিষৎ সেই বিদ্যা যাহা নিঃসন্দেহরূপে সংসারবন্ধন ছিন্ন ক'রে মানুষকে এরূপ শক্তি, জ্ঞান আর আনন্দ প্রদান করে যাহাতে সে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবন সফল করতে সমর্থ হয়। যে গ্রন্থে এই বিদ্যার উপদেশ করে সেই গ্রন্থকেও উপনিষৎ বলে। এখন এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক রাজার গল্প তোমাদিগকে ব'লব। সেই রাজার নাম হ'চ্চে জনক। তিনি মিথিলাদেশের রাজা ছিলেন। মিথিলাদেশের রাজা জনকের অতুল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু সেকালের রাজারা কেবল নিজে ঐশ্বর্য্য ভোগ করতেন না। সমাজের সকলকে তাঁরা সেই ঐশ্বর্য্য ভাগ করে দিতেন। একদিন রাজা জনক তাঁর মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত অশ্বলমুনিকে ডেকে ব'ললেন "কুরুপাঞ্চালদেশের ব্রাহ্মণগণের নিকট নিমন্ত্রন-পত্র পাঠিয়ে দিন। আমার এই রাজধানী মিথিলানগরে ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষিদের এক মহা-সভা হবে। আর একটা কাজ আপনারা করুন, সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ ক'রে সেই সভাগৃহের কাছে এক হাজার সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী ও বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট বৃষ রেখে দিন এবং তাদের শিং সোণা দিয়ে মুড়ে দিন।" রাজার হুকুম সকলেই অবনতশিরে পালন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হ'ল।

বিদেহাধিপতি জনক সভা আহ্বান করেছেন, রাজসভা, সুতরাং রাজার ভাণ্ডারের মণিমুক্তা আর মূল্যবান আস্তরণে সভাকে সুশোভিতা

করা হ'য়েছে। দ্বারদেশে সুন্দর পরিচ্ছদে প্রতিহারী দণ্ডায়মান। সিংহাসনে স্বয়ং বিদেহরাজ জনক সমাসীন। জনকের আশ্রিত বেদজ্ঞ ঋত্বিক অশ্বলও সেই সভায় উপস্থিত আছেন; আর সেই সভা অলঙ্কৃত ক'রে উপবিষ্ট আছেন কুরুপাঞ্চালদেশীয় বেদবিদ্, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ। এই সভা কেন আহুত হয়েছে? সমাজের দরিদ্র প্রজাদিগের উপর পুনরায় রাজকর বসাবার জন্যই কি এই সভার আয়োজন কিম্বা সর্ব্বসাধারণকে রাজার আদেশ শ্রবণ করাবার জন্যই এই সভার উদ্যোগ? কে জানে কি জন্য এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। প্রজাশোষণই যদি জনকের উদ্দেশ্য হ'ত, তা হলে সেই সভার একধারে সবল সুস্থকায়, সবৎসা সহস্র দুগ্ধবতী গাভীই বা সজ্জিত ক'রে রাখবেন কেন? শুধু তাই নয়, সেই এক এক গাভীর শৃঙ্গগুলিও সুবর্ণমণ্ডিত ক'রে দিয়েছেন। এ-ত সভা নয়, এক যে বিদেহরাজের বহুদক্ষিণ যজ্ঞ। এই বহুদক্ষিণ যজ্ঞে সশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সকলেই নীরবে সমাসীন। কি উদ্দেশ্যে যে কুরুপাঞ্চালদেশীয় বড় বড় বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করা হয়েছে তাহা কেহই জানেন না। সমগ্র বিদেহ রাজ্যের অধিপতির আবার কিসের অভাব? যাঁর হাতী শালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডার রত্নপূর্ণ, পুরী অগণিত সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত, ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়; এ হেন সম্রাটের আবার অভাব কি? কিন্তু সেকাল ত আর একালের মত ছিল না। তখন কি রাজা কি প্রজা কেহই ভোগকে পরম পুরুষার্থ ব'লে মনে করতেন না। ধনরত্নই বল, আর দাসদাসী পুত্র মিত্র সৈন্যসামন্তই বল, কোনটাই মানবের হৃদয়ের সবটা অধিকার করতে পারত না। সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েও মানুষ ব'লত "ততঃ কিম্?", রাজা জনকেরও হয়েছিল তাই। সেইজন্য তিনি সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করে বললেন "আপনারা সকলেই আমার পূজনীয়, আপনারা সকলেই বেদবিদ্; কিন্তু আপনাদিগের

মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, তিনি আমার প্রদত্ত স্বর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট এই সহস্র গাভী স্বগৃহে লইয়া যান।” জনকের কথায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই গাভীগুলি নিয়ে যেতে অগ্রসর হলেন না॥ সভা নীরব। ব্রাহ্মণদিগকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্য দাঁড়িয়ে উঠলেন, আর তাঁর শিষ্যের দিকে চেয়ে বললেন “ওহে সামশ্রব, যাও ঐ হাজার গাভী নিয়ে আশ্রমে চলে যাও।” শিষ্যও গুরুর পরম ভক্ত কিনা, তাই আর কাল বিলম্ব না করে গাভীগুলি খুলে নিয়ে আশ্রমের দিকে হাঁকিয়ে চললেন। তখন হ’ল ব্রাহ্মণদের হুঁস্। সভাস্থ ব্রাহ্মণদের তখন হ’ল ঈর্ষা, তারা একেবারে ‘রা’ ‘রা’ করে, তাসঠকে যাজ্ঞবল্ক্যকে ঘিরে দাঁড়ালেন, আর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুললেন! জনকের আশ্রিত হোতা অশ্বল রেগে যাজ্ঞবল্ক্যকে বলে উঠলেন “বড় যে গাভীগুলি নিয়ে যাওয়া হল, তুমি কি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমরা কি আর বেদ পড়িনি, না বেদ জানিনা, একমাত্র তুমিই কি বেদবিদ্ ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষ হয়ে বসেছ নাকি”? যাজ্ঞবল্ক্য তখন একটু ঈষৎ হেসে অশ্বলকে বললেন, “ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষকে আমরা নমস্কার করি। আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরের মূর্খত নই। গাভীগুলির যে আমার দরকার”। এই কথা শুনে অশ্বল ত রেগে আগুন; তিনি বললেন “ওসব বাজে কথা রেখে দাও, তুমি যে আমাদের চাইতে বড়, তা আগে প্রমাণ কর। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।” তখন যাজ্ঞবল্ক্য ও অশ্বলের মধ্যে বাক্ যুদ্ধ আরম্ভ হ’ল। বাক্ যুদ্ধ আরম্ভ হ’ল। অশ্বল প্রশ্ন করেন, আর যাজ্ঞবল্ক্য দেন তার উত্তর! অশ্বল বললেন “ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কেমন ব্রহ্মেষ্ঠি পুরুষ তা একবার দেখি, আচ্ছা বল দেখি, এই যা কিছু দেখচি, যা কিছু অনুভব কচ্চি, সব জগৎটাই মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত, মৃত্যুর বশে; এমন জিনিষ জন্মেনা, যা না মরে; তা বল দেখি ওহে বিদ্বান্ ব্রহ্মেষ্ঠি পুরুষ, বলি

বল দেখি, এমন কোন উপায়, এমন কোন সাধন আছে কি যা দ্বারা যজমান এই মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হ'তে পারে?" অশ্বলের এই কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন "শোনো অশ্বল, শোনো মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি হ'বার উপায় আছে। সে উপায়টী হ'চ্চে হোতা ঋত্বিক অগ্নি, বাক্।" যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে অশ্বল ত হেসে খুন। বল্লেন 'পণ্ডিত, এই বাহে আগে কহ আর' অমন ধারা তিন চারটে শব্দ উচ্চারণ করলে হবে না, সভাস্থ সকলকে বুঝিয়ে বল।' যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলতে আরম্ভ করলেন—তিনি বল্লেন "আমি আগে যা বলেছি তাই ঠিক, পৃথিবীতে যে সব জিনিষ আমরা দেখতে পাই, সেগুলি হ'চ্চে ভৌতিক। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি ভূত অল্প, বেশী এক সঙ্গে মিশে পৃথিবীর যত কিছু পদার্থ তৈয়ারী করেছে। সেইজন্য পৃথিবীস্থ সব বস্তুকেই ভৌতিক পদার্থ বলে। আর আকাশে, অন্তরিক্ষে, যে সব বস্তু দেখা যায় বা অনুভব করা যায় যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি সেগুলি হ'চ্চে দৈব। 'দৈব' কথাটা দিব্ ধাতু থেকে হয়েছে, দিব্ ধাতুর মানে প্রকাশ, দীপ্তি পাওয়া। সেই জন্য উজ্জ্বল চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে দৈবিক বস্তু বলে। আর আমাদের এই যে শরীর, অঙ্গ, মন, বাক্ প্রভৃতি ইহারা আমাদের নিজ, এইজন্য ইহাদিগকে আত্মিক বলে। আর 'অধি' এই কথার মানে হ'চ্চে সম্বন্ধীয়। যার সম্বন্ধে বলতে হ'বে সেই কথাটীর পূর্ব্বে 'অধি' এই পদটী দিতে হয় যেমন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। **আধিভৌতিক** মানে **পৃথিবীস্থ বস্তু বিষয়ক, আধিদৈবিক মানে আকাশ বা অন্তরিক্ষস্থ পদার্থ সম্বন্ধীয়,** আর **আধ্যাত্মিক মানে হ'চ্চে শরীর মন প্রাণ সম্বন্ধীয়।** আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই তিনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অন্তরিক্ষে যাহা অধিদৈব অগ্নি, শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক

বাক্। অন্তরিক্ষে যাহা অধিদৈব সূর্য্য, শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক চক্ষু, অন্তরিক্ষে যাহা অধিদৈব বায়ু, শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক প্রাণ, অন্তরিক্ষে যাহা অধিদৈব চন্দ্র, শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক মন। অশ্বল, এই যে কাঠে কাঠে ঘ'সে সমিধ্ অর্থাৎ শুকনো পলাশকাঠ দিয়ে আগুন জালিয়ে, ঘি ঢেলে যজ্ঞ করা হয়, সে যজ্ঞের মানে হ'চ্চে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক আর আধিদৈবিক এই তিনের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যে একটা সাধারণ তন্ত্রী আছে, সেই সম্বন্ধটাকে হৃদয়ে অনুভব করা, সেই সাধারণ তন্ত্রীতে একটা ঝঙ্কার তুলে দেওয়া। যজ্ঞের সময় যজমানের দরকার হয় একটা বেদি আর সেই বেদিতে প্রজ্জলিত অগ্নি, আর দরকার হয় হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মার। কোন্ মন্ত্রে কোন্ দৈবী শক্তিকে আহ্বান করে শরীরে সেই দৈবশক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে হোতা সেই মন্ত্র ঠিক করে দেন, আর অধ্বর্য্যু সেই মন্ত্র পাঠ করে দেন আহুতি, এবং উদ্গাতা যিনি তিনি উচ্চৈঃস্বরে সেই মন্ত্র গান করতে থাকেন, আর যজ্ঞ যাতে সুসম্পন্ন হয়, যজ্ঞের কোন অঙ্গহানি না হয় সে বিষয়ে মন রাখেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই হলেন যজ্ঞের রক্ষক।

এই জগতে যতকিছু পদার্থ আছে সবই নশ্বর, সবই অনিত্য, সকলই মরণশীল। সমস্ত জগৎ মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত; সবই মৃত্যুর বশে। যে উপায়ে মৃত্যুর বশ থেকে, মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই উপায়টী, সেই সাধনটী হ'চ্ছে যজ্ঞ এবং যজ্ঞের হোতা অগ্নি এবং বাক্।— যজমানের, সাধকের সম্মুখস্থিত বেদিতে প্রজ্জলিত অগ্নি, আধিভৌতিক অগ্নি, এই অগ্নি হচ্চেন সাধকের দ্রব্যময় যজ্ঞের হোতা। সাধক যা কিছু আধি-ভৌতিক দ্রব্য নিজের ইষ্টের নিকট নিবেদন করেন এবং ইষ্টের নিকট হইতে প্রার্থনা করেন, এই অগ্নি সাধক বা যজমানপ্রদত্ত সেই সেই দ্রব্য সাধকের ইষ্টদেবতার নিকট নিয়ে যান এবং ইষ্টদেবতার নিকট থেকে সাধকের অভীষ্ট ফল সাধককে প্রদান করেন। ছন্দে গীতমন্ত্র সাধকের অন্তঃশরীরে

আধ্যাত্মিক অগ্নির উদ্বোধন করে। অন্তঃ শরীরে এই আধ্যাত্মিক অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হ'লে আর নির্ব্বাপিত হয় না। এই অগ্নি শরীরের নিম্নদেশ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে মস্তকের উপরিভাগ ভেদ্ ক'রে বহু উর্দ্ধে অন্তরিক্ষে উত্থিত হয়। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, অধঃ উর্দ্ধ সবদিক এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হ'য়ে যায়, যজমানের শরীরের জ্ঞান তখন থাকে না। যজমান তখন নিজেকে সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন করেন। যজমানের এই আধ্যাত্মিক অগ্নি যজমানের অন্তঃযজ্ঞের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। যজমানের শরীর, মন, প্রাণ সবকে পবিত্র ক'রে যজমানের সুপ্ত দৈবী শক্তিগুলিকে উদ্বোধিত করেন। যে মন্ত্রের দ্বারা অন্তঃশরীরে এই জ্যোতির্ম্ময় অগ্নির উন্মেষ হয়, সেই মন্ত্রকে বলে দৈবী বাক্। অগ্নিই তখন এই দৈবী বাক্‌রূপে প্রকাশিত হন এবং সাধকের অজ্ঞান, দেহাভিমান দূর ক'রে সাধককে অমরত্ব প্রদান করেন। তাই তোমাকে বলেছি, অশ্বল, যে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হবার উপায় হ'চ্চে অগ্নি এবং বাক্। এই অগ্নিই হচ্চেন পুরোহিত ঋত্বিক ; অগ্নিই হ'চ্চেন দৈবীশক্তি উদ্বোধনকারী হোতা ; আর দৈবী বাক্ হ'চ্চে অগ্নিরই অন্যতম রূপ।"

অশ্বল কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি আবার জোর গলায় বলে উঠলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য। বলি আর একটী প্রশ্নের উত্তর দাও দিকি, যা কিছু এই জগৎ ব'লে জানচি সবই দিন আর রাত্রির দ্বারা ব্যাপ্ত, দিন আর রাত্রির দ্বারা আক্রান্ত, জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা দিন আর রাতের বশে না আছে। আচ্ছা এখন বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, এমন কোন উপায়, এমন কোন সাধন আছে কি, যে উপায় দ্বারা—সাধনের বলে যজমান বা সাধক এই অহোরাত্রের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে—এই দিন রাত্রের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে।"

অশ্বলের কথায় যাজ্ঞবল্ক্য একটু হেসে বললেন, "অশ্বল, তোমাকে

ত পূর্ব্বেই মৃত্যুর কবল থেকে যে উপায়ে মুক্ত হওয়া যায় তা বলেছি। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যজ্ঞই হচ্ছে একমাত্র উপায়, একমাত্র সাধন যা যজমানকে মুক্তি দিতে সমর্থ। মানুষের ভেতর সুপ্ত রয়েছে এমন একটা শক্তি, যে শক্তিকে যদি একবার জাগান যায়, তাহলে সেই জাগ্রত শক্তিই তাকে ক্রমে ক্রমে দেবত্বে উন্নীত করে এবং মৃত্যুর কবল থেকে—অহোরাত্ররূপী কালের হাত হ'তে মুক্ত ক'রে অমরত্ব প্রদান করে। এই শক্তিই হ'চ্ছে অগ্নি। যজ্ঞের দ্বারাই এই অগ্নিকে জাগ্রত করা হয়। দীক্ষণীয় ইষ্টিতে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যজমানের অন্তঃশরীরে এই অগ্নিকে জাগ্রত করা হয়। তুমি ত জান অশ্বল দীক্ষণীয় ইষ্টিতে যখন বলা হয়—

অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।
যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ॥
অগ্নিশ্চ বিষ্ণোতপ উত্তমং মহোদীক্ষা পালায়বনতং শক্র।
বিশ্বৈ দেবৈর্যাজ্ঞিয়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ যজমানায়ধত্তম্॥

(আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৪।২।১)

দৈবীশক্তির বিকাশের প্রথম উপায় হ'চ্ছে অন্তঃশরীরে এই অগ্নির উদ্বোধন। মূলাধার থেকে মস্তক ভেদ ক'রে এই অগ্নি উত্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই আকাশবৎ একটা ব্যাপ্তি অনুভূত হয়। তারপর দিব্য জ্যোতিতে সেই অন্তরাকাশ পূর্ণ হ'য়ে যায়, তারপর উদিত হন সূর্য্য। এই সূর্য্য প্রথমে রশ্মিযুক্ত, তারপর রশ্মিবিহীন। এই সূর্য্যের বিস্তৃত গোলক তিনবর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, প্রথমে রক্তবর্ণ, তারপর শ্বেতবর্ণ, তারপর কৃষ্ণবর্ণ। এই সূর্য্যকে অন্তশ্চক্ষু দিয়ে দেখা যায়। এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের উদয়ে অন্তর্জগৎ উদ্ভাসিত হয়, আর সেই সূর্য্যের তিনবর্ণ থেকে থর থর ক'রে আনন্দধারা প্রবাহিত হতে থাকে। কি দিবস, কি রাত্রি, সব সময়েই যজমান বা সাধক এই অন্তঃসূর্য্য দর্শন

করেন—তাঁর নিকট তখন দিন রাত ব'লে সময়ের বিভাগ থাকে না। তিনি পলকবিহীন স্থিরনেত্রে সূর্য্য হতে ক্ষরিত জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি অনুভব করেন, আর অনুভব করেন নিজের জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বব্যাপী রূপ। এই অন্তঃ সূর্য্যই হয় তখন তাঁর চক্ষু। তাই বলি তাঁর অন্তশ্চক্ষুই তখন অধ্বর্য্যুর কাজ করে, পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি অধ্বর্য্যুর কাজ হ'চ্ছে অনুচ্চস্বরে আহুতি প্রদান। তুমিত জান, অশ্বল, ঋষিগণ বলিয়া থাকেন "অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ-দোষাঃ" যাঁদের চিত্ত হ'তে সমস্ত মলিনতা সমস্ত পাপ দূর হ'য়ে গেছে সেই সব বিশুদ্ধচিত্ত, যতিগণ নিজ নিজ হৃদয়াকাশে পরমেশ্বরকে দর্শন ক'রে থাকেন। সেই পরমেশ্বর শুভ্র জ্যোতিস্বরূপ। যজমান সর্ব্বব্যাপি এই দিব্য জ্যোতিতে করেন আত্মনিবেদন, নিজের সবটা আহুতি দেন এই জ্যোতির্ম্ময় সৎস্বরূপ পরমেশ্বরে। তাই বলচি, অশ্বল, অহোরাত্র-রূপী কালের কবল হ'তে মুক্ত হবার উপায় হ'চ্ছে যজমানের অধ্বর্য্যুরূপ এই আধ্যাত্মিক চক্ষু এবং অধিদৈব সূর্য্য। অন্তশ্চক্ষুরূপে যজমানে যাহা আধ্যাত্মিক, অন্তঃসূর্য্যরূপে তাহাই আধিদৈবিক। দর্শ আর পূর্ণমাস যাগের কথা তোমাকে আর বলতে হবে না, অশ্বল। প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমাতে ত এই যাগ তুমি করে থাক। আমাদের বহিশ্চক্ষু মুদ্রিত করে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী সত্তার অনুভবই দর্শ যাগ, আর চোখ চেয়ে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদায় সেই সত্তার অনুভূতিই পূর্ণমাস ইষ্টি। এই দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ যাঁর সম্পন্ন হ'য়েছে, যাঁর অন্তঃশরীরে দিব্য চক্ষু ও জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই যজমানই মুক্ত হয়েছেন অহোরাত্ররূপী কালের কবল থেকে।"

অশ্বল কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর প্রাণে বড়ই আঘাত লেগেছে। হাজার, হাজারটা দুগ্ধবতী গাভী, তাতে আবার তাদের

সোনা দিয়ে মোড়ানো শিং। এই গাভীগুলি কিনা অশ্বলের চোখের সামনে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর আশ্রমে। জনক রাজার সভাপণ্ডিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বলের প্রাণে তা সইবে কেন?

তিনি আবার চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, ভারী যে ব্রহ্মিষ্ঠ বলে বড়াই করছ, বল দেখি আর একটা প্রশ্নের উত্তর। এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বপক্ষ ও অপরপক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা কবলিত; এখন বল দেখি যজমান কোন্ উপায়ে কোন্ সাধন বলে এই শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে পারে?"

যাজ্ঞবল্ক্যও দমিবার লোক নন। তিনি তিন চারটী ছোট্ট কথায় অশ্বলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন, 'ওহে অশ্বল, শোন শোন এই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের কবল হ'তে মুক্তির উপায় হ'চ্চে উদ্গাতা, ঋত্বিক্, বায়ু আর প্রাণ। অন্তরিক্ষে যাহা অধিদৈব বায়ু, যজমানে তাহা আধ্যাত্মিক প্রাণ। রজোগুণবহুলা শক্তিই প্রাণ। এই প্রাণকে ইষ্টদেবতাভিমুখী যজ্ঞদ্বারা এই প্রাণ সংযত হ'লে, স্থির হ'লে অভিব্যক্ত হন সোম, দিব্যজ্যোতির্ম্ময়রূপে যজমানের হৃদয়কে আহ্লাদিত আনন্দিত করেন চন্দ্র। এই আনন্দ পার্থিব অপর সব আনন্দ হ'তে নিবিড়তর, গভীরতর কিন্তু চন্দ্রের যেমন হ্রাস বৃদ্ধি আছে, এই আনন্দের সেইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ইহা প্রথমে স্থায়ী হ'তে চায় না। প্রায়ণীয় ইষ্টি, জ্যোতিষ্টোম, পশুযাগ ও সোম যাগ ক'রে এই আনন্দকে স্থায়ী করতে হয়, যজমানের সাধনের অবস্থায় নিমীলিতচক্ষু হইয়া ইষ্টের ধ্যান যেমন দর্শ বা অমাবস্যা যাগ এবং উন্মীলিতচক্ষু হইয়া সর্ব্বত্র ইষ্ট দর্শন যেরূপ পূর্ণমাস যাগ, সেইরূপ স্থির অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে আনন্দের অনুভূতিই হ'চ্চে প্রতিপৎ প্রভৃতি অপরাপর তিথিগুলি।

ঋক্ মন্ত্র আবার আধ্যাত্মিক রূপে প্রাণ, অপান ও ব্যান বায়ুরূপে অভিব্যক্ত। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ সংযত হ'লে অন্তঃশরীরে অগ্নি জাগ্রত হয়, এবং সেই অগ্নি ক্রমে ক্রমে অপর দৈবী শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ সংযত হ'লে, প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হলে, প্রাণময় জগতের উপর আধিপত্য করা যায়। এবং ইষ্টের নিকট আত্মনিবেদন রূপ যাজ্যা এবং ইষ্টের গুণকীর্ত্তনরূপ শস্যা মন্ত্র খুব ভালরূপে সম্পন্ন হ'লে যজমান অনির্ব্বচনীয় সুখলাভে সমর্থ হয়, এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরিক্ষ তিন লোকেই সে জয়ী হয়। সাধকের জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি বাড়ে, কিন্তু এসব ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হ'তে নেই। সাধক ভূঃ ভুবঃ স্বঃ; স্বর্গ মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ এই তিনলোকে যত কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, সমস্তই ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন ক'রে এবং মনকে সংযত ক'রে সুসমহিত হ'য়ে সন্ন্যাসরূপ যজ্ঞদ্বারা অমৃতত্ব লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হয়। এখন বুঝলে অশ্বল, যজ্ঞ দ্বারা কেমন ক'রে কালরূপী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে সাধক সোমরসরূপ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। প্রথমে দীক্ষা থেকে অর্থাৎ দীক্ষণীয় ইষ্টি থেকে আর সোমযাগ পর্য্যন্ত এই যে যজ্ঞ কর্ম্ম, ইহা সাধকের দিব্য জন্মলাভ হ'তে অমৃতত্বরূপ স্বস্বরূপের অনুভূতির একটা ইতিহাস।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরশুনে অশ্বল চুপ করে গেলেন। অশ্বল চুপ কল্লে হবে কি, তাতেই কি যাজ্ঞবল্ক্যের রক্ষে আছে, অশ্বলকে চুপ করতে দেখে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন জরৎকারুবংশীয় আর্ত্তভাগ নামক ঋত্বিক্।

আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে যে সব প্রশ্ন ক'রেছিলেন, তাহা তোমাদিগকে ব'লবার পূর্ব্বে দু'একটী কথা আমি তোমাদিগকে ব'লতে ইচ্ছা করি। আমার সেই কথা যদি তোমরা বেশ মনোযোগ দিয়ে শোন, তাহলে অশ্বল যে সব প্রশ্ন করেছিলেন এবং ঋষি আর্ত্তভাগ যে সব প্রশ্ন ক'রবেন

আর যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক সেই সব প্রশ্নের উত্তর তোমরা বেশ ভালরূপে বুঝতে পারবে।

তোমরা এখন বালকবালিকা; কিন্তু বালকবালিকা হোয়েইত তোমরা জন্মাও নি। তোমরা দোল্‌নায় দোল খেয়েছ; মাইয়ের দুধ খেয়ে বড় হোয়েছ, হামাগুড়ি দিয়ে চলেছ, তারপর কথা ব'লতে শিখেছ, তারপর এক বছর, দু'বছর ক'রে ক্রমে কৈশোরে উপনীত হোয়েছ। এই রকম ক'রে যুবা হ'বে, প্রৌঢ় হ'বে, তারপর একদিন আমার মত গলিত-নখ-নয়ন, পক্ককেশ, দন্তহীন বৃদ্ধ অবস্থায় এসে উপস্থিত হবে। তোমাদের বাপ আছেন, মা আছেন, কাহারও ঠাকুরদা, ঠাকুরমাও আছেন; কিন্তু তোমাদের ঠাকুরদা ঠাকুরমার বাপ মা বোধ হয় নাই। তাঁহারা গেলেন কোথায়? তোমরা বলবে যে, তাঁরা মরে গেছেন। এই মরে যাওয়া মানে কি? তোমরা হয়তো ব'লবে, দেহ পরিত্যাগ ক'রে চিরতরে আমাদের সম্বন্ধ কাটিয়ে এ জগৎ থেকে চ'লে যাওয়ার নামই মরে যাওয়া। তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে, তোমাদের ঠাকুরদা, ঠাকুমা যাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন, তাঁরা সেই সম্বন্ধ কেটে চলে গেছেন। আর তাঁদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁদের সঙ্গে বসে দু'দণ্ড আলাপ করাও যাচ্ছে না। আরও একটা জিনিষ তোমরা ভেবে দেখ। সেটা হ'চ্চে মানুষের সর্ব্ববিষয়ে বিফলতা। আমাদের চোখ, নাক, কাণ, জিভ্, ত্বক্ এই যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, যার সাহায্যে আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করি, সেগুলির শক্তি খুব বেশী নয়। বহুদূরের কিংবা অতিনিকটের বস্তু চোখ দেখতে পায় না। চোখ নিজেকে নিজে দেখতে পায় না। এই রকম আমাদের যে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর যে পাঁচটা কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, তাদের সবগুলিরই শক্তি সীমাবদ্ধ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এগুলিও অন্তঃকরণ অর্থাৎ ভিতরের ইন্দ্রিয়; সুতরাং তারা ইন্দ্রিয় ব'লে তাদেরও শক্তি সীমাবদ্ধ। আমরা যত কিছু কার্য্য করি, যত কিছু চিন্তা করি, যত কিছু জ্ঞান

লাভ করি, সে সবই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটা কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর চারটে অন্তঃকরণ, এই চৌদ্দোটার সাহায্যে। এই চৌদ্দটা ইন্দ্রিয় ছাড়া, আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, প্রস্রাব, বাহ্য করি, যে সব জিনিষ খাই তা পরিপাক করি, সব শরীরে রক্ত সরবরাহ করি, হাই তুলি, ঢেকুর তুলি, ; এই সব কাজ যার সাহায্যে হয়, তার নাম হ'চ্ছে 'প্রাণ'। 'প্রাণ' এই কথাটাতে দুটো শব্দ আছে ; একটা 'প্র' আর একটা 'অণ'। 'প্র' এই শব্দটার মানে হ'চ্চে প্রকৃষ্টরূপে, আর 'অণ'র মানে হ'চ্চে বেঁচে থাকা। তাহলে প্রাণ হচ্চে সেই বস্তু, যার সাহায্যে আমরা জীবন ধারণ করি। এই প্রাণ আমাদের শরীরকে ধারণ ক'রে আছে। পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য প্রাণকে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পাঁচ নামে অভিহিত করা হোয়েছে। এখন বুঝতে পারছ যে, উনিশটি জিনিষ দিয়ে আমরা বাইরের এবং ভিতরের যত কিছু আছে, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন ও ভোগ করচি। এই উনিশটি যন্ত্র ছাড়া আমাদের ভোগ ক'রবার বা জ্ঞানলাভ করবার আর একটাও যন্ত্র নেই। আর একবার তোমাদিগকে সেই উনিশটি যন্ত্রের নাম বলি, শোন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ; মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার (অন্তঃকরণ চতুষ্টয়) ; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান (পঞ্চ প্রাণ)। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, এই উনিশটে আমাদের যন্ত্র, যার সাহায্যে আমরা জ্ঞানলাভ করি, কার্য্য করি, বিষয়ভোগ করি। কিন্তু এই যন্ত্রগুলির শক্তি সীমাবদ্ধ ব'লে, আমরা পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করতে পারি না, বেশ ভালরূপে কার্য্যও ক'রে উঠতে পারি না, এবং না পারি চুটিয়ে ভোগ ক'রতে। কত বিষয়ের জ্ঞান, কত কার্য্য অসম্পূর্ণ র'য়ে যায় ; কত অতৃপ্ত কামনা আমাদিগকে যন্ত্রনা দিয়ে থাকে। যদি আমাদের মধ্যে কেহ পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারী সম্রাটও হন, তাহলেও মৃত্যুর

হাত থেকে ত তাঁর অব্যাহতি নেই। সাপ যেমন একটু একটু ক'রে ব্যাঙকে খেয়ে ফেলে, সেই রকম একটু একটু করে মৃত্যু আমাদিগকে ভক্ষণ ক'রচে। মৃত্যু এ রকম ফন্দীবাজ যে, সে আমাদিগকে জানতেও দিচ্চে না যে, সে আমাদিগকে খেতে আরম্ভ করেছে। আমরা যেইমাত্র জন্মেছি, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু আমাদিগকে ভক্ষণ ক'রতে আরম্ভ করেছে। এই মৃত্যুকে কাল বলে। কাল মানে কি জান? কলয়তি, ভক্ষয়তি, যঃ সঃ কালঃ। যে ভক্ষণ করে, সে কাল। সুতরাং কালই মৃত্যুর রূপ। এই কাল বহুরূপী। ইহা অণু হ'তে অণু হ'তে পারে আবার বড় হ'তেও বড় হ'তে পারে। মুহূর্ত্ত, নিমেষ, পল, বিপল, দণ্ড, প্রহর, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বৎসর এ সবই মৃত্যুর রূপ। এই সব মূর্ত্তি ধ'রে মৃত্যু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, প্রতিনিমেষে পলে পলে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, প্রতি বৎসরে আমাদিগকে খেতে খেতে চলেছে। এখন, মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে— কি প্রকারে এই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, কি প্রকারে আমরা ঐ উনিশটে যন্ত্রকে নূতন ক'রে গ'ড়ে, নূতন রূপ দিয়ে, পূর্ণরূপে জ্ঞান অর্জ্জন ক'রতে পারি, কর্ম্মে পূর্ণরূপে সফল হ'তে পারি, ভোগেতেও পূর্ণরূপে তৃপ্তিলাভ করতে পারি; সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও তৃপ্ত হ'তে পারি; কি প্রকারে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে অমর হ'তে পারি। জনক রাজার সভাপণ্ডিত অশ্বল ও যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্নই করেছিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য সেই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন তাও তোমরা শুনেছ।

আমি বৃহদারণ্যকের যে স্থান থেকে তোমাদিগকে উপনিষদের কথা ব'লতে আরম্ভ করেছি, সেটা হ'চ্চে বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম দুই অধ্যায়ের কথা তোমাদিগকে বলিনি। তোমরা রাজার কথা শুনতে চেয়েছিলে, সেইজন্য রাজার কথাই বলতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে ঋষিগণের প্রশ্ন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে

যা বলা হয়েছে সেই সব কথাই সাধারণভাবে প্রথম দুই অধ্যায়েও বিচার করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়েও ঋষি বলেছেন—

"নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ। মৃত্যুনা এব ইদম্ আবৃতম্ আসীৎ অশনায়য়া। অশনায়া হি মৃত্যুঃ।"

এই যে আকাশ, বাতাস, তেজ, জল, পৃথিবী, শত শত সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, কোটি কোটি উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ, পশু, মানুষ, দেবতা—এরা সবই সৃষ্ট হ'য়েছে, সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহারা কেহই ছিল না। এই জগতে যা কিছু আছে তাদের প্রত্যেকেরই একটা নাম এবং একটা রূপ অর্থাৎ বিশেষ একটা আকার আছে। নাম আর রূপ দিয়ে আমরা সব জিনিষের জ্ঞান অর্জ্জন করি। সুতরাং আমরা এখন যে জগৎ দেখছি, সেই জগৎ হ'চ্চে নামরূপাত্মক। ঋষি বলছেন সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাত্মক জগৎ ছিল না। মৃত্যু দ্বারা সব আবৃত ছিল। মৃত্যু এই নামরূপাত্মক জগৎকে খেয়ে ফেলেছিল, একেবারে আত্মসাৎ করেছিল। খাবার ইচ্ছা হ'লে লোকে হত্যা করে; যাকে খায় সে যায় ম'রে। সেইজন্য খাবার ইচ্ছাই হ'চ্চে মৃত্যু। মৃত্যুকে ত আর আমরা এই চর্ম্ম-চক্ষে দেখতে পাই না; মৃত্যুর কাজটা শুধু দেখি। মাংস খাবার যেই ইচ্ছা হ'ল, আর অমনি দেখা গেল বেশ একটী নধর পাঁটা বিনষ্ট হ'ল এবং আমাদের উদরসাৎ হ'য়ে গেল। আমি যদি এক ঝুড়ি আম কিংবা এক থালা সন্দেশ তোমাদের সামনে রেখে দিই, তাহলে কিছুক্ষণ পরে দেখবো, সেই আমগুলিও নাই, সন্দেশও নাই; সেগুলি নষ্ট হ'য়ে তোমাদের উদরসাৎ হয়েছে। সেইজন্য মৃত্যুকে দেখতে না পেলেও খাবার ইচ্ছাকে মৃত্যু ব'লে বুঝি। এই মৃত্যু একে একে পৃথিবী, মঙ্গল, সূর্য্য, চন্দ্র, আমাকে তোমাকে সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে খেয়ে ফেলে নিজের উদরসাৎ করেছিল। নামরূপাত্মক জগতের অন্তর বাহির ব্যেপে মৃত্যুই শুধু বিরাজ করছিল। এই মৃত্যু কত বড় একবার দেখ! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই মৃত্যুর উদরে

দলা পাকিয়ে, বীজীভূত হয়ে পড়েছিল। মানুষ, দেবতা এবং দেবতা হ'তেও শক্তিশালী জীব তাদের বুদ্ধি দিয়ে যত কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করেছিল, সেই সব জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, স্থূল, সূক্ষ্ম যত কিছু বস্তু তোমরা এখন দেখচ, সে সব তালগোল পাকিয়ে মৃত্যুর গর্ভে লীন হ'য়েছিল। আমরা যেমন সব কাজ বুদ্ধিপূর্ব্বক ক'রে থাকি, মৃত্যুও সেইরকম বুদ্ধিপূর্ব্বক সব জগৎ খেয়ে ফেলেছিল। মৃত্যুর বুদ্ধিশক্তি কত বড় দেখেছ ত? জীবের যত বুদ্ধি আছে, সেই সব বুদ্ধি মিলে এক হ'য়ে সমষ্টি হয়ে মৃত্যুর বুদ্ধি হয়। মৃত্যুর বুদ্ধি, মৃত্যুর অহঙ্কার, মৃত্যুর মন যেন খণ্ড খণ্ড হ'য়ে, নানা হ'য়ে আমাদের এক একটি বুদ্ধি, এক একটি মন, এক একটি অহঙ্কার রূপে ফুটে পড়েছে। মৃত্যুর হ'চ্চে সমষ্টিবুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি হ'চ্চে ব্যষ্টি। আমাদের বুদ্ধিতে যেমন চৈতন্যের প্রকাশ অল্প, মৃত্যুর সমষ্টি বুদ্ধিতে কিন্তু চৈতন্যের প্রকাশ খুব বেশী। এই সমষ্টিবুদ্ধিযুক্ত চৈতন্যই মৃত্যু। আর এই মৃত্যুর গর্ভে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, নামরূপাত্মক সমস্ত জগৎ লীন হোয়েছিল ব'লে, এই মৃত্যুকে হিরণ্যগর্ভ বলে। এই হিরণ্যগর্ভরূপী মৃত্যু যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খেয়ে ফেলে, সেইরূপ আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টিও করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যখন সে খায়, তখন সে নিশ্চয়ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বড়। সে যখন তার উদর থেকে নামরূপ দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করে, তখন নাম-রূপাত্মক এই জগতের সত্তা মৃত্যু বা হিরণ্যগর্ভের সত্তা থেকে কম। হিরণ্যগর্ভ আছে বলেই জগৎ আছে, তাই হিরণ্যগর্ভের সত্তাই জগতের সত্তা। হিরণ্যগর্ভ থেকে আলাদা হ'য়ে, মৃত্যু থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে জগৎ বলে কিছু নেই। তাহলে দেখতে পাচ্চ সমস্ত জগৎই মৃত্যুর বশে, মৃত্যুর কবলে। এখন প্রশ্ন উঠেচে—এই হিরণ্যগর্ভরূপ মৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি পাবার কোন উপায় আছে কি না। মুনিঋষিরা অনেক অনুসন্ধান ক'রে বহু পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে এই মৃত্যুর কবল থেকে

মুক্তির উপায় আছে। সেই উপায়টা যে কি তাহা তাঁহারা সাধারণভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন। সেই উপায়টী হ'চ্চে অশ্বমেধ. যজ্ঞ। কিন্তু যজ্ঞ ক'রতে হ'লে আগুণ চাই। অগ্নি না প্রজ্বলিত ক'রলে কোন বৈদিক যজ্ঞই সম্পন্ন হয় না। সেইজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী যে অগ্নি, সেই অগ্নিকেও প্রজ্বলিত ক'রতে হবে। এখন অগ্নি যে কি এবং অশ্বমেধযজ্ঞ ব'লতেই বা বা ঋষিরা কি বুঝতেন, সেই সব কথা তোমাদিগকে আমি অতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেবো। সংক্ষেপে বলচি এই জন্যে যে রাজা জনকের কথা ব'লতে আরম্ভ করেছি কিনা, সে কথার দেরী হোয়ে যাবে।

তোমরা নিশ্চয়ই অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনেছ। সেকালে যে রাজা সম্রাট হ'তে ইচ্ছা করতেন, তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হ'ত। অশ্বমেধ যজ্ঞ মানে সেই যজ্ঞ যে যজ্ঞে অশ্বকে হনন করা হ'ত। অশ্বমেধ যজ্ঞ সেই যজ্ঞ, যে যজ্ঞে অশ্বকে সংস্কৃত, পবিত্র করা হ'ত। যেটা অশ্বের পশুরূপ, সেই পশুরূপকে হনন ক'রে, সংস্কৃত ক'রে, পবিত্র ক'রে, দিব্যরূপ প্রদান করা হ'ত। তোমাদের মধ্যে যাহারা মহাভারত পড়েছ, তাহারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা নিশ্চয়ই জান। সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। অশ্বমেধ যজ্ঞ বেশ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হ'লে, যজ্ঞকারীর ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পাপ নষ্ট হ'য়ে যায় এবং সে নিষ্পাপ হ'য়ে মোক্ষলাভ ক'রতে পারে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অনেক প্রাণিহত্যা হয়েছিল ব'লে যুধিষ্ঠির এই অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে নিষ্পাপ ও ভারতবর্ষের সম্রাট্ হন এবং সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। যজ্ঞ মানে যে কি তা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলেছি। যজ্ঞ মানে দেবতা বা নিজের ইষ্ট বা পরমেশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে সেই জলন্ত অগ্নিতে, ঘৃত বা অন্যান্য দ্রব্য ইষ্টদেবতার উদ্দেশে অর্পণ করাকেই

যজ্ঞ বলে। অগ্নি হ'চ্ছেন হব্যবাহন অর্থাৎ যা কিছু হবনীয় দ্রব্য দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে অর্পণ করা যায়, অগ্নি সেই সেই দ্রব্য দেবতার নিকট নিয়ে যান সেইজন্য অগ্নিকে হব্যবাহন বলে। অগ্নি ছাড়া এমন আর কেউ নেই, যিনি যজ্ঞকারীর সংকল্পকে সফল করে দিতে পারেন। অগ্নিই মানুষের সঙ্গে তার ইষ্টদেবতার একটা অচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেন। সেইজন্য যজ্ঞ করবার পূর্ব্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা বিশেষ দরকার। অশ্বমেধ যজ্ঞেও অশ্বমেধের উপযোগী অগ্নিজ্বালান যায়। যে সে অশ্ব নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা যায় না। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের বিশেষ গুণ থাকা চাই। যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তখন ব্যাসদেব তাঁকে যজ্ঞে দীক্ষিত ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী অশ্বকে বহু পরীক্ষা করে নিতে বলেছিলেন। ব্যাসদেব অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের যেরূপ বর্ণনা করেছিলেন, তাহা তোমাদিগকে বলি, শোন। অশ্বমেধ যজ্ঞের যে অশ্ব, তার বর্ণ জলভরা নবীন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল পীতবর্ণ হ'চ্চে তার মুখ· উভয় পার্শ্ব শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা চিহ্নিত; অশ্বের লেজ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত; উদর কুন্দফুলের মত সাদা; চারিটা পা সবুজ; কাণ সিঁদুরের মত লাল; জিহ্বা জলন্ত অগ্নির মত; চক্ষু সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর; শক্তি এবং বেগ যেন অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ফেটে পড়ছে আর সেই অশ্বের শরীর থেকে বেশ একটা সুগন্ধ বেরুচ্চে। এই রকম যে অশ্ব, সেই অশ্বই হ'চ্চে অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী অশ্ব।

অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বর্ণ ছাড়া আর কোন ধাতু ব্যবহার করা যায় না। রাজা সোনার হার গলায় প'রে চেলির কাপড় প'রে যজ্ঞস্থানে এসে দণ্ড হাতে করে বসেন। তখন পুরোহিতেরা কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করে আগুন জালিয়ে সেই অগ্নির সম্মুখে রাজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করেন। অশ্বকে মন্ত্রপূত করে তার কপালে এক জয়পত্র বেঁধে দেওয়া হয়। সেই জয়পত্রে লেখা থাকে—"আমি অমুক দেশের রাজা, অশ্বমেধ যজ্ঞ করচি;

যার ক্ষমতা থাকে, সে আমার এই অশ্বের গতিরোধ করুক। আমার এই অশ্ব যে যে দেশের উপর দিয়ে যাবে, সেই সেই দেশ আমার অধীন হবে, আমিই সেই সেই দেশের সম্রাট্।" অশ্বের কপালে এই রকম জয়পত্র লিখে অশ্বকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অশ্বের পাছে পাছে রাজার যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি ও অগণিত সৈন্য চলতে থাকে, কিন্তু সেনাপতি ও সৈন্যগণ অশ্বের গতিকে বাধা দেন না; অশ্ব তাহার ইচ্ছামত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে ভ্রমণ করে। যদি কেহ অশ্বকে ধ'রে রাখে তা'হলে সেনাপতি ও সৈন্যগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে পরাজিত করে অশ্বকে মুক্তি করিয়ে দেন। অশ্ব আবার ইচ্ছামত চলিতে আরম্ভ করে। অশ্ব মন্ত্রপূত কিনা, সেইজন্য সে চারিদিক ইচ্ছামত ভ্রমণ ক'রে যেদিন ঠিক একবৎসর পূর্ণ হয়, সেইদিন আবার যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হয়। তখন পুরোহিতেরা সেই মন্ত্রপূত অশ্বকে সংকল্প দ্বারা আবার সংস্কৃত করেন এবং তাহাকে হত্যা ক'রে সেই নিহত অশ্বের মেদ অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করেন এবং সেই মেদ থেকে যে ধূম নির্গত হয়, সেই ধূমের আঘ্রাণ করেন। পরে অশ্বের অন্য অন্য অঙ্গদ্বারাও তাহারা হোম করেন। অশ্বের সহিত বহুসংখ্যক পশু ও পক্ষীর বলি প্রদান করা হয়। সেইসব মাংস দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হয়। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে বহু পরিমাণ স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

এই যে অশ্বমেধ যজ্ঞ ইহা হচ্চে আধিভৌতিক ...মেধ যজ্ঞ। তোমাদিগকে আমি পূর্ব্বে একটা কথা বলেছি এবং তোমরাও সেই কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছ; কিন্তু যদি ভুলে গিয়ে থাক, সেই জন্য আবার বলি, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন। আমরা যা বলি না কেন, সেই জিনিষ প্রথমে অনুভব করে থাকি, তারপর সেই

জিনিষের সম্বন্ধে আমরা অপরকে বলি। মুনি ঋষিরা যে যে সত্য নিজ নিজ হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, সেই সেই সত্য তাঁরা তিন রকমে বলে গেছেন। প্রথম হ'চ্চে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ তাঁহাদের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় হ'চ্চে আধিভৌতিক অর্থাৎ তাঁহাদের শরীরের বাহিরে পৃথিবীতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থ-সম্বন্ধীয়; তৃতীয় হ'চ্চে আধিদৈবিক অর্থাৎ অন্তরিক্ষে যে সব জ্যোতিষ্ক আছে, সেই সব জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয়। অশ্বমেধ যজ্ঞও সেইরূপ তিন প্রকারের। আধিভৌতিক অশ্বমেধ যজ্ঞ যা রাজা যুধিষ্ঠির করে ছিলেন, আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞ যা ঋষিরা অন্তশ্চক্ষুতে দেখেছিলেন এবং মুনিরা যাহা নিজ হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, আধিদৈবিক অশ্বমেধ যজ্ঞ, যাহা অন্তরিক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয়। এই যজ্ঞ তিনটীর মধ্যে আধ্যাত্মিক যজ্ঞই হ'চ্চে প্রথম। এই যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ; কারণ এই আধ্যাত্মিক যজ্ঞে অশ্ব ব'লে কোন পশুকে নিহত করা হয় না; কিম্বা অশ্বের সঙ্গে অন্যান্য পশুপক্ষী বধ ক'রে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান হয় না; অথবা অগ্নিতে ঘি এবং অন্যান্য ভৌতিক দ্রব্য নিক্ষেপ করে হোম করা হয় না। এই যজ্ঞ মানসিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞে 'অশ্ব' বলতে কি বুঝায় তাহাই এখন তোমাদিগকে বলি, শোন। আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হইতেছে অন্তঃশরীরে জ্যোতি রূপ অগ্নি অথবা সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম, ব্যক্ত অব্যক্ত বস্তু সমূহের সমষ্টি এবং সেই সমষ্টির অভিমানী চৈতন্য। এই আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বেদে আছে। বেদ মানে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলতে যেন ব্রাহ্মণ জাতি বুঝো না। ব্রাহ্মণ মানে গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ বেদের এক অংশ। বেদের মন্ত্রভাগে যে সত্য ঋষি প্রচার করেছেন, সেই সত্যের ব্যবহারিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে এবং এই ব্রাহ্মণের শেষভাগে ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে যাহা লক্ষ্য যে সত্য

ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে আধিভৌতিকরূপ নিয়ে যে সেই সত্য বিবৃত করা হয়েছে ; সেই জন্য ব্রাহ্মণের শেষ ভাগকে উপনিষৎ বা রহস্যবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলে।

যাঁহারা এই আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে, আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞের সত্যতা স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীকে বলা হ'ত ঋষি এবং অপর শ্রেণীকে বলা হ'ত মুনি। ঋষি কাহাকে বলা হ'ত জান? যাঁহারা বৈদিক মন্ত্রসমূহ দর্শন করেছিলেন তাঁহাদিগকে ঋষি বলা হ'ত। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।" ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্র দেখার মানে কি? আমরা যেমন চক্ষু দিয়ে মানুষ, গরু, গাছপালা দেখে থাকি, ঋষিরাও কি সেইরূপ চক্ষু দিয়ে বৈদিক মন্ত্রসমূহ দেখেছিলেন? বাস্তবিকই ঋষিরা চক্ষু দিয়েই বৈদিক মন্ত্রসমূহ দেখেছিলেন! মন্ত্র হ'চ্চে দেবতাত্মক। দেবতা মানে দ্যুতিমান্ বস্তু। দেবতা প্রকাশশীল। দেবতা জ্যোতির্ম্ময়। বেদে যে সমুদয় দেবতার উল্লেখ আছে সেইসব দেবতাদিগের মধ্যে, অগ্নি, ইন্দ্র, ঊষা, বরুণ, বিষ্ণু, মিত্র, যম, গরুড়, প্রধান। আবার এই প্রধান দেবতাগুলির মধ্যে অগ্নিই হচ্চেন প্রথম। অপর যত দেবতা আছেন, সব দেবতাই অগ্নির ভিন্ন ভিন্নরূপ। তোমাদিগকে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র বলি শোন, তাহলে বুঝতে পারবে যে, সমস্ত দেবতাই অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। মন্ত্রটী এই—

ইন্দ্রং মিত্রং, বরুণং, অগ্নিমাহুঃ
অথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্!
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং, যমং, মাতরিশ্বানমাহুঃ। ঋঃ ১।১৬৪।৪৬

একই সৎ বস্তুকে মনীষিগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, গরুড়, যম, বায়ু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

আমরা অগ্নি ব'লতে সাধারণতঃ যে জড় অগ্নি বুঝি, বৈদিক ঋষিরা কিন্তু অগ্নি ব'লতে জড় অগ্নি বুঝতেন না। "অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ।" তাঁহাদের অন্তঃশরীরের দিব্যজ্যোতিকে তাঁহারা অগ্নি ব'লতেন। এই দিব্যজ্যোতিঃ সকল প্রাণীর মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে। মন্ত্রদ্বারা ঋষিরা এই দিব্যজ্যোতিকে জাগাতেন। এই জ্যোতিতে তাঁরা হোম করতেন। আমি এবং আমার ব'লতে যা কিছু আছে সব এই অগ্নিতে, এই দিব্যজ্যোতিতে নিবেদন করে দিতেন। অন্তঃশরীরের এই দিব্যজ্যোতি তাঁহারা স্পষ্ট দেখতে পেতেন। তাঁদের চক্ষু পরিচ্ছন্ন ভাব ত্যাগ করে, অপরিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেত। তাঁদের অন্তঃশরীরে এই জ্যোতিঃ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা আকাশের মত একটা সর্ব্বব্যাপী ভাব অনুভব করতেন। ক্রমে ক্রমে এই অগ্নি বা দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহাদিগকে এক অসীম, অপরিচ্ছন্ন সত্তায় উন্নীত ক'রত। এই অগ্নিই অশ্ব নামে অভিহিত হ'ত। শ্রবণ মনন, ধ্যান ধারণা ব্যতীত ঋষিরা এই অগ্নির প্রসাদেই নিজেদের স্বরূপ স্বচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ ক'রে মৃত্যুর হাত হ'তে মুক্তিলাভ করতেন। অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ক'রত। অগ্নির এই কার্য্য তাঁহারা চোখ বুজে ও চোখ চেয়েও দেখতে পেতেন; সেইজন্য তাঁহাদিগকে ঋষি বলা হ'ত। আর এক শ্রেণীর সাধক ছিলেন, যাহাদের অন্তঃশরীরে এই অগ্নি দিব্যজ্যোতিরূপে প্রকাশিত হতেন না। ঋষিরা দিব্য মানস চক্ষু দিয়ে যে জ্যোতিকে স্পষ্ট দর্শন করতেন, যে জ্যোতির প্রসাদে তাঁরা সত্য অনুভব ক'রে সত্যদ্রষ্টা, সত্যসংকল্প হয়েছিলেন, নিজেরাও জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন-প্রাণের শৃঙ্খল থেকে নিজদিগকে মুক্ত ক'রে অমৃতত্ত্ব-লাভ ক'রে অমর হয়েছিলেন, অপর এক শ্রেণীর সাধক এই অগ্নিকে এই দিব্যজ্যোতিকে অন্তঃশরীরে ঋষিদিগের ন্যায় স্পষ্ট না দেখলেও কেবল বিবেক বিচারের দ্বারা, পুনঃপুনঃ মনন দ্বারা, ধ্যান দ্বারা, ঋষিদিগের অনু-

ভূত সত্য স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভব করে জীবন সফল ক'রতেন। এই শ্রেণীর সাধকেরা মননশীল ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে মুনি বলা হ'ত। এইরূপে ঋষিদিগের অনুভূত সত্য মুনিদিগের যুক্তি, মনন ও ধ্যান দ্বারা সমর্থিত হ'ত। এইরূপে ঋষি ও মুনিগণ আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ ক'রে ধন্য হ'তেন।

এক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের 'অশ্ব' মানে 'ঘোড়া' নয়। অন্তঃশরীরের দিব্য জ্যোতিকেই 'অশ্ব' ব'লতেন। সংস্কৃত ভাষায় যে সব শব্দ আছে, তা'দের এক একটা ধাতু আছে। সোণার হারের যেমন সোণা হ'চ্চে ধাতু; সোণা থেকেই হার ছড়াটী তোয়েরী হ'য়েছে, সেই জন্য হারের ধাতু বা মূল উপাদান হ'চ্চে সোনা। সেই রকম এক একটি শব্দ যে মূল শব্দ থেকে হ'য়েছে, সেই মূল শব্দকে ধাতু বলে। যেমন 'রাম' একটি শব্দ; এই শব্দটী যে মূল শব্দ থেকে হ'য়েছে সেই শব্দটি হ'চ্চে 'রম'; 'রাম এই শব্দের ধাতু হ'চ্চে রম। সেই রকম 'অশ্ব' এই শব্দটী যে ধাতু থেকে হ'য়েছে সেই মূল শব্দটী হ'চ্চে 'অশ'। 'অশ' মানে ব্যাপ্তি, গতি। অশ্ ধাতুর আর এক মানে হ'চ্চে 'খাওয়া', জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে যাওয়া, অপবিত্র হ'য়ে যাওয়া। অশ্ ধাতুর যতগুলি অর্থ আছে, সব অর্থগুলি 'অশ্ব' এই শব্দে জড়িত হ'য়ে আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী এই অশ্ব বা অগ্নি বা দিব্য অন্তঃজ্যোতির একটি বিশেষ নাম আছে; সেই নামটী হ'চ্চে অর্ক। অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী অর্কনামা এই অগ্নি বা দিব্য অন্তঃজ্যোতিঃ বা অশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞকারীকে মৃত্যুর কবল হ'তে মুক্ত ক'রে অমৃতত্ব প্রদান করে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী এই অর্কনামা অগ্নি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

তন্মনোঽকুরুত আত্মন্বী স্যামিতি।

সোঽর্চ্চন্নচরৎ তস্য অর্চ্চতঃ আপঃ অজায়ন্ত।

অর্চ্চতে বৈ মে কম্ অভূৎ ইতি।

তদেব অর্কস্য অর্কত্বং।

কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবম্ এতৎ অর্কস্য অর্কত্বং বেদ।

দিন, রাত, পক্ষ, মাস, বর্ষ, যুগ, কল্প—এই সব হ'চ্চে মৃত্যুর রূপ, মৃত্যু এই সব রূপ ধরে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে খেতে খেতে চলেছেন। এইজন্য মৃত্যুর এক নাম হ'চ্চে অদিতি, 'অত্তি সর্ব্বং ইতি অদিতিঃ' সব অত্তি অর্থাৎ ভক্ষণ করেন ব'লে মৃত্যুর নাম অদিতি। এই সব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অদিতির গর্ভে; যত কিছু জ্ঞান, যত কিছু কর্ম্ম, সব সূক্ষ্মভাবে, বীজভাবে লীন হ'য়ে আছে এই মৃত্যুরূপ অদিতির গর্ভে সেই জন্য এই মৃত্যুকে হিরণ্যগর্ভ বলে। হিরণ্য মানে কর্ম্মের সংস্কার যত কিছু জ্ঞান কর্ম্মের সংস্কাররূপ হিরণ্য যাঁর গর্ভে থাকে, তাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। এই হিরণ্যগর্ভরূপ মৃত্যু যেমন সব ভক্ষণ করেন সেইরূপ সব সৃষ্টিও করেন; এইজন্য তাঁকে প্রজাপতিও বলা হয়। প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়কার্য্যে রত রয়েছেন। কিন্তু এই তিন রূপ ছাড়া তাঁর নিজের একটা স্বরূপ আছে। সেইরূপটী তাঁর অন্তর্য্যামী, সূত্রাত্মারূপ। এই অন্তর্য্যামী সূত্রাত্মারূপটী আনন্দময়, জন্মমৃত্যু রহিত, পাপপুণ্য ইঁহাকে স্পর্শ করতে পারে না। অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধককে এই অকামহত, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বভূতাত্মাস্বরূপে নিয়ে যায়। সেইজন্য অশ্বমেধযজ্ঞকে কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠকর্ম্ম বলা হয়েছে। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলেছি যে, বৈদিক যজ্ঞ করতে হ'লে অন্তঃশরীরে অগ্নি বা জ্যোতির উদ্বোধন করতেই হবে। অশ্বমেধের উপযোগী অগ্নিকে জ্বালতে হ'লে তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যার জন্য চাই দৃঢ় সঙ্কল্প।

সঙ্কল্প আবার মনের কাজ। মন একাগ্র হওয়া চাই। দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট মনই যেন সাধকের শরীর, সাধকের প্রাণ, দশইন্দ্রিয় সব এখন মনের অনুগামী হয়েছে, তাদের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা হারিয়ে ফেলেছে মনের সত্তায়। সাধকের ইন্দ্রিয়গণ আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ মনের কাছে নিয়ে গিয়ে মনকে সেই সেই বিষয়ে আর আবদ্ধ করে না; কারণ মন তখন বাহ্য বিষয় থেকে উপরত হয়েছে। মন দৃঢ়সঙ্কল্প করেছে যে, সে পরমেশ্বরকেই চায়। এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট মন নিয়ে যখন সাধক পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তখন সেই অর্চ্চনাকারী সাধক অন্তঃশরীরে দিব্য জ্যোতি দর্শন করেন। আরও দেখেন নীলজলরাশি তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে বিস্তৃত রয়েছে। এইরূপ দর্শনের পর তাঁর আনন্দের অনুভূতি হ'তে থাকে। সাধকের স্পষ্ট অনুভব হয় যে, তাঁর শিরোদেশ হ'তে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দধারা প্রবাহিত হ'য়ে তাঁর সমস্ত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ আপ্লুত ক'রছে। এই আনন্দময় দিব্য অন্তঃজ্যোতিকে অর্কনামে অভিহিত করা হয়। অর্চ্চনার 'অর্' এবং 'ক' অর্থাৎ আনন্দ এই অর্ এবং ক লইয়া অর্ক হ'য়েছে। অর্চ্চনা হ'তে আনন্দস্বরূপ এই অন্তঃজ্যোতির অভিব্যক্তি হয় বলিয়া ইহাকে অর্ক বলা হয়। এই অর্ক নামক বিশুদ্ধ অন্তঃজ্যোতি বা অগ্নিই হ'চ্চে অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযোগী অগ্নি। সাধক এই অন্তঃ-জ্যোতিরূপ অর্কনামা অগ্নিতে আত্মসমর্পণরূপ হোম দ্বারা ক্রমে ক্রমে হিরণ্যগর্ভ পদলাভ ক'রে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হন এবং জন্মমৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়রূপে বিরাজ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তৃতীয় অধ্যায়েও সেই প্রশ্নেরই মীমাংসা করা হ'য়েছে। এখানেও অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে মৃত্যুর কবল হ'তে মুক্তির উপায় আছে কি না সেই প্রশ্নই ক'রেছিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাহা তোমরা শুনেছ। অশ্বলকে

হতাশ হ'য়ে বসে পড়তে দেখে, জরৎকারুবংশীয় ঋষি আর্ত্তভাগ হাস্য-মুখে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

২

আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করে বললেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পুরুষ বলে অভিমান ক'রচ, আচ্ছা বল দেখি, গ্রহ এবং অতিগ্রহ কতগুলি এবং কি কি?"

যাজ্ঞবল্ক্য আর্ত্তভাগের প্রশ্ন শুনে বলে উঠলেন—"আর্ত্তভাগ, গ্রহ ত' তুমি দেখেছ। সোমযাগও ত তুমি বহুবার করেছ। সোমযজ্ঞে, সোমরস পরিপূর্ণ কলসীর মুখে যে একখানা মাটীর ছোট সরা থাকে, মাটীর সেই ছোট পাত্রটীকেই বলে গ্রহ। এখন বেশ করে বুঝে দেখ, আর্ত্তভাগ, এই গ্রহ বা মাটীর পাত্রটি ঢেকে রাখে সোমরসকে। গ্রহধাতু মানে গ্রহণ করা বা আক্রমণ করা, তা অবশ্যই তুমি জান। আমি পূর্ব্বেই অশ্বলের প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় বলেছি যে, যজ্ঞ যেরূপ দ্রব্যময় সেইরূপ ইহা জ্ঞানময়। একই জিনিষ বাহিরে বিষয়রূপে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ রূপে এবং অন্তরে শ্রোত্র ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে, অভিব্যক্ত। একই জিনিষ, বাক্ ও নামরূপে, হস্ত ও কর্ম্ম রূপে, মন ও কামরূপে ফুটে পড়েছে। গ্রহ যেমন কলসীর মধ্যের সোমরসকে ঢেকে রাখে, মাটির ঐ ছোট গ্রহটি যেমন মাটির বড় কলসীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, সেইরূপ আমাদের দশ ইন্দ্রিয় আর মন এবং ঐ ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়গুলি আবৃত করে রেখেছে আমাদের অমৃত আনন্দ স্বরূপকে; আর ইন্দ্রিয় ও মন আক্রান্ত হয়েছে তাহাদের

বাহিরের বিষয় দ্বারা। গ্রহগুলির মধ্যে আটটিই প্রধান। এবং অতিগ্রহের মধ্যেও আটটিই প্রধান। সেইজন্য তোমাকে বলছি, আর্ত্তভাগ যে গ্রহও আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। এবং সেই গ্রহগুলি হ'চ্চে— শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়), বাক্‌, হস্ত এবং মন। আর অতিগ্রহ হ'চ্ছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, নাম, ক্রিয়া এবং কাম। এবার বেশ করে বুঝে দেখ আর্ত্তভাগ, আমরা কি প্রকারে এই গ্রহ ও অতি-গ্রহের বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পড়েছি। অতিগ্রহ এসে আক্রমণ করচে গ্রহকে, বিষয় এসে টেনে নিয়ে যাচ্চে ইন্দ্রিয়কে বাইরে, এই আক্রমণের ফলে গ্রহ স্পন্দিত হ'চ্চে আর তার সেই স্পন্দন নিয়ে যাচ্চে মনের কাছে, আর মন সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে নিজেকে তুলছে শত শত স্পন্দন, শত শত কামনা, শত শত বৃত্তি। আর আমরা স্বরূপ ভুলে, নিজের আনন্দ স্বরূপ, রসস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে, এই শত শত বৃত্তির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলচি এবং বৃত্তিস্বারূপ্য লাভ ক'রে, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জন্মমৃত্যুরূপ সংসারজালে, এই গ্রহ অতিগ্রহের বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে পড়চি। একবার ভেবে দেখ আর্ত্তভাগ, আমরা যাকে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাইবন্ধু, আত্মীয় স্বজন, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌, জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা ব'লচি এবং এবং যাকে সত্য ব'লে ভাবচি, সেগুলি স্বরূপতঃ কি? সেগুলি কি আমাদের ইন্দ্রিয়গণের, এই গ্রহগণের, বিষয়ের সহিত, অতিগ্রহের সহিত সম্বন্ধ হেতু, মনে যে সব স্পন্দন উঠছে, সেগুলি কি মনঃ-কল্পিত স্পন্দনময়ী, বৃত্তিময়ী মূর্ত্তি নয়? মন, ইন্দ্রিয়ের এই স্পন্দনগুলিকে একটা রূপ, একটা নাম দিচ্চে আর সেই নামরূপকেই সত্য ব'লে মনে ক'রে, গ্রহ ও অতি-গ্রহের বন্ধনে বদ্ধ হ'চ্চে। মনঃকল্পিত নামরূপাত্মক বাহিরের এবং ভিতরের জগৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে সত্যকে রসরূপ, আনন্দরূপ অমৃতকে আবৃত করে রেখেছে। এইশত শত জ্যোতিষ্কদ্বারা উদ্ভাসিত নামরূপময়

জগৎ একখানা সোনার ঢাকনীর মত সত্যের দ্বার আবৃত করে রেখেছে। এই গ্রহ এবং অতিগ্রহের তত্ত্ব অবগত হ'লে ইহাদের মিথ্যাত্ব হৃদয়ঙ্গম হ'লে, সোমরসরূপ অমৃত লাভ করা যায়।"

আর্ত্তভাগের প্রথম চেষ্টা বিফল হ'লেও, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করবার জন্য আর একবার চেষ্টা করতে উদ্যত হ'লেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার প্রশ্ন ক'রলেন, "আচ্ছা, বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, এই জগতে যা কিছু আছে সবই ত এই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত, এখন এই মৃত্যুরও মৃত্যু আছে কি না? সে দেবতা কে যাঁর অন্ন হ'চ্চে মৃত্যু, যিনি মৃত্যুকেও ভক্ষণ করেন, সেই মৃত্যুঞ্জয় দেবতাটী যে কে, তাই তুমি আমাকে বল।'

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্ তাঁর পক্ষে আর্ত্তভাগের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "দেখ আর্ত্তভাগ, এই জগতে অগ্নি সব বস্তুকে দগ্ধ ক'রে ফেলে, সেই জন্য ইহার নাম সর্ব্বভুক্। এই সর্ব্বভুক্ অগ্নিকেও আবার ভক্ষণ করে জল। সেইরূপ এই সর্ব্বগ্রাসী গ্রহ অতিগ্রহরূপ মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। সেই মৃত্যু হ'চ্ছে স্বরূপ-জ্ঞান। এই মিথ্যা অবিদ্যা, অজ্ঞানরূপ গ্রহ অতিগ্রহ সেখানে অস্তমিত।

দেখ, আর্ত্তভাগ, এই গ্রহাতিগ্রহই হ'চ্ছে মানুষের প্রকৃত বন্ধন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এসে ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারে আঘাত দিয়ে উঠাচ্চে কম্পন। আর সেই কম্পন চিত্তে তুলচে অসংখ্য বৃত্তি, অগণিত তরঙ্গ; এবং মন সেই কম্পনগুলিকে নামরূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলচে শত শত মনোময়ী মূর্ত্তি, আর ঐ মনোময়ী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হয়ে কামনার পিছু পিছু ছুটে চলেছে সব মানুষ। এখন বুঝতে পাচ্ছ, আর্ত্তভাগ, কেমন ক'রে এই গ্রহ অতিগ্রহ ভিতরে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়রূপে ঢেকে রেখেছে আমাদের রসরূপ আনন্দ স্বরূপকে এবং বাহিরে বিষয়রূপে আবৃত করে রেখেছে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ—অমৃত, আনন্দ। এখন এই আবরণকে,

এই অমৃত আনন্দ স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে যে পাত্র, গ্রহরূপী যে ঢাক্‌নিটী, সেই পাত্রটীকে অপসারিত করতে হ'বে, এই ঢাকনীকে উন্মুক্ত করতে হ'বে। নামরূপ পরিত্যাগ ক'রে, সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষের জ্ঞান লাভ করতে হবে, তবেই এই গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারবে। আর সেই জ্ঞানই মৃত্যুরূপ গ্রহাতিগ্রহের মৃত্যুস্বরূপ।"

আর্ত্তভাগ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, আচ্ছা, বল দেখি, এই যে গ্রহ এবং অতিগ্রহরূপ সংসার-বন্ধন-বিমুক্ত পুরুষ যখন মরে, তখন তার প্রাণ সমূহ ঊর্দ্ধগামী হয় কি না। আর কেই বা সেই মৃতব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে না?"

যাজ্ঞবল্ক্য বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী এবং আত্মবিদ্। তিনি আর্ত্তভাগের প্রশ্ন শুনে একটু হেসে ব'ললেন, "আর্ত্তভাগ, বল দেখি, যখন আমরা অস্পষ্ট আলোকে একগাছা দড়িকে সাপ বলে মনে করি, কিন্তু যখন স্পষ্ট আলোকে সেই দড়িকে দড়ি বলে বুঝতে পারি, তখন আমাদের কল্পিত সেই সাপ কোথায় যায়? সেই সাপ নিশ্চয়ই দড়িতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মুক্তপুরুষের অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ঊর্দ্ধগামী হয় না, তাহার লিঙ্গশরীর জন্ম মৃত্যু স্বর্গ নরক ভোগ করে না। তাহার স্থূল দেহ বায়ুপূর্ণ হয়ে পড়ে থাকে। আর লিঙ্গ ও কারণ শরীরও সেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাস আত্মাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হওয়ায় সেই পুরুষ আর পুনরায় জন্ম মৃত্যু, গ্রহ অতিগ্রহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তখন তার অবশিষ্ট থাকে শুধু নাম। এই নাম সেই পুরুষকে ত্যাগ করে না। নাম অনন্ত, বিশ্বদেবও অনন্ত। সেই মুক্ত পুরুষ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের লক্ষ্য সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম হয়ে যান।"

আর্ত্তভাগ পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্য, এই এই প্রশ্নের উত্তরটা একবার দাও দেখি। পুরুষ যে গ্রহ অতিগ্রহরূপ

সংসারবন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই বন্ধনের কারণটা কি একবার বুঝিয়ে বল দেখি। যখন পুরুষ মরে, তখন তাহার বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে, মন চন্দ্রে, শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্‌সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, হৃদয়াকাশ মহাকাশে, লোমসমূহ তৃণলতা প্রভৃতিতে, কেশরাশি বনস্পতিতে, রক্ত এবং শুক্র জলে বিলীন হয়, এইরূপে মৃত্যুসময়ে পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, তখন পুরুষ থাকে কোথায়? আর কেইবা পুনরায় সেই পুরুষকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করায়?" আর্ত্তভাগের প্রশ্ন শুনে যাজ্ঞবল্ক্য তাড়াতাড়ি গিয়ে আর্ত্তভাগের হাতখানি ধ'রে বললেন, "বন্ধু, তুমি যা প্রশ্ন করলে, 'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা, নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।" দেবগণও এবিষয়ে পূর্ব্বে সন্দেহ করেছিলেন। তাঁহারাও এ তত্ত্ব নিঃসন্দেহরূপে জানতে পারেন নি। এ তত্ত্বটী বড়ই সূক্ষ্ম, বড়ই দুর্বিজ্ঞেয়। তাই বলি বন্ধু এ প্রশ্নের উত্তর যদি তুমি জানতে চাও, তাহলে এস, আমরা একটু নির্জ্জনে গিয়ে এ বিষয়ের আলোচনা করি।" এই কথা ব'লে যাজ্ঞবল্ক্য আর্ত্তভাগের হাত ধরে সভার বাহিরে গেলেন। তাঁরা বহুক্ষণ আলোচনার পর পুনরায় সভায় প্রবেশ করলেন। আর্ত্তভাগ দেখলেন, বড়ই বেগতিক, যাজ্ঞববল্ক্যকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারা গেল না, তাই তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের আসনে বসে পড়লেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে আর প্রশ্ন করলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য এবং আর্ত্তভাগ যে বিষয়সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন সে বিষয়টি হ'চ্ছে কর্ম্ম। কারণ কর্ম্মই মানুষকে সংসার বন্ধনে বদ্ধ করে। একটা কথা আছে, "মৃতমনুধাবতি ধর্ম্মাধর্ম্মম্"। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য মৃতব্যক্তির অনুসরণ করে। আমাদের প্রত্যেক কাজ, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব, মনের প্রত্যেক চিন্তাটী প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চিত্তে একটা ছাপ দিয়ে যাচ্ছে। সেই ছাপ, সেই কর্ম্ম-সংস্কার, সেই বাসনাগুলি আমাদের

জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনের কারণ। তাই যাজ্ঞবল্ক্য এবং আর্ত্তভাগ নির্জ্জনে ব'সে কর্ম্মেরই প্রশংসা করেছিলেন।

অশ্বল ও আর্ত্তভাগ যখন কিছুতেই যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত ক'রতে পারলেন না, তখন হাস্যমুখে উঠে দাঁড়ালেন লহ্যের পুত্র ভুজ্যু লাহ্যায়নি। তিনি জোর গলায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন ক'রে বলে উঠলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, এবার তোমার শক্তির পরীক্ষা হবে। এবার তোমাকে এমন একটি প্রশ্ন ক'রব, যার উত্তরে তুমি আমাদিগকে যা তা ব'লে ভুল বুঝিয়ে দিতে পারবে না। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা একজন দিব্যপুরুষের নিকট হ'তে শুনেছি। তাঁর জ্ঞান অলৌকিক, তিনি একজন দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। এবার তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত হবে—যাজ্ঞবল্ক্য, এবার তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। এইবার আমার প্রশ্ন শোনো, যাজ্ঞবল্ক্য, প্রশ্নটী শুনে তার যথার্থ উত্তর দাও। আমি এবং আমার কয়েকজন সহাধ্যায়ী একবার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মদ্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে কপিবংশীয় পতঞ্চল নামক কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। উপস্থিত হ'য়ে দেখি কি পতঞ্চলের এক মেয়েকে উপদেবতায় পেয়েছে। তখন আমরা গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আবিষ্টা সেই মেয়েকে ঘিরে ব'সে গন্ধর্ব্বকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তুমি কে হে বাপু, এই মেয়েটির স্কন্ধে ভর করেছ?" গন্ধর্ব্ব আমাদের প্রশ্ন শুনে গুরুগম্ভীর স্বরে ব'লে উঠল, "আমি সুধন্বা, অঙ্গিরা বংশে আমার জন্ম।" তখন আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে শেষ কোথায় হ'য়েছে, সেইটে জানবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা, ভাই গন্ধর্ব্ব! বল দেখি, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল, এখন সেই একই প্রশ্ন তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করচি, যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি, সেই পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল?"

ভুজ্যুর এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যের ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্যুতের ন্যায় একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি সহজ গলায় ভুজ্যুকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেন,

"ভুজ্যু, সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে যা বলেছিলেন, তা সবই আমি জা'নতে পেরেছি। তিনি যা বলেছিলেন, তা শোনো। সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে বলেছিলেন, "যাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই অশ্বমেধযজ্ঞকারী-গণ যেখানে যান, এই পারিক্ষিতগণও সেইখানেই গমন করেন।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে ভুজ্যু ত অবাক্। কিন্তু ভুজ্যু সহজে পরাজয় স্বীকার ক'রতে চাইলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করে ব'লে উঠলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, ওরকম উত্তর সবাই দিতে পারে, তোমার ওটা কি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে? একজন যদি আর একজনকে জিজ্ঞাসা করে 'ওহে, রাম কোথায় ছিলেন বল দেখি?' আর অপর ব্যক্তি যদি উত্তরে বলে, "শ্যাম যেখানে ছিলেন, রামও সেইখানেই ছিলেন।" তাহলে কি সেটা উত্তর হয় নাকি? তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, পরিক্ষিতগণ কোথায় ছিলেন, আর তুমি তার উত্তরে বল্‌লে, অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে ছিলেন, পারিক্ষিতগণও সেইখানেই ছিলেন। এটা কি আবার একটা উত্তর! ওরকম ফাঁকী রেখে দাও। এখন বল অশ্বমেধযাজীগণ কোথায় যান।"

ভুজ্যুর প্রশ্নের উত্তরে বিশুদ্ধচিত্ত বিমুক্তপাশ যাজ্ঞবল্ক্য ব'লতে লাগলেন, "ভুজ্যু, সমুদয় পুণ্যকর্ম্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ।' সুতরাং অশ্বমেধযাজিগণ সকলের চেয়ে উৎকৃষ্টতম লোকে গমন করেন। সেখান হ'তে তাঁহাদের আর অধোগতি হয় না। তাঁহারা ক্রমে কর্ম্ম বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে, অমৃতত্ব লাভ করেন। সূর্য্যকিরণ দ্বারা উদ্ভাসিত এই যে আমাদের সৌর জগৎ, ইহার বত্রিশগুণ পরিমিত স্থান হ'চ্ছে এই লোক এবং তাহার দ্বিগুণপরিমিত পৃথিবী এই লোককে পরিবেষ্টন ক'রে আছে, আবার সেই পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সমুদ্র সেই পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। এই পর্য্যন্ত বিরাট সৃষ্টি, স্থূল জগৎ। ইহার পর যাহা তাহা সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়। অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ পুণ্যের উৎকর্ষতা

হেতু স্থূল জগৎ অতিক্রম করেন এবং সেই লোকে নিজ নিজ ঈপ্সিত স্থান প্রাপ্ত হন। যে পথ দিয়া তাঁহারা গমন করেন, সেই পথটী মক্ষিকার পাখার ন্যায় কিম্বা ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। পারিক্ষিতগণ সেই সূক্ষ্ম আকাশপথ দিয়া অশ্বমেধযাজিগণের নিকট উপস্থিত হন, ইন্দ্র তখন পক্ষীরূপ ধারণ ক'রে তাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম বায়ুর হস্তে সমর্পণ করেন। সূক্ষ্ম বায়ু তখন তাঁহাদিগকে নিজের শরীরে স্থাপনপূর্ব্বক পারিক্ষিতগণকে সেই স্থানে নিয়ে যান, যেখানে অশ্বমেধযাজিগণ গমন করেছেন। শোনো, ভুজ্যু, এই জগতে যত কিছু ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত বস্তু আছে, তাহা বায়ুই। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে যিনি এই বায়ুতত্ত্ব অবগত হ'তে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয় হ'তে সমর্থ হন।

"আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ভুজ্যু, যে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক জগৎ এক উপাদানে গঠিত; এক সূত্রে গাঁথা। যে সব রাজারা সুলক্ষণ অশ্বকে উৎসর্গ পূর্ব্বক অগ্নিসম্মুখে বলি প্রদান করেন, তাঁহারা আধিভৌতিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞই হ'চ্ছে সর্ব্বকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক যজ্ঞেরই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দিক আছে। শুধু আধিভৌতিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রলে, যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকে, যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়। সেই জন্য আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে যজ্ঞ ক'রতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বই হ'চ্ছে প্রধান অঙ্গ। আর এই যজ্ঞের দেবতা হচ্ছেন প্রজাপতি। অধিদৈবত অশ্বমেধ যজ্ঞে সমস্ত স্থূল জগতটাকেই অশ্বরূপে কল্পনা ক'রতে হবে। এই অধিদৈব অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের মস্তক হ'চ্ছে ঊষা; বায়ু প্রাণ; বৈশ্বানর অগ্নিই হ'চ্ছে অশ্বের বিবৃতমুখ, সংবৎসরই অশ্বের দেহ; দ্যুলোক হ'চ্ছে অশ্বের পৃষ্ঠদেশ; অন্তরীক্ষ উদর; পৃথিবীই হ'চ্ছে অশ্বের চরণসমূহ

রাখবার স্থান; দিকসমূহ অশ্বের পার্শ্বদ্বয়; অবান্তর দিকসকল অশ্বের পার্শ্বাস্থিসমূহ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু হ'চ্ছে অশ্বের অবয়বসমূহ; মাস ও অর্দ্ধমাস হ'চ্ছে অশ্বের অবয়বসমূহের সন্ধি; দিবা ও রাত্রি হ'চ্চে অশ্বের চরণ; নক্ষত্র মণ্ডল হচ্চে অশ্বের অস্থিসমূহ; আর ঐ যে গগনস্থিত মেঘমালা, উহাই হতেছে অশ্বের মাংস; বালুকা-রাশিই হচ্চে অশ্বের উদরমধ্যস্থিত অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তান্ন; নদীসমূহই অশ্বের নাড়ী, আর পর্ব্বতমালা হ'চ্চে অশ্বের যকৃৎ ও প্লীহা; তৃণ ও বৃক্ষরাজিই অশ্বের লোমসমূহ; অশ্বের সম্মুখভাগ হ'চ্চে উদীয়মান সূর্য্য, আর অস্তগামী সূর্য্যই অশ্বের পশ্চাদ্‌ভাগ; বিদ্যুৎ হ'চ্চে অশ্বের হাইতোলা; অশ্বের শরীরকম্পনই গর্জ্জন; মেঘ হ'তে বারিবর্ষণই অশ্বের মূত্রত্যাগ এবং মেঘগর্জ্জনই হচ্চে অশ্বের বাক্। আধিভৌতিক অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের সম্মুখে যেমন একটি সুবর্ণময় পাত্র এবং পশ্চাদ্ভাগে একটী রৌপ্যময় পাত্র স্থাপিত হয়, সেইরূপ অধিদৈব যজ্ঞের অশ্বের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত পাত্র দুইটী হ'চ্চে সূর্য্য ও চন্দ্র। এই পাত্রদ্বয়রূপী সূর্য্য ও চন্দ্রের উৎপত্তি স্থান হ'চ্চে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র। এই যে অশ্ব, ইহা হয়রূপে দেবগণকে, বাজীরূপে গন্ধর্ব্বদিগকে, অর্ব্বারূপে অসুরদিগকে এবং অশ্ব হ'য়ে মনুষ্যগণকে বহন করেছিলেন। সমুদ্রই হ'চ্চে অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান। সমস্ত জগতটাকেই অশ্বরূপে কল্পনা ক'রতে হবে। তারপর, ভুজ্যু, এই অশ্বকে করতে হবে উৎসর্গ। ত্রিলোকে যা কিছু ভোগ্যবস্তু আছে, সবই বলি দিতে হবে ভগবানের চরণে। শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ, সবটাই নিবেদন করতে হবে পরমেশ্বরকে। এই জগৎরূপ অশ্বের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, লক্ষ্য রা'খতে হ'বে, এই জগৎরূপ অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান ঐ সমুদ্র বা পরমাত্মার দিকে এই হচ্চে অধিদৈব অশ্বমেধ যজ্ঞ। তুমিত জান, ভুজ্যু, বেদে ঋষিগণ অগ্নিকে অশ্ব, হয়, বাজী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। অশ্ ধাতু থেকে 'অশ্ব' পদটি নিষ্পন্ন

হয়েছে, অশ্ ধাতুর অর্থ এখানে ব্যাপ্তি। অগ্নি সর্ব্বব্যাপী, তাই অগ্নিকে অশ্ব বলা হয়। হি ধাতু থেকে হয়েছে 'হয়'। 'হি' ধাতুর মানে গতি, বিলক্ষণ গতিবিশিষ্ট বলেই অগ্নিকে 'হয়' বলা হয়। 'বাজী' কথাটীও দ্রুতগমন ও বলের দ্যোতক, অগ্নি দ্রুতগামী ও শক্তিমান্ বলে অগ্নিকে *বাজী নামে অভিহিত করা হয়। সামবেদের সেই মন্ত্রটি তোমার নিশ্চয়ই* স্মরণ আছে ভুজ্যু, যেখানে ঋষি বলেচেন—

"অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ সম্রাজন্তমধ্বরানাং।"

আরও তোমাকে বলি ভুজ্যু, সেই ঋক্‌টি স্মরণ করতে, যাতে ঋষি বলেচেন—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুড়ত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

একই অগ্নিকে ঋষিরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) এবং সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরূপে বর্ণনা করেছেন। অগ্নিকে গন্ধর্ব্ব নামেও অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের রসরূপে (অঙ্গানাং রসঃ) অর্থাৎ অঙ্গিরস নামে, ঋষি ও হোতা নামেও অগ্নিকে অভিহিত করা হয়েছে। বৈদিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ অগ্নিকে যে সব বিশেষণে বিশেষিত ক'রেছেন সেগুলি কেবল আধিভৌতিক অগ্নিতে প্রযোজ্য হ'তে পারে না। দেখ ভুজ্যু, তুমি বেদজ্ঞ; তুমিও একথা স্বীকার করবে। তুমিও জান যে বেদে যে সমুদয় মন্ত্র আছে সেগুলির মধ্যে অগ্নি ও ইন্দ্র মন্ত্রগুলিই প্রধান। অগ্নি, জীবের শুভ ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি জীবকে ভগবন্মুখী করে। এই শক্তি, এই অগ্নি প্রতি জীবেই সুপ্ত রয়েছে এই শক্তিকে, এই অগ্নিকে জাগাতে হবে, প্রজ্জলিত ক'রতে হবে। এই শক্তিকে জাগান বড় সহজ নয়। কিন্তু এই অগ্নিকে এই সুপ্ত শক্তিকে একবার জাগাতে পা'রলে, ইহা আর নির্ব্বাপিত হয় না, সেই জন্য এই অগ্নিকে মধুচ্ছন্দা 'অস্বপ্না', 'অস্তব্ধা' বলেছেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি,

তুজ্যু, যে দীক্ষণীয় ইষ্টি দ্বারা যজমানের অন্তঃশরীরে এই অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়, এক জায়গায় জড় করা অতি দীর্ঘ শৃঙ্খলকে যদি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে সেই শৃঙ্খল যেমন ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'তে থাকে, সেইরূপ এই সুপ্ত, কুণ্ডলীকৃত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে যজমানের অন্তর বাহির স্বর্ণজ্যোতিতে উজ্জ্বলীকৃত করে। এই অগ্নি যজমানের মস্তক ভেদ ক'রে শৃঙ্খলাকারে অন্তরীক্ষে উত্থিত হয় এবং তাহার অধঃ ঊর্দ্ধ সর্ব্বদিকে প্রসারিত হ'য়ে যজমানের অন্তর বাহির দিব্য-জ্যোতিতে পূর্ণ করে। এই অগ্নি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হ'য়ে বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর হয়, সেইজন্য এই অগ্নিকে ব্রহ্ম বলে। তখন যজমানের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। যজমান তখন এই অগ্নিতে হোম করেন, আত্মনিবেদন করেন। এই অগ্নিরই আর এক উজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তির নাম ইন্দ্র। এই দিব্য জ্যোতিঃ ঊর্দ্ধ হ'তে এসে যজমানের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার সমস্ত দূষিতরাশি দূর করে, সমস্ত বৃত্রাণি, যজমানের স্বরূপের আবরণ যত কিছু অজ্ঞান সব অপসারিত করে। সেইজন্য এই দিব্যজ্যোতিকে, অগ্নির অন্যতম রূপ এই ইন্দ্রকে বৃত্রঘ্ন বলে। এই অগ্নিতে, এই দিব্য জ্যোতিতে যখন যজমানের ঠিক ঠিক আত্মনিবেদন হয়, যখন ত্রিজগতের সমস্ত ভোগ্যবস্তু হুত হয়, পরিত্যক্ত হয়, তখনই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। যতক্ষণ জ্যোতিঃ ততক্ষণ দর্শন। অগ্নি, ইন্দ্র, পূষা, বৃহস্পতি অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই রূপসকল এই দিব্য জ্যোতিসমূহ যজমান দিব্যদৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই দেখতে পান। কিন্তু যখন অগ্নি, ইন্দ্র, পূষা, বরুণ, বৃহস্পতিরূপ দিব্যজ্যোতিসমূহ যজমানের দেহ, মন, প্রাণ, তার স্থুল, সূক্ষ্ম কারণ সমুদয় শরীরই সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করে, তখন অগ্নির আর এক রূপের বিকাশ হয়, এই রূপ সূক্ষ্ম, অদৃশ্য। অগ্নির এই রূপকে প্রাণ বায়ু, মাতরিশ্ব, বা হিরণ্যগর্ভ বলে। পূর্ব্বেই তোমায় বলেছি, তুজ্যু, যে ঋষিগণ অগ্নিকে সুপর্ণ নামে অভিহিত করেছেন, অগ্নি সুপর্ণরূপে

পারিক্ষিতগণকে সূক্ষ্ম বায়ু বা হিরণ্যগর্ভ অবস্থায় পৌঁছে দেন। যজমান, রূপের রাজ্য ছেড়ে অরূপের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তারপর অগ্নির এই মাতরিশ্বারূপ সূক্ষ্ম বিকাশের সহিত যজমান একীভূত হ'য়ে যান এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই হিরণ্যগর্ভ অবস্থা অনুভব ক'রতে ক'রতে সেই পদলাভ করেন যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারিগণ লাভ করেছেন। এখন তোমায় বলি, ভুজ্যু, যে পতঞ্চলের কন্যাকে যে উপদেবতায় পেয়েছিলেন, তিনি পতঞ্চলের আরাধ্যদেবতা অগ্নিই। সেই উপদেবতা তোমাদিগকে বলেছিলেন যে তিনি অঙ্গিরাবংশ হ'তে জাত। অগ্নিকে ঋষিগণ অঙ্গানাং রসঃ বা অঙ্গিরস নামে অভিহিত করেছেন। সেই গন্ধর্ব্ব অগ্নির সূক্ষ্মতম রূপ বায়ু বা মাতরিশ্বা, বা হিরণ্যগর্ভ, বা ব্রহ্মারই প্রশংসা করেছিলেন। এই হিরণ্যগর্ভেরই বিকাশ হ'চ্ছে এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হ'তে পারেন, ভুজ্যু, তিনি মৃত্যু জয়পূর্ব্বক ক্রমমুক্তি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলে রাখি ভুজ্যু সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মের ফল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তনু ভাগবতী হয়, জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ বাড়ে, ক্রমমুক্তি লাভ হয়; কিন্তু সদ্য মোক্ষ হয় না। মোক্ষই সকলের স্বরূপ, ইহা লভ্য জিনিষ নয়, ইহা প্রাপ্য বস্তু নয়। যত কিছু কর্ম্ম আছে তা হয় উৎপাদ্য, কিংবা সংস্কার্য্য, কিংবা বিকার্য্য কিংবা আপ্য। মোক্ষ ইহার কোনটাই নয়।"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণে ভুজ্যু একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হ'লেন।

ভুজ্যু নীরব হ'লেন বটে, কিন্তু তাতেই কি যাজ্ঞবল্ক্যের রেহাই আছে? ভুজ্যুকে নীরব দেখে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন চক্র নামক ঋষির পুত্র চাক্রায়ণ উষস্ত। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বললেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, গরুগুলি ত নিয়ে গেলে, এখন আমার প্রশ্নের

উত্তর দাও দেখি। বেশ স্পষ্ট ভাষায়, কোন ছল চাতুরী না করে, আমায় বল যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ আত্মার স্বরূপ কি। শিঙে ধরে লোকে যেমন গরুকে দেখায় সেইরূপ "এই সেই আত্মা" এই রকম করে আমার নিকট এই আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।"

উষস্তের এই প্রশ্নবাণে যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীর ভাবে বললেন, "উষস্ত, তোমার এই আত্মাই সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম।" উষস্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কে সেই আত্মা, তার স্বরূপ কি?" যাজ্ঞবল্ক্য উষস্তকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "শোনো উষস্ত, যিনি প্রাণের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করেন, তিনি তোমার এই সর্ব্বান্তর আত্মা; যিনি অপান বায়ুর সাহায্যে অপানের কার্য্য, ব্যান বায়ুর দ্বারা ব্যানের কার্য্য, উদান বায়ুর সাহায্যে উদানের কার্য্য করেন, তিনিই এই সর্ব্বান্তর আত্মা।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে উষস্ত একেবারে হেসে আকুল। উষস্ত কিছুক্ষণ বেশ ক'রে একবার হেসে নিয়ে তারপর যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি নিতান্ত বালক, যদি কেউ বলে "তোমাকে গরু দেখাব, তোমাকে ঘোড়া দেখাব, তারপর যদি সেই ব্যক্তি বলে "যা চলে বেড়ায়, তা গরু, আর যা দৌড়ে যায়, তা অশ্ব।" সেই ব্যক্তির এইরূপ উক্তি যেমন মূর্খতার পরিচায়ক, তুমিও সেইরূপ আমার প্রশ্নের উত্তর অতি মূর্খের ন্যায় দিয়েছ। আমার প্রশ্ন ছিল যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা তিনি কে তাঁর স্বরূপ কি। তার উত্তরে তুমি ব'ললে, যিনি প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান বায়ুর সাহায্যে তাদের স্ব স্ব কার্য্য ক'রেছেন তিনিই এই সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা, তিনিই সাক্ষাৎ অপরোক্ষব্রহ্ম। আমি তোমাকে ব'ললুম "এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করাতে ইহাকে আমাদের সকলের চোখের সামনে ধরে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে যে "এই হ'চ্ছে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, এই

সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম ; তুমি তার কিছু না ক'রে, শুধু সেই আত্মার দু একটী কার্য্যের কথা ব'ললে। গরুগুলি নিয়ে যাবার লোভে যে সব ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছ, সেই সব ছল চাতুরী ছেড়ে দিয়ে এখন স্পষ্ট সাদা কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

উষস্তের প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য ব'ললেন, "শোনো, উষস্ত, আমি পূর্ব্বে যা তোমাকে বলেছি, এখনও ঠিক্ তাই তোমাকে বল্‌ছি, তুমি যে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, সর্ব্বান্তর আত্মার স্বরূপ জান্‌তে চেয়েছ, সেই সর্ব্বান্তর আত্মা হ'চ্ছেন তিনি—যিনি প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, বায়ুর সাহায্যে তাদের স্ব স্ব কার্য্য ক'রছেন।" "শুনুন, ব্রাহ্মণগণ, শুনুন, মহারাজ, এই দাম্ভিক ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরটা একবার শুনুন।" সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং মহারাজ জনককে সম্বোধন ক'রে উষস্ত বার বার এই কথা ব'লতে লাগলেন। তারপর যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে ফিরে জোর গলায় ব'লে উঠ'লন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার ওসব ধাপ্পাবাজী রাখ, এখন স্পষ্ট করে, আঙ্গুল দিয়ে আমায় প্রত্যক্ষ করিয়ে দাও—এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, এই সর্ব্বান্তর আত্মা কে।" উষস্তের অসদ্ব্যবহারে, যাজ্ঞবল্ক্য স্থির অবিচলিত। তাঁহার সেই ধীর গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখ্‌লে বোধ হয় যেন তিনি মান অপমানের অতীত, নিন্দাস্তুতির বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বায় মধুর বচনে উষস্তকে সম্বোধন ক'রে ব'লতে লাগলেন, "শোনো উষস্ত, এই সর্ব্বান্তর আত্মা, এই অপরোক্ষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে যা বলেছি, তার চেয়ে আর বেশী কিছু এর সম্বন্ধে বলা যায় না। তাই তোমাকে বলি উষস্ত, 'ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতেঃ মন্তারং মন্বীথাঃ, ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করবে না, জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানবে না। এই সর্ব্বান্তর আত্মাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখান যায় না। দেখ উষস্ত, আঙ্গুল দিয়ে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেখান যায় সেই বস্তুকে, যে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের

সম্মুখে থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয় আর সেই বস্তুর মধ্যে ব্যবধান থাকা চায়; কিন্তু যে বস্তু সর্ব্বান্তর, প্রতি অণু পরমাণুর মধ্যে অনুস্যূত, যা সব বস্তুর অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, এমন কোন দেশ নাই, যেখানে এ না আছে, এমন কোন কাল নেই, যেখানে এর ভান না হয়, এই যে জগৎ, এই জগৎটাও যাতে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই অখণ্ডৈকরস নিরবয়ব, নিরন্তর আত্মাকে কেমন করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে, তোমার চোখের সাম্‌নে ধ'রবো উষস্ত! তোমার এবং ঐ যে গরুটী চ'রছে এই দুইয়ের মধ্যে আশা করি ব্যবধান আছে, তাই তুমি ঐ গরুটীকে প্রত্যক্ষ করছ। কিন্তু আত্মা যখন সর্ব্বান্তর তখন কেমন ক'রে তাকে তুমি প্রত্যক্ষ ক'রবে? ঘট, পট, গরু, ইত্যাদির মত এই সর্ব্বান্তর আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের সামনে রেখে প্রত্যক্ষ করা যায় না ত উষস্ত, এ যে অসম্ভব, আত্মার স্বভাবই যে এইরূপ! "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য"। আরও দেখ উষস্ত আত্মা সংস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ। এই প্রকাশস্বরূপ আত্মার প্রকাশেই বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ, সমস্ত জগতটাই প্রকাশিত। এমন কি আছে যা এই সর্ব্বপ্রকাশককে প্রকাশিত ক'রতে পারে? যে দ্রষ্টা তাকে আবার কে দেখবে? যে শ্রোতা সে কেমন করে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হবে? সে কি প্রকারে মননের বিষয় হবে? যে বিজ্ঞাতা সেই বা কেমন ক'রে আবার জ্ঞেয় হবে? আমাদের যত কিছু খণ্ড জ্ঞান সবই দেশে এবং কালে হয়, কিন্তু যিনি দেশ কালকেও প্রকাশ করেছেন, তাঁকে কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকাশ ক'রতে পারা যায়? আর এই যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান হ'চ্ছে, সে জ্ঞান হ'চ্ছে বৃত্তিজ্ঞান, সেটা অন্তঃকরণের পরিণাম বিশেষ। এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, এই সর্ব্বান্তর আত্মা বিশুদ্ধচিত্তে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। মলিন দর্পণ থেকে মলিনতা যতই যেতে থাকে মুখবিম্বও যেমন ততই উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হয়, সেইরূপ চিত্ত

যতই শান্ত, সমাহিত হ'তে থাকে ততই নিত্য প্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বান্তর আত্মার বিকাশ হ'তে থাকে। এ আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, উষস্ত, এ আত্মাকে দেখান মানে এ আত্মার অনুভূতি, আপনাতে আপনি প্রকাশ। ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম. ইনিই নিত্য কূটস্থ। ইহা ব্যতীত আর যা কিছু, সবই নশ্বর, সবই ধ্বংসশীল।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণে চক্রমুনির পুত্র উষস্ত চাক্রায়ণ ম্লান মুখে নিজের আসনে নীরবে উপবেশন করলেন।

উষস্ত নীরব হ'লে হবে কি ? কুরুপাঞ্চাল দেশের সব বড় বড় বিদ্বান্ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জনক রাজার সেই সভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। তাঁরা কি সহজে পরাজয় স্বীকার করতে চান ? সুবর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গ সহস্র গাভীর লোভ ব্রাহ্মণেরা ত্যাগ ক'রলেও ক'রতে পারেন, কিন্তু যশ ? পাণ্ডিত্যাভিমান ? লোকৈষণা ? এসব ত্যাগ করা একটু কঠিন। আর জনক রাজাই বা ছাড়বেন কেন ? তাঁর মন এখন ছুটেছে সত্যের সন্ধানে—বেদ প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের দিকে। বেদের লক্ষ্য কি, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি এবং কি প্রকারেই বা সেই লক্ষ্যে পৌছান যায়, এই সব বিষয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মীমাংসিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা জনক কিছুতেই সভা ভঙ্গ ক'রবেন না। বর্ত্তমান রাজাদের মত ত আর তখনকার রাজারা ছিলেন না, এবং তখনকার সভ্যতাও কিছু বর্ত্তমান সভ্যতার মত ছিল না। তখনকার সমাজ, তখনকার রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যে রাজা সেই রাজারও উদ্দেশ্য ছিল আত্মজ্ঞান। তখনকার সভ্যতার মাপকাঠী ছিল **জ্ঞান**, আর এখনকার সভ্যতার মাপকাঠী হ'চ্ছে **অর্থ, টাকা**। তখনকার সভ্যতা মানুষকে ভোগের ভিতর দিয়া পৌছে দিত ত্যাগে, আর এখানকার সভ্যতা মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে একটা ভোগ থেকে আর একটা ভোগে। বাসনার একটা আবর্ত্ত থেকে আর একটা আবর্ত্তে মানুষকে চুবিয়ে

ডুবিয়ে নিয়ে গিয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে শুধু ভোগের তীব্র লালসা আর অতৃপ্ত হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ ও অশান্তি। তখনকার সমাজে কি একেবারেই অশান্তি ছিল না? আর তখন কি সকলেই ত্যাগী পুরুষ হ'য়ে জটাবল্কল ধারণ ক'রে গৌরীশৃঙ্গে গিয়ে দেবদারু-তলায় চোখ বুজে ব'সে থাকত? তা থাকত না। এক একটা সময়ে, এক একটা ভাবের প্রাধান্য থাকে। তখন ছিল আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য। ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি, শূদ্রশক্তি তখন নিয়ন্ত্রিত হ'ত পরার্থ-পর ত্যাগী আত্মজ্ঞানী পুরুষ দ্বারা। রাজা জনক তাই জানতে চেয়েছেন তাঁর সময়ে শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষ কে এবং সেই জন্য কুরুপাঞ্চাল দেশের সব বিদ্বান্, বেদজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষকে ডেকে এক সভা করেছেন। উদ্দেশ্য সেই সভায় কে যে শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, জ্ঞানী তাই স্থির হ'বে এবং তাহ'লে তিনি সেই আত্মজ্ঞ, বেদবিদ ব্রাহ্মণের নিকট আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে উপদেশ লাভ ক'রতে পারবেন। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ ক'রতে ইচ্ছুক, তাঁর জন্য তিনি দক্ষিণারও ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজার দক্ষিণা, সে বড় রকমেরই ছিল। সবৎসা সহস্রা গাভী, আবার সেই গাভীগুলির শিং সোণা দিয়ে মোড়া। কিন্তু যখন রাজা জনক, সেই সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করে ব'ললেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি ঐ সহস্র গাভী গ্রহণ করুন," তখন সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে নীরব দেখে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর শিষ্যকে সেই গাভীগুলিকে নিয়ে তাঁর বাটীতে যেতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য প'ড়লেন মুস্কিলে। বোল্তার চাকে ঘা দিলে, বোল্তারা যেমন সেই আঘাত-কারীকে চারিদিক থেকে আক্রমন করে, সেইরূপ সেই সভার ব্রাহ্মণগণ চারিদিক্ থেকে রা, রা ক'রে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতে লাগলেন। প্রথমে এলেন রাজা জনকের সভাপণ্ডিত অশ্বল,

তারপর আর্ত্তভাগ, আর্ত্তভাগের পর ভুজ্যু, ভুজ্যুর পর উষস্ত। যাজ্ঞবল্ক্য একে একে সকলকেই পরাজিত ক'রে ভা'বলেন আর বুঝি কেউ তাঁর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হবেন না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ভাবলে হবে কি; তিনি যে বোল্‌তার চাকে ঘা দিয়েছেন। উষস্তকে ম্লানমুখে আসনে ব'সতে দেখে, হাস্যমুখে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কুষীতকের পুত্র কহোল। যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করে কহোল ব'লতে লাগলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি উষস্তকে ত যা, তা, ক'রে বুঝিয়ে দিলে, কিন্তু মনে রেখ, কুরুপাঞ্চাল দেশের এই সব ব্রাহ্মণগণ এখনও জীবিত আছেন। আর এই কহোল এখনও মরেনি। উষস্ত তোমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, আমিও তোমাকে সেই প্রশ্নই ক'রছি, আমিও বলছি, যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যা সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা, সেই আত্মতত্ত্ব, আমার নিকট ব্যাখ্যা কর।"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "কহোল, উষস্তের প্রশ্নের উত্তরে এই আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ত আমি করেছি। আমার কথায় তুমি তখন মন দাওনি। তোমার মন বোধ হয় তখন সহস্র গাভীতে পূর্ণ ছিল। যাহোক, উষস্তকে আমি যা ব'লেছি তোমাকেও সেই কথা বলছি, এবার মনোযোগ দিয়ে শোন। তুমি যে আত্মা সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছ, সেই সর্ব্বান্তর আত্মা, সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তোমারই এই আত্মা।"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে কহোল হো, হো করে হেসে ব'লে উঠলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমাকে তুমি উষস্ত পেয়েছ? আমার আত্মা কেমন করে সকলের অভ্যন্তরস্থ হবে, আর কেমন করেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ হবে। সেই কথাটা এই সভার সামনে বিশদ করে বল, ওরূপ হেঁয়ালিতে উত্তর দিও না। যাজ্ঞবল্ক্য, সব সময় এটা বেশ করে মনে রাখবে যে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী হেঁয়ালি জানি।" কহোলের কথায় যাজ্ঞবল্ক্য একটু হেসে ব'ললেন, "কহোল,

আমার কথায় ত বিন্দুমাত্র হেঁয়ালী নেই। তোমার আত্মাই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর। দেখ কহোল, তুমি যে এই হাত নাড়‍্ছ, কথা বল্‌চ, গমনাগমন কর'চ এই যে সব কাজ হ'চ্ছে, একি তোমার এই স্থুল দেহটা ক'রছে? স্থুল দেহটাই যদি কাজ ক'রত, তাহলে মরা মানুষের দেহও গমনাগমন, আদান প্রদান ক'রতে পা'রত। মৃতদেহও কথা বলতে পার'ত, কিন্তু তা ত হয় না, কহোল। তুমি তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে, এমন একটা কিছু আছে, যেটা এই স্থূল দেহকে চালাচ্ছে। হাতকে, পাকে, বাক্‌কে, পায়ু ও উপস্থকে, তাদের নিজের কাজে নিযুক্ত করছে। আরও দেখ কহোল, আমরা সকলেই প্রতিদিন তিনটে অবস্থা অনুভব করে থাকি। এই তিনটে অবস্থা হ'চ্ছে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। যখন আমরা জেগে থাকি, আমাদের এই জাগ্রত অবস্থায়, আমরা শব্দ শুনি, কত বস্তু স্পর্শ করি, কত রূপ দেখি, কত রস, কত ভাল ভাল জিনিষ আস্বাদন করি কত জিনিষের গন্ধ পাই। আমরা যা দিয়ে শব্দ শুনি, তা দিয়ে স্পর্শ করি না, যা দিয়ে স্পর্শ করি তা দিয়ে রূপ দেখি না, আবার এমনি মজা, যা দিয়ে দেখি, তা দিয়ে আস্বাদ করি না, এবং যা দিয়ে আস্বাদ করি, তা দিয়ে আঘ্রাণ করি না। আমরা যেগুলি দিয়ে এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করি, সে গুলির নাম ইন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যেমন পাচটা বিষয়, সেই রকম এই পাচটা বিষয় ভোগ করার জন্য আবার পাচটা ইন্দ্রিয় আছে—শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এই পাচটা হ'চ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি যে আমরা যেগুলির দ্বারা গমনাগমন করি, আদান প্রদান করি, কথা বলি, জনন ও বিসর্জ্জন করি সেগুলি হ'চ্ছে কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাচটী—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু

ও উপস্থ। আর আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে যে প্রাণ ক্রিয়া ক'রচে, সেই প্রাণেরও পাঁচ রূপ।—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ছাড়া আরও একটা জিনিষ আছে, সেই হ'চ্ছে অন্তঃকরণ। এই যে অন্তঃকরণ ইনিও আবার চার রূপ ধরেছেন—মন বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। এখন এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই উনিশটে দরজা দিয়ে আমরা বাইরের ও ভিতরের সব বিষয় ভোগ করছি, বাইরের ও ভিতরের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করছি।

এই বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার; এই যে ইন্দ্রিয়গণ, এই প্রাণ-সমূহ এই যে শরীর এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই যে ভোগ্য বস্তু সকল, এরা নিজেরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র হ'য়ে কোন কিছু ক'রতে পারে না। এদের নিজেদের প্রকাশ নেই, এরা স্বপ্রকাশ নয়। এমন একটা জিনিষ নিশ্চয়ই আছে, যে জিনিষটা বুদ্ধিকে, মনকে, প্রাণকে, বাক্‌কে, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে পরিচালিত করচে। শুধু যে পরিচালিত করচে তা নয়, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সব দেহগুলিকেই সে প্রকাশ করচে। জাগ্রতের পর স্বপ্ন, স্বপ্নের পর সুষুপ্তি, সুষুপ্তির পর আবার জাগ্রত; এইরূপে অবস্থার পর অবস্থা আসচে, যাচ্চে; কিন্তু এই যে প্রকাশশীল জিনিষটী, এ ঠিক সমান ভাবে রয়ে যাচ্চে। এই প্রকাশ স্বরূপ, এই চিৎ স্বরূপ জিনিষটী, এই সৎস্বরূপ বস্তুটীর কখনও ব্যভিচার হ'চ্চে না। এই সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ জিনিষটী জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকে প্রকাশ করচে। স্বপ্নের অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থার পদার্থ নেই, সুষুপ্তিতে স্বপ্নও নেই জাগ্রতও নেই কিন্তু এই নিত্য সৎস্বরূপ প্রকাশস্বরূপ বস্তুটী সমানভাবে বিদ্যমান আছে।

আবার দেখ, কহোল, সমাধিতে জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তি কিছুই নেই, সেখানে প্রপঞ্চ শান্ত। না আছে প্রমাতা, না আছে প্রমেয়, না আছে প্রমাণ। এই যে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ সতত প্রকাশশীল বস্তুটী, এই নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যই অস্মৎ প্রত্যয়ের (আমি এই জ্ঞানের) লক্ষ্য আত্মা এই অখণ্ড, একরস, সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। যে জিনিষটে অখণ্ড, একরস, সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ, সে কখন বহু হ'তে পারে না। বহু মানেই পরিচ্ছিন্ন, বহু মানেই খণ্ড, ভেদ-বিশিষ্ট। এই যে অখণ্ড একরস চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ইহা সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত, সেই জন্যই ইহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। এই কাপড়-খানাকে আমি দেখ্‌চি, ইহা আমার ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়েছে, কিন্তু এই কাপড়কে এবং আমার অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলিকে প্রকাশ করচে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাকে কেমন ক'রে ইন্দ্রিয়ের বিষয় করবে। যে ইন্দ্রিয়কে প্রকাশ করচে তাকে আবার কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করবে। আত্মা এবং আত্মানুভূতির মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। সেইজন্য আত্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। এই আত্মাই সর্ব্বপ্রকাশক বলে সর্ব্বান্তর।"

কহোল সহসা যাজ্ঞবল্ক্যকে বাধা দিয়া বলে উঠলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, থাম, থাম, ঢের হয়েছে, তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার জবাব না দিয়ে বেশ পাশ কাটিয়ে চ'লেচ দেখছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম সর্ব্বান্তর আত্মা কোন্‌টী? 'আত্মা' বলতে 'অহং' "অহং" বা 'আমি' "আমি" এই যে আমাদের অন্য-পর-জ্ঞান হ'চ্ছে, এই অহং জ্ঞানের, 'আমি' এই জ্ঞানের গোচর যে বস্তুগুলি হ'চ্ছে যা দিগকে আমরা আত্মা বলচি, সেই আত্মাগুলির মধ্যে কোন্ আত্মাটী সর্ব্বান্তর? দেখ যাজ্ঞবল্ক্য, এখন এই জাগ্রত অবস্থায়, আমি ব'লতে এই স্থূল শরীরকেই অন্নময় আত্মাকেই ত বুঝে থাকি। শুধু যে এই অন্নময়

এই যে সর্ব্বপ্রকার এষণারহিত আত্মতৃপ্ত অবস্থা ইহাই মুক্তি, ইহাই মোক্ষ। এই মুক্ততা ব্যতীত আর যাহা কিছু, সবই অবিদ্যাগ্রস্ত, সবই শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত। এবার বুঝেছ কহোল।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণে কহোল নিরুত্তর হয়ে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হলেন।

কহোল নীরবে স্বীয় আসনে উপবেশন করলে, রাজা জনকের সেই ব্রাহ্মণমণ্ডিত সভা কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হ'ল। আর কোন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে অগ্রসর হন না দেখে বচক্নুঋষির দুহিতা বাচক্নবী গার্গী নিঃশঙ্কচিত্তে যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সেকালের মেয়েরা ত আর একালের মেয়েদের মত ছিল না। সেকালের মেয়েরা পর্দ্দানশীল ছিল না। কিন্তু তাই ব'লে তারা চুল কেটে বুট প'রে পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে শালীনতা ত্যাগ ক'রত না। পুরুষের বৃত্তিও তারা সর্ব্বপ্রকারে অপহরণ করবার চেষ্টাও ক'রত না। অনেক মেয়ে বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা হ'য়ে ঋষিত্বলাভও করেছিলেন। অনেকেই ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস এবং ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যায় পণ্ডিতা ছিলেন। তখন পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও শিক্ষালাভ ক'রতেন। সবই ঠিক, সবই সত্য। কিন্তু তাদের সে শিক্ষা তাঁহাদিগকে বিনয়, সদাচার, হৃদয়ের কোমলতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বামী, পিতা মাতা, পুত্র এবং পরিবারের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসাই শিক্ষা দিত। আর এখন? এখন এই বর্ত্তমান শিক্ষা কি স্ত্রী কি পুরুষ, তাহাদের কাহাকেও মনুষ্যত্বলাভের, আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত অধিকারী করে তুলতে অসমর্থ। বর্ত্তমান শিক্ষা কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলকেই উচ্ছৃঙ্খল, ভোগবিলাসী করে তুল্‌তেছে। কিন্তু সেই সময়, মুনি ঋষিরা শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। এক অপরা, আর এক পরা। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সব শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সব শিক্ষা অপরা বিদ্যার

অন্তর্গত। তখনও ছেলেমেয়েদিগকে অপরা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কিন্তু সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'ত পরাবিদ্যা দ্বারা, পরাবিদ্যাই ছিল সমাজের লক্ষ্য। এই পরাবিদ্যা হ'চ্চে সেই বিদ্যা, যে বিদ্যাদ্বারা নিজ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তাই, সেই সময় বড় বড় ত্যাগী, বড় বড় জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও ভক্ত স্ত্রী ও পুরুষ সমাজকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যাতেও স্ত্রীলোক অতি উচ্চস্থান অধিকার করতেন। তখনকার ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গার্গীর স্থান অতি উচ্চে ছিল। এমন কি, জনকরাজার সেই বেদজ্ঞ-ব্রহ্মবিদ্-ব্রাহ্মণ-সভাতেও গার্গী নিমন্ত্রিতা হ'য়ে এসেছিলেন।

গার্গী যে শুধু সেই সভাতে চুপ ক'রে বসেছিলেন তা নয়, প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব যাহাতে নির্ণীত হয় সে বিষয়ে তিনি সভাকে যথেষ্ট সাহায্যও করেছিলেন। সেইজন্য যখন কহোল পরাস্ত হ'য়ে মনের দুঃখে নিজের আসনে বসে পড়লেন, তখন এই মনঃস্বিনী ব্রহ্মবাদিনী গার্গী নির্ভয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে প্রশ্ন ক'রলেন—

গার্গী। আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি এই যে, স্থূল জগৎ যাহা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে অপ্ অর্থাৎ জলরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যে জলে এই পৃথিবী ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে, সেই জল আবার কিসে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। গার্গী, তুমি যে জলের কথা বলেছ, সেই জল বায়ুতে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে।

গার্গী। সেই বায়ু আবার কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। বায়ু অন্তরীক্ষলোকে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে।

গার্গী। অন্তরীক্ষলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। অন্তরীক্ষলোক গন্ধর্ব্বলোকে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে।

গার্গী। গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। আদিত্যলোকে।

গার্গী। আদিত্যলোক কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। চন্দ্রলোকে।

গার্গী। চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। নক্ষত্রলোকে।

গার্গী। নক্ষত্রলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। দেবলোকে।

গার্গী। দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। ইন্দ্রলোকে।

গার্গী। ইন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত হ'য়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। প্রজাপতিলোকে।

গার্গী। প্রজাপতিলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত হয়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। ব্রহ্মলোকে।

গার্গী। ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত হয়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। গার্গি, অতি প্রশ্ন কোরোনা। যে দেবতার সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন ক'রছ, সে দেবতা অনুমানগম্যা নয়। তুমি যদি এইরূপ অনুচিত প্রশ্ন কর, তাহলে তোমার মস্তক খসে প'ড়বে। কেন মারা যাবে গার্গি! যদি বেঁচে থাকতে ইচ্ছে কর, তাহলে এরূপ অতি প্রশ্ন আর কোরোনা।

যাজ্ঞবল্ক্যের চোখ রাঙানিতে গার্গী কিন্তু আদৌ ভয় পেলেন না। যিনি ব্রহ্মবাদিনী, জন্মমৃত্যু তাঁর পায়ের নীচে; জন্মমৃত্যু তাঁর নিকট অসৎ, মনের স্পন্দন মাত্র; তিনি কি আর মৃত্যুকে ভয় করেন? গার্গী অকম্পিত হৃদয়ে সেই শত শত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যস্থলে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গার্গীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যাজ্ঞবল্ক্য একটু হেসে বল্লেন, "গার্গী, তুমি যে দেবতা সম্বন্ধে, যে আত্মা বা

ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ, সেই আত্মা, সেই ব্রহ্ম, সেই পরমেশ্বর শুধু আগমগম্য কেবল বেদপ্রতিপাদ্য। বেদ-শুধু "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তৎ ত্বম্ অসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই সব বাক্যদ্বারা সেই মনের অগোচর নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্বকে ঠারেঠোরে জানিয়ে গেছেন। এই আত্ম-সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন ক'রতে হয়, তাহলে সেই প্রশ্নের প্রণালী, রীতি অন্য রকম। তুমি শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে আমাকে প্রশ্ন ক'রচ। কিন্তু গার্গি, তুমি নিজে ব্রহ্মবাদিনী, তোমার এটা বুঝা উচিৎ ছিল যে, আত্মা অপ্রমেয়। আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নন। আর যখন অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, অনুমানের দ্বারা কেমন ক'রে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হ'তে পারে গার্গি? আমাদের যত কিছু জ্ঞান হ'চ্ছে সবই বৃত্তি-জ্ঞান। ঐ যে সিংহাসনের উপর মহারাজ জনক বসে আছেন, ঐ সিংহাসনে জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আমাদের চোখে ঐ সিংহাসনের ছবি পড়চে, আর আমাদের চিত্ত ঐ সিংহাসনরূপে পরিণত হ'চ্ছে। চৈতন্য পরিব্যাপ্ত চিত্তের এই যে বিষয়াকারে পরিণাম, এই পরিণামটাই হ'চ্চে বৃত্তি। আমাদের যত কিছু জ্ঞান সব এই বৃত্তিবিশিষ্ট হ'য়ে হচ্ছে। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ 'অহং'এর, জ্ঞাতার প্রকৃত স্বরূপ এবং বিষয়ের জ্ঞেয়ের প্রকৃত স্বরূপের মাঝখানে ভ্রান্তজ্ঞানজনিত অন্তঃকরণের পরিণামরূপ এক একটা বৃত্তিরূপ ব্যবধান এসে পড়চে। অজ্ঞান জনিত নামরূপাত্মক এই বৃত্তিরূপ ব্যবধান থাকায় আমরা না পারচি 'অহং'এর 'আমির' জ্ঞাতার প্রকৃতস্বরূপ জানতে, না আমরা জানতে পারচি জ্ঞেয়ের, বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ। আমাদের জ্ঞান ক্রমাগত নামরূপে আকারিত হ'য়ে চলেছে। আমাদের জ্ঞানে এইরূপে অজ্ঞানের একটা পর্দ্দা যেন ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রে ক'রে চলেছে। কিন্তু গার্গি,

আত্মা, বা ব্রহ্ম, হচ্ছেন, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। আত্মজ্ঞানে কোন ব্যবধান নেই। এই জ্ঞান বৃত্তিবিশিষ্ট নয়। তাই বলচি গার্গি, যে জিনিষটা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, যে বস্তুটী কোন প্রমাণের বিষয় নয়, সেই পদার্থটিকে তুমি অনুমানের দ্বারা প্রতিপাদিত ক'রতে ইচ্ছে করেছ, সেই জন্য তোমার প্রশ্নকে আমি অতিপ্রশ্ন বলেছি, ব্রহ্মবিদ্ সমাজে এই অতি প্রশ্নকারীর মস্তক খসে পড়ে, তার অপযশ হয়। তোমার প্রশ্নের সার মর্ম্ম হ'চ্চে এই যে—প্রত্যেক কার্য্য তার কারণে ওতপ্রোত হয়ে আছে, যাহা স্থূল, তাহা সূক্ষ্মদ্বারা পরিব্যাপ্ত, যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা কার্য্য, যাহা ব্যাপ্য, তাহা সূক্ষ্ম, ব্যাপক কারণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ, ব্যোম এই যে পঞ্চভূত, ইহারা নিজ নিজ কারণে, ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। ক্ষিতি জলে, জল বায়ুতে, বায়ু আকাশে, এবং এই স্থূল সূক্ষ্ম পঞ্চভূত নির্ম্মিত অন্তরীক্ষলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক, গন্ধর্ব্বলোক, সবই স্ব স্ব কারণে ওতপ্রোত। আবার এই সব জগৎ ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে। ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত হয়ে আছে? এ প্রশ্ন তোমার অতিপ্রশ্ন গার্গি, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে বলতে হয়—ব্রহ্মলোক আত্মাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। কিন্তু এই যে উত্তর ইহা অবৈদিক। কারণ শ্রুতি বলেন, এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই ব্রহ্ম অনন্তর, অবাহ্য, নিরবয়ব, পূর্ণ, স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত, সুতরাং তাতে ভেদ কেমন করে থাকবে? সে কেমন করে কারণ-পদবাচ্য হবে? সেই সৎ ও চিৎস্বরূপ আত্মা বা পরমেশ্বর ব্যতীত যখন অপর কোন পদার্থ নাই, তখন আত্মা কি প্রকারে কারণ হ'তে পারে? সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত, নিরবয়ব, অখণ্ড, একরস পদার্থ কি প্রকারে অপর কিছু ওতপ্রোত হয়ে থাকবে? প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় যাঁর সত্তায়, যাঁর প্রকাশে

সত্তাবান তাঁকে কোন্ প্রমাতা কোন্ প্রমাণ দ্বারা ঘটপটের মত প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা জানতে পারে? তাঁকে কেবল আত্মরূপেই উপলব্ধি করা যায় গার্গি। তাই বলি গার্গি, তুমি এইরূপ অতিপ্রশ্ন ক'রে বিদ্বদ্‌সমাজে নিন্দনীয় হয়ো না।" যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় গার্গী স্বীয় আসনে গিয়া উপবেশন ক'রলেন।

গার্গীকে স্বীয় আসনে উপবেশন ক'রতে দেখে ব্রহ্মবিদ্ উদ্দালক আরুণি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ, মুখ, সমস্ত দেহ দিয়েই ব্রহ্মতেজ ফুটে বেরুচ্ছে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানের গভীরতায়, বেদে পারদর্শীতায় তিনি সেই সময়কার ঋষিসমাজে অতি উচ্চ স্থানই অধিকার করেছিলেন। এহেন ব্রহ্মবিদ্ উদ্দালক আরুণি যখন যাজ্ঞ-বল্ক্যের সম্মুখীন হ'লেন, তখন সেই সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগের ম্লানমুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল। উদ্দালক আরুণি কি বলেন তাই শুনবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলেন। তখনকার ব্রাহ্মণ সভা এখনকার সভার মত ছিল না। সকলেই সভায় গিয়ে একসঙ্গে গোলমাল করতেন না; সকলেই একসঙ্গে নিজের মত প্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন না। একজন যখন নিজের মত প্রকাশ করছেন তখন আর পাঁচজন তাঁকে বাধা দিয়ে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করে একটা হট্ট-গোলের সৃষ্টি ক'রতেন না। তখন সভাস্থ সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল সত্যনির্ণয়; আর এখনকার সভাস্থ লোকদিগের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যেন তেন প্রকারেণ নিজ নিজ জেদ বজায়। তাই যখন উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যেকে প্রশ্ন করার জন্য অগ্রসর হ'লেন, তখন সভার সেই শত শত ব্রাহ্মণ নীরবে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

উদ্দালক আরুণি অগ্রসর হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন; "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা এক সময়ে মদ্রদেশে যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্য পতঞ্চলের গৃহে অবস্থান করেছিলাম। পতঞ্চলের স্ত্রী গন্ধর্ব্বাবিষ্টা

ছিলেন। সেই গন্ধর্ব্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তুমি কে?" এই প্রশ্ন শুনে সেই গন্ধর্ব্ব আমাদিকে ব'লেছিলেন, "আমি অথর্ব্বনের পুত্র কবন্ধ"। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সেই গন্ধর্ব্ব পতঞ্চল এবং সেখানে যে সব অন্যান্য ঋত্বিকগণ ছিলেন তাঁহাদিগকে এক প্রশ্ন ক'রলেন। সে প্রশ্নটী এই:—"হে পতঞ্চল, তুমি কি সেই সূত্রকে জান যার দ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং সমুদয় ভূত গ্রথিত হয়ে আছে?" গন্ধর্ব্বের প্রশ্ন শুনে পতঞ্চল বলেছিলেন, "হে ভগবন্! আমি জানি না"। তখন গন্ধর্ব্ব পতঞ্চল ও উপস্থিত যাজ্ঞিকদিগকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "ওহে, তোমরা কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি সকলের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থেকে ইহলোক, পরলোক এবং ভূত সমুদয়কে নিয়মিত ক'রছেন।" গন্ধর্ব্বের এই প্রশ্নে সকলেই নির্ব্বাক। তখন পতঞ্চল হাত জোড় করে বললেন—"ভগবন! এই অন্তর্যামী পুরুষ সম্বন্ধে আমি তো কিছুই জানি না"। তখন সেই গন্ধর্ব্ব তথায় উপস্থিত ঋত্বিকগণও পতঞ্চলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন— "শোন, তোমরা সকলেই শোন—যে ব্যক্তি এই সূত্র এবং অন্তর্যামীকে জানেন তিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই লোকবিৎ, তিনিই দেববিৎ, তিনিই বেদবিৎ, তিনিই ভূতবিৎ, তিনিই আত্মবিৎ, তিনিই সর্ব্ববিৎ।" শোন যাজ্ঞবল্ক্য, এই সূত্র এবং অন্তর্যামী যে কে তাহা সেই গন্ধর্ব্ব আমাদিগকে বলেছিলেন। বুঝেছ যাজ্ঞবল্ক্য, আমি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানি। এখন তোমাকে আমি বলছি তুমি যদি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে না জেনে ব্রহ্মজ্ঞের প্রাপ্য এই গাভীগুলি নিয়ে যাও, তাহলে তোমায় নিশ্চয় বলে রাখছি যে আমার শাপে তোমার মাথা খসে পড়বে।" উদ্দালক আরুণির এই প্রশ্ন শুনে যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীর ভাবে বললেন, "উদ্দালক; সেই সূত্র ও অন্তর্যামীর যে তত্ত্ব গন্ধর্ব্ব তোমাকে বলেছিলেন আমি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে বিলক্ষণ

জানি"। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে আরুণি হো হো ক'রে হেসে সমবেত ব্রাহ্মণগণ ও মহারাজ জনককে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, "শুনুন মহারাজ, ব্রাহ্মণগণ, আপনারাও শুনুন, এই হায় বড়া যাজ্ঞবল্ক্যের বালকের মত কথা। যাজ্ঞবল্ক্য, শুধু কথায় তুমি আমাকে ভুলাতে পারবে না; শুধু "জানি" বললে হবে না। এই সূত্র ও অন্তর্যামী সম্বন্ধে কি জান তা, এই সভার সমক্ষে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল।"

আরুণির কথায় যাজ্ঞবল্ক্য বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন, "আরুণি, তোমার অভিশাপে আমি বিন্দুমাত্রও ভীত নহি। আমি আদৌ বালকের ন্যায় কথা বলিনি। সত্যের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, নিষ্ঠা নেই, সেই অসত্যবাদীরাই শাপে ভীত হয়। কিন্তু এটা জেনো উদ্দালক, যে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ থেকে সত্য ছাড়া কখনও মিথ্যা বেরোই নি। এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শুনো। গৌতম, যে সূত্রের কথা গন্ধর্ব্ব তোমাকে বলেছিলেন, বায়ুই সেই সূত্র। হে গৌতম, হে উদ্দালক, সেই বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা ইহলোক, পরলোক আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদয় ভূত গ্রথিত রয়েছে। এই জন্যই গৌতম, লোক যখন ম'রে যায়, তখন সেই মৃত পুরুষকে লক্ষ্য করে লোকে বলে থাকে যে মৃত ব্যক্তির হাত, পা, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে শিথিল হ'য়ে গেছে। কেন ঐ কথা বলে তা জান আরুণি? ঐ কথা বলে, কারণ বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিধৃত হ'য়ে থাকে, আর সেই বায়ু তখন চলে যায়, তাই লোকে ঐ কথা বলে। এই যে বায়ু ইনিই প্রাণ, ইনিই সূত্রাত্মা, ইনিই হিরণ্যগর্ভ। স্থূল, সূক্ষ্ম, সমুদয় জগৎ ঘনীভূত হ'য়ে, একীভূত হয়ে এই বায়ুতে, এই প্রাণে, এই সূত্রাত্মায়, এই হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত। যাকে আমরা জীবন বলি এই বায়ু, এই প্রাণই সেই জীবনীশক্তি। এই প্রাণই সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে, তন্মাত্রা পঞ্চভূতরূপে দেবতা, তির্য্যক, নর, পশু,

উদ্ভিদ্ প্রভৃতি প্রাণীরূপে, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোক ও সেই সেই লোকস্থিত অধিবাসীরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, ফুটে পড়েছে। মণিগণ যেমন একসূত্রে গ্রথিত থাকে, ফুল সকল যেমন এক সুতায় গাঁথা থাকে, সেইরকম স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎ এই বায়ুতে, এই প্রাণে বিধৃত রয়েছে; আরো দেখ গৌতম, আমাদের এই শরীরে প্রাণের খেলা! যখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গণ মনে একীভূত হয়, মন যখন সুপ্ত, বুদ্ধি যখন চেষ্টাহীন, যখন আমরা কোন কামনা করি না, স্বপ্ন দেখি না, শুধু অঘোরে নিদ্রা যাই, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় জাগরিত থাকে একমাত্র এই প্রাণ। এই প্রাণই নিজকে প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান ও সমান এই পাঁচভাগে বিভক্ত করে এই শরীরের ক্রিয়া ঠিক ঠিক বজায় রাখে। কিন্তু যখন এই প্রাণ নিষ্ক্রিয় হয়, প্রাণবায়ু যখন আমাদের শরীরকে ত্যাগ করে, তখন আমরা বলি লোকটি মরে গেছে। এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব শিথিল হয়ে গেছে। তাই বলি উদ্দালক, এই প্রাণ, এই বায়ুই সমস্ত জগৎকে বিধৃত করে আছে ব'লে এই বায়ুই সেই সূত্র যার কথা সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে বলেছিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে আরুণি ত একেবারে অবাক্। যাজ্ঞবল্ক্যের উপর তখন তাঁর শ্রদ্ধা হ'ল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করে বললেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি ঠিকই বলেছ; এখন এই সূত্রেরও নিয়ামক সমুদয় জগতের অন্তর্যামী পুরুষের তত্ত্বটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও!"

যাজ্ঞবল্ক্য তখন বলতে লাগলেন, "শোন উদ্দালক, আমি বেশ স্পষ্ট করেই তোমাকে সেই অন্তর্যামী পুরুষের কথা বলছি।

যিনি পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু যিনি পৃথিবী হ'তে পৃথক, পৃথিবী যাঁকে জানে না, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে পৃথিবীকে নিয়মিত করেন তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনি অন্তর্যামী, অমৃতস্বরূপ।

যিনি জলে বিদ্যমান, অথচ যিনি জল নন, জল যাঁকে জানে না, জল যাঁর শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থেকে জলকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, অমৃতস্বরূপ।

যিনি অগ্নিতে বর্ত্তমান, কিন্তু অগ্নি হ'তে পৃথক, অগ্নি যাঁকে জানে না, অগ্নি যাঁর শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থেকে অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনি অন্তর্যামী, তিনি অমৃত।

যিনি অন্তরীক্ষে অবস্থিত, অথচ যিনি অন্তরীক্ষ নন, অন্তরীক্ষ যাঁকে জানে না, অন্তরীক্ষই যাঁর শরীর, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যিনি বায়ুতে আছেন, কিন্তু যিনি বায়ু হ'তে পৃথক, বায়ু যাঁকে জানে না, বায়ুই যাঁর শরীর, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থেকে বায়ুকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যিনি দ্যুলোকে বিদ্যমান, দ্যুলোক হ'তে যিনি পৃথক, দ্যুলোক যাঁকে জানে না, দ্যুলোকই যাঁর শরীর, যিনি দ্যুলোকের অভ্যন্তরে থেকে দ্যুলোককে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনি অমৃত অবিনাশী।

যিনি আদিত্যে বর্ত্তমান থেকে, আদিত্য হ'তে পৃথক, আদিত্য যাঁকে জানে না, আদিত্য যাঁর শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থেকে আদিত্যকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থান করেন, দিক্‌সমূহ হ'তে পৃথক, দিক্‌সমূহ

যাঁহাকে জানে না, দিক্‌সমূহই যাহার শরীর, যিনি অ... থেকে দিক্‌সমূহকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত অবিনাশী।

যিনি ঐ চন্দ্র তারকায় অবস্থিত, অথচ চন্দ্র তারকা হ'তে ভিন্ন, চন্দ্র তারকা যাঁকে জানে না, চন্দ্র তারকাই যাঁর শরীর, যিনি চন্দ্র তারকার অভ্যন্তরে থেকে চন্দ্র তারকাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত।

যিনি আকাশে থেকেও আকাশ হ'তে পৃথক, আকাশ যাঁকে জানে না, আকাশই যাঁর শরীর, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে থেকে আকাশকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত তিনিই অবিনাশী, তিনিই তোমার সর্ব্বভূতের আত্মা,

যিনি আঁধারে বিদ্যমান্, অন্ধকার যাঁকে জানে না, অন্ধকার হ'তে যিনি পৃথক, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি তেজে আলোকে বর্ত্তমান, কিন্তু তেজ হ'তে ভিন্ন, তেজ যাঁকে জানে না, তেজই যাঁর শরীর, যিনি তেজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থেকে তেজকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

শোন উদ্দালক, তোমায় আবার বলি, যিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে; যিনি অগ্নিতে, বায়ুতে, দ্যুলোকে; যিনি আকাশে, আঁধারে, আলোকে; যিনি সমস্ত অধিদৈবত বস্তুতে বিদ্যমান থেকেও সেই সেই বস্তু হ'তে ভিন্ন, সেই সেই অধিদৈবত বস্তু যাঁর শরীর এবং যিনি সেই বস্তুগুলির অভ্যন্তরে থেকে তাহাদিগকে নিয়মিত, তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের অন্তর আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

শোন উদ্দালক, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান অথচ যিনি সমুদয় আধি-ভৌতিক বস্তু হ'তে পৃথক, আধিভৌতিক বস্তু সমূহ যাঁকে জানে না, আধিভৌতিক বস্তু সমূহ যার শরীর, যিনি সমুদয় আধিভৌতিক বস্তুর অভ্যন্তরে বিদ্যমান থেকে তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অবিনাশী, তিনিই অন্তর্যামী।

তিনি যে শুধু সমস্ত অধিদৈব এবং সমস্ত অধিভূত পদার্থের অন্তর্যামী, তা নয় উদ্দালক ; বেশ মনোযোগ দিয়ে শোন।

যিনি প্রাণে বিদ্যমান, অথচ প্রাণ হ'তে ভিন্ন, প্রাণ যাহাকে জানে না, প্রাণই যার শরীর, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থেকে প্রাণকে নিয়মিত করেন তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি বাক্যে বর্ত্তমান কিন্তু বাক্য হ'তে ভিন্ন, বাক্য যাকে জানে না, বাক্যই যার শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থেকে বাক্যকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষু হ'তে যিনি ভিন্ন, চক্ষু যাহাকে জানে না, চক্ষু যার শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থেকে চক্ষুকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার আত্মা, তিনিই অবিনাশী, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি কর্ণে বিদ্যমান অথচ শ্রবণ হ'তে পৃথক, শ্রবণেন্দ্রিয় যাঁকে জানে না, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার শরীর, যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি মনে বর্ত্তমান, অথচ মন হ'তে পৃথক, মন যাঁকে জানে না, মনই যাহার শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থেকে মনকে নিয়মিত

করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে বিদ্যমান ত্বগিন্দ্রিয় হইতে পৃথক, ত্বগিন্দ্রিয় যাহাকে জানে না, ত্বগেন্দ্রিয় যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থেকে ত্বগিন্দ্রিয়কে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি বুদ্ধিতে বিদ্যমান অথচ বুদ্ধি হ'তে ভিন্ন, বুদ্ধি যাহাকে জানে না, বুদ্ধি যাহার শরীর, যিনি বুদ্ধির অভ্যন্তরে থেকে বুদ্ধিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি রেততে, শুক্রে, প্রজননশক্তিতে বিদ্যমান থাকিয়াও রেতঃ হ'তে ভিন্ন, রেতঃ যাহাকে জানে না, রেতঃ যাঁহার শরীর, যিনি রেতঃ শক্তির অভ্যন্তরে থেকে রেতঃকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

কি অধিভূত, কি অধিদৈব, কি অধ্যাত্ম, সমুদয় বস্তুতে তিনি বিদ্যমান থেকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকেই নিয়মিত করছেন। তাঁর সত্তায় তাঁর প্রকাশে সমস্ত জগৎ আছে বলে বোধ হয়, সমস্ত জগৎ তাঁরই প্রকাশে প্রকাশিত। এই অন্তর্যামী পুরুষ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশস্বরূপে তিনি চক্ষু আদিতে সর্ব্বদা বিদ্যমান। ঘট যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করতে পারে না, সূর্য্য যেমন ঘটকে প্রকাশ করে, সেইরূপ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ তাকে প্রকাশ করতে পারে না, তিনিই চক্ষু শ্রোত্রাদিকে প্রকাশ করেন। স্বপ্রকাশরূপে চক্ষুশ্রোত্রাদিতে নিত্য বিদ্যমান থাকায় তিনি অদৃষ্ট হয়েও দ্রষ্টা, অশ্রুত হয়েও শ্রোতা। মন তাকে জানতে পারে না, অমত হইয়াও তিনি মন্তা। ঘট-পটাদির ন্যায় এবং সুখদুঃখাদির ন্যায় তিনি বুদ্ধির বিষয়ীভূত হন না; কিন্তু অবিজ্ঞাত হয়েও তিনিই বিজ্ঞাতা। এই অন্তর্যামী ব্যতীত অন্য কেহই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই, এই অন্তর্যামী ব্যতীত আর যা কিছু আছে, তা সমস্তই আর্ত্ত, সমস্তই বিনাশশীল। একমাত্র

এই অন্তর্যামীই স্বয়ংপ্রকাশ, এই অন্তর্যামীই অমৃত, অবিনাশী, সর্ব্ববিধ-সংসার ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, এক অদ্বিতীয় অখণ্ডৈকরস। এই অন্তর্যামী তোমার আমার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের আত্মা।"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে উদ্দালক আরুণির মুখে আর কথাটি বেরুলো না। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে নিজের আসনে গিয়ে উপবিষ্ট হ'লেন। সভা কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইল।

উদ্দালক আরুণির ন্যায় অত বড় বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্ যখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে স্বীয় আসনে গিয়ে উপবেশন ক'রলেন, তখন সেই সভাস্থ কোন ব্রাহ্মণই যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে আর সাহসী হ'লেন না। সভা নীরব। কিন্তু সভার সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলেন তেজস্বিনী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। গার্গী বিনীতভাবে সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক ব'লতে লা'গলেন। ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহলে বুঝবেন যে আপনাদের মধ্যে কেহই যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাস্ত ক'রতে পারবেন না।" ব্রাহ্মণগণ গার্গীকে অনুমতি প্রদান করায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হ'য়ে তেজস্বিতার সহিত বলতে লাগলেন, "শোনো, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কাশীপ্রদেশের বীর সন্তানকে নিশ্চয়ই দেখেছ, আর এই বিদেহরাজ্যের বীরপুরুষদিগের কীর্ত্তিও তোমার অবিদিত নেই। তাহাদের ধনু কি বিশাল তা দেখেছ ত? সেই বিশাল গুণবিযুক্ত ধনুতে পুনরায় জ্যাযুক্ত ক'রে সেই অধিজ্যধন্বা বীরসন্তান শত্রুসংহারকারী ফলাযুক্ত দুইটি শর দুই হস্তে ধরিয়া যেমন শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেইরূপ, যাজ্ঞবল্ক্য, সেইরূপ আমিও দুইটী বাণরূপ দুটী প্রশ্ন নিয়ে

তোমার সম্মুখে এসেছি; এখন আমার এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তর তুমি বল।"

উদ্দালক আরুণির পাণ্ডিত্য, গার্গীর তেজস্বিতা সবই যেন তপোজ্জ্বল মূর্ত্তি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ম্লান, নিষ্প্রভ। কিছুই যেন সেই নিবাত নিষ্কম্প সমুদ্রবৎ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশান্ত হৃদয়কে স্পর্শও ক'রতে পাচ্ছে না। গার্গীর কথায় যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীরভাবে বল্লেন, "গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর।" গার্গী তখন ব'লতে লা'গলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি উদ্দালক আরুণির প্রশ্নের উত্তরে যে সূত্রের কথা বলেছিলে, যে সূত্রে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদয় ভূত বিধৃত হয়ে আছে, যে সূত্র দ্যুলোকেরও উপরে, আর এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবীরও নিম্নবর্ত্তী; যে সূত্র এই পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্ত্তী; যে সূত্রকে পণ্ডিতগণ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বলিয়া নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন, সেই সূত্র, বল দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সূত্র কোথায় ওতপ্রোত হয়ে আছে?" গার্গীর প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য ধীরভাবে বলতে লাগলেন, "শোন গার্গি, তুমি যে সূত্রের কথা ব'ল্লে, যে সূত্র দ্যুলোকেরও উপরে, পৃথিবীরও নিম্নবর্ত্তী, যাহা পৃথিবী ও দ্যুলোকেরও মধ্যেও বিদ্যমান, যাহাকে পণ্ডিতগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সূত্র আকাশে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে।"

যাহারা মহাত্মা তারা শত্রুর সদ্‌গুণকেও প্রশংসা করেন, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা অপরের পাণ্ডিত্যেও মুগ্ধ হন। তাই যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে গার্গী ব'লে উঠলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, তোমায় নমস্কার, তুমি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরই দিয়েছ। আমার এই প্রথম প্রশ্ন স্বরূপ প্রথম বাণ থেকে তুমি আত্মরক্ষা করেছ বটে, কিন্তু এখন দ্বিতীয় প্রশ্নরূপ দ্বিতীয় বাণের জন্য প্রস্তুত হও।" আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে তুমি যে আকাশের কথা ব'ল্লে, যে আকাশে সেই সূত্র, যাতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ভূত বিধৃত হ'য়ে আছে, এ হেন যে সূত্র, সেই সূত্রও যে

আকাশে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই আকাশ আবার কিসে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে ?" গার্গী এই প্রশ্ন ক'রে সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। গার্গীর বিশ্বাস যাজ্ঞবল্ক্য আর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। আমাদের যত কিছু খণ্ডজ্ঞান সব দেশ (space) ও কালে (time) হয়। এখন ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ এই যে সূত্র আর সর্ব্বব্যাপক এই যে আকাশ, এই দেশ ও কাল কিসে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, এইটাই হ'ল গার্গীর প্রশ্ন। এখন যাজ্ঞবল্ক্য যে বস্তুরই নাম করুন না কেন, সে বস্তুর জ্ঞান তাঁর নিশ্চয়ই থাকা চায়, আর সে বস্তুর জ্ঞান থাকলে সেই জ্ঞান মন, বুদ্ধি দিয়েই তাঁকে ক'রতে হবে, আর মন, বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু আমরা জানি সে বস্তু খণ্ড, এবং তার জ্ঞানও বৃত্তিজ্ঞান, আর সেই বস্তু ও সেই বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেশ ও কালের মধ্যেই হবে, দেশ এবং কালের অন্তর্গত। সুতরাং যে বস্তু দেশ এবং কালের অন্তর্গত, সে বস্তুতে কখনই দেশ ও কাল ওতপ্রোত হয়ে থাকতে পারে না।

আরও এক কথা এই যে, প্রশ্নের উত্তর এরূপ হওয়া চাই যা সকলে সহজে বুঝতে পারে। এখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কাল, এই তিন কাল যাতে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই ত্রিকালাতীত আকাশ যে কি, তাই বুঝা কঠিন; তারপর আকাশেরও অতীত যে বস্তু, যাতে আকাশও ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই বস্তুকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা কিংবা মন বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়। যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর বাক্যদ্বারা বলা যায় না, যা সহজবোধগম্য নয়, তা যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চয়ই ব'লতে পারবেন না, এই আশায় গার্গী বুক ফুলিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। সভাস্থ ব্রাহ্মণগণও গার্গীকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু 'উপর্য্যুপরিবুদ্ধীনাম্ চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ'। এই জগতে একজন

যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাঁর চেয়েও বুদ্ধিমান লোক আছে। গার্গী এমন একটা ফাঁদ যাজ্ঞবল্ক্যের চারিদিকে বিস্তৃত করে রেখেছেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য যে দিকেই যান, সেই দিকেই তাকে ফাঁদে পা দিতেই হ'বে। যদি বাক্য দ্বারা কিছু বলেন, তাহলে যে জিনিষটা অবাচ্য, যা বাক্যের অতীত, তাকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করলে একটা দোষ, আর যাজ্ঞবল্ক্য যদি নিরুত্তর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহ'লে ত তিনি পরাজিতই হলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কেমন ক'রে যে গার্গীর ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'ল্লেন, সেইটে একবার দেখা যাক। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগলেন, "গার্গি! যে বস্তুতে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে থাকে, তোমার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তুটিকে ব্রাহ্মণগণ অক্ষর ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরটি বেশ কৌশলপূর্ব্বকই দেওয়া হ'ল। যাজ্ঞবল্ক্য নিজের উপর কোন দোষ রাখলেন না। যত দোষ তা চাপিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণগণের উপর। যদি তিনি নিজে বলতেন 'আমি বলচি যে সেই বস্তুটি হ'চ্চে অক্ষর, যাতে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে', তাহ'লে যে জিনিষটা বাক্য দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য, তাকেই বাক্য দিয়ে নির্দ্দেশ করবার জন্য তাঁর দোষ হ'ত। আর চুপ করে থাকলেও তার অজ্ঞতাই প্রকাশ পেত। তাই যাজ্ঞবল্ক্য ব'ল্লেন, "গার্গি, তুমি যে বস্তুটিকে জানতে চাইচ, যাতে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই বস্তুটীকে ব্রাহ্মণগণ অক্ষর নামে অভিহিত করেন।"

গার্গী কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনরায় প্রশ্ন ক'ল্লেন, "আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে ব'ল্লে ব্রাহ্মণগণ ব'লে থাকেন যে, আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই অক্ষর বলতে কি বুঝায়?" গার্গীর এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলতে লা'গলেন "গার্গি! এই অক্ষর সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যা বলেন তা তোমায়

বলছি, তুমি বেশ মনোযোগ দিয়ে শোন। দেখ, গার্গি! আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা কোন বস্তুকে যখন আমরা জানি, তখন সেই বস্তুকে আমরা অন্বয়মুখে বর্ণনা ক'রতে পারি। আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি, কান দিয়ে যা শুনি, নাক দিয়ে যা আঘ্রাণ করি, জিভ্ দিয়ে যা আস্বাদ করি এবং ত্বক্ দিয়ে যা স্পর্শ করি, সেই সেই বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হওয়ায়, আমরা আঙ্গুল দিয়ে অপরের চোখের সামনে সেই সেই বস্তুকে ধরে বলতে পারি, এটা এই বস্তু, ওটা ঐ বস্তু. এটা একটা সুন্দর ফুল, এই ফুলে মৌমাছি ব'সে কেমন গুন গুন্ শব্দ করচে, ফুলটীর কি সুন্দর গন্ধ, ফুলের মধু বড় মিষ্ট, ফুলটীর স্পর্শ বেশ কোমল। কিন্তু যে বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধ'রতে পারি না, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়েও ছুঁই ছুঁই ক'রে ছুঁতে পারি না, সেই বস্তুকে বুঝতে হ'লে, তার স্বরূপ বর্ণন করতে হ'লে অন্বয়মুখে বর্ণনা করা যায় না; তাকে তখন নিষেধমুখে ব'লতে হয়। আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানি, আমাদের সেই বিদিত বস্তু থেকে সেই পদার্থটী সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেই জন্য সেটা 'বিদিতাৎ অন্য' এবং আমাদের যা কিছু অজ্ঞাত সে জিনিষটা তারও বাইরে, তাই সেটা 'অবিদিতাৎ অধি'। আমাদের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা সবই প্রকাশ করছে সেই জিনিষটা। সুতরাং যে জিনিষটা সকলের অবভাসক, সেই সর্ব্বপ্রকাশককে, এমন কি জিনিষ আছে যা দিয়ে প্রকাশ ক'রতে পারা যায়? তাই সেই বস্তু সম্বন্ধে কিছু ব'লতে গেলে আমাদের ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্জ্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে দিয়ে ব'লতে হয়, নিষেধমুখে, নেতি নেতি করে বর্ণন ক'রতে হয়। সেই জন্য ব'লতে হয়, গার্গি! বাক্য যাকে প্রকাশ ক'রতে পারে না, কিন্তু বাক্য যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্তু; মন যাকে মনন ক'রতে পারে না'

মন যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্তু; বুদ্ধি যাকে প্রকাশ করতে পারে না, বুদ্ধি যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্তু; ইন্দ্রিয় যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণ যাঁর দ্বারা প্রকাশিত; এই অক্ষর সেই বস্তু। এই অক্ষর সেই বস্তু গার্গি! যাঁকে এই ভূতগণ প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু ভূতসমূহ যাঁর দ্বারা প্রকাশিত। সেই বস্তুই এই অক্ষর যাঁকে নামরূপ প্রকাশ ক'রতে পারে না, কিন্তু নামরূপ যাঁর দ্বারা প্রকাশিত; দেশকাল যাঁকে প্রকাশ ক'রতে পারে না, দেশকাল যাঁর দ্বারা প্রকাশিত. সেই বস্তুই এই অক্ষর। এই অক্ষর যে কি, তা শোনো গার্গি! ব্রাহ্মণগণ ব'লে থাকেন যে, এই অক্ষর অস্থূলং, অনণু, অহ্রস্বং, অদীর্ঘং, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ং, অতম, অবায়ু, অনাকাশং, অসঙ্গম, অরসং, অগন্ধম্, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনঃ, অতেজঃ, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরং, অবাহ্যং, অভোক্তৃকম্, অভোগ্যম্।

এই অক্ষর স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, ইনি হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন; দ্রব্যের যত কিছু পরিমাণ, যত কিছু ধর্ম্ম আছে, এই অক্ষর সেই সমুদয় পরিমাণ, সেই সমুদয় ধর্ম্মবিরহিত, অগ্নির গুণ যে লৌহিত্য, এই অক্ষর সেই লৌহিত্য নয়, এ অ-লোহিত; জলের গুণ যে স্নেহ, সে স্নেহও অক্ষর নন, অক্ষর অস্নেহ, এই অক্ষর দ্রব্য নন, তাই ইনি অচ্ছায়, অন্ধকারও ইনি নন। না ইনি বায়ু, না ইনি আকাশ; এই অক্ষর-অতিরিক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই, যার সঙ্গে ইনি কোন না কোন সম্বন্ধে লিপ্ত হয়ে আছেন, তাই ইনি অসঙ্গ। ইনি অরস, অগন্ধ; আমাদের ন্যায় ইঁহার চক্ষু নাই, কর্ণও নাই, ইনি অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক ও অমনঃ; অগ্নি সূর্য্য চন্দ্রাদির ন্যায় ইনি কোন জ্যোতিষ্কও নন, ইনি অতেজঃ. আমরা যেমন প্রাণবায়ুর সাহায্যে জীবন ধারণ করি, এই অক্ষর সেরূপভাবে

বিদ্যমান থাকেন না, ইনি অপ্রাণ অমুখ ; এই অক্ষরের অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু নেই যে অক্ষরকে সেই বস্তু পরিমিত ক'রবে, এ যে অমাত্র ; এতে কোন খণ্ড, কোন অংশভাব নেই, কোন ছিদ্র নেই, এ অক্ষর অনন্ত ; ইহার বাহিরও নেই, অভ্যন্তরও নেই, ইনি অবাহ্য ; স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ এতে নেই, ইনি অভেদ, ইনি কিছু ভক্ষণ করেন না, কিংবা ইহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না। ইনি ভোক্তাও নন, ভোগ্যও নন, কোন গুণ দ্বারাই তাঁকে বিশেষিত ক'রতে পারা যায় না, তিনি সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্মবিরহিত। এই অক্ষর অখণ্ড, অভেদ, অদ্বিতীয়, একরস, নির্ব্বিশেষ চিৎস্বরূপ ।

শোনো গার্গি! এই অখণ্ড, অভেদ নির্ব্বিশেষ অক্ষর বিশ্বরূপে কল্পিত হ'চ্ছেন ; বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আমাদের এই অবস্থাত্রয় এই সমুদয় বিশ্বই এই নির্ব্বিশেষ অক্ষরে কল্পিত, অধ্যস্ত। যে জিনিষটা যাতে কল্পিত হয়, সেই কল্পিত বস্তু তার অধিষ্ঠান থেকে ন্যূনসত্তাক হয়, কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানকে কল্পিত বস্তু কখনই অতিক্রম ক'রতে পারে না। শোনো গার্গি। রজ্জুকে লোকে ভ্রান্তিবশতঃ সাপ দেখে, সেই যে কল্পিত সর্প, সেই কল্পিত সর্প কখনই রজ্জুকে অতিক্রম ক'রে থাকতে পারে না। আরও দেখ গার্গি, সেই কল্পিত সর্পের সত্তা রজ্জুর সত্তা থেকে ন্যূন, কম, যখন সর্পভ্রান্তি চ'লে যায় তখনও রজ্জু থাকে। এই বিশ্বও সেইরূপ এই অক্ষরে কল্পিত, এই অক্ষরকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বের কোন পদার্থই যেতে পারে না। কল্পিত বস্তুর, অনিত্য অসৎ বস্তুর একটা অধিষ্ঠান থাকা চাই। ভ্রান্তি নিরধিষ্ঠান হ'তে পারে না। তাই এই কল্পিত বিশ্বের একটা অধিষ্ঠান নিশ্চয়ই আছে, আর সেই অধিষ্ঠান হ'চ্ছে এই অক্ষর। জগতে

এমন কোন বস্তু নেই, যা এই অক্ষরের বাইরে গিয়ে, অক্ষরের সত্তা ছাড়া অন্য সত্তাবিশিষ্ট হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। অক্ষর যেন রাজা; আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্ত জগতের প্রত্যেক জিনিষটাকেই এই রাজার শাসন মেনে চ'লতে হ'চ্ছে। তাই বলি গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হ'য়ে আছে; দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরের প্রশাসন অমান্য করতে সমর্থ হয় না, তা'রাও গার্গি, তারাও এই অক্ষরের প্রশাসনে বিধৃত। এই অক্ষরের প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ নিয়মিত কাল এই অক্ষরকে অতিক্রম ক'রতে পারে না, গার্গি। ঐ যে তুষারমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত সকল হ'তে নদীসমূহ নির্গত হয়ে কলকলরবে দিগ্‌দিগন্তে ছুটে চলেছে, ঐ যে কোন নদী পূর্ব্বদিকে, কোন নদী পশ্চিম দিকে, কোন নদী বা অন্য দিকে প্রবহমানা, কেন এইরূপ হয় গার্গি, কেন এইরূপ হয়? অন্য দিকে প্রবাহিত হবার সামর্থ্য থাকলেও কেন এই নদী সকল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে বহমানা? তা কি জান গার্গি? এই যে অক্ষর, এই অক্ষরের প্রশাসনেই গার্গি ঐ নদীসমূহ তাহাদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিতা। অধিক আর তোমায় কি বলব গার্গি, জগতে যা কিছু ক্রিয়া, দান বল, ধ্যান বল, উপাসনা বল, দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বল, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বল, সব, সব কাযই এই অক্ষরের প্রশাসনে সুনিয়ন্ত্রিত।

শোনো গার্গি! এই অক্ষরকে যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপে উপলব্ধি না ক'রে হাজার হাজার বৎসর ধরে যজ্ঞ করে, তপস্যা করে, তাহার সেই সহস্র বৎসরের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সেই সহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যা তাহাকে অমৃতত্ব প্রদান ক'রতে পারে না, কারণ তাহার সেই যজ্ঞ, সেই তপস্যা ধ্বংসশীল। যজ্ঞ ক'রে, তপস্যা ক'রে যারা ফল আকাঙ্ক্ষা করে তারা ত কৃপণ। তারা অল্প সুখের জন্য নিজের প্রকৃত স্বরূপ

এই অক্ষর, এই ভূমাকে উপলব্ধি না করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর পরলোকে স্বীয় তপোলব্ধ সুখভোগ ক'রে, আবার এই জন্মমৃত্যুরূপ সংসার আবর্ত্তে নিপতিত হয়। আর যিনি এই অক্ষরকে, এই ভূমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন তিনিই ব্রাহ্মণ গার্গি! তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি দেহত্যাগের পর আর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহে পতিত হন না।

এই যে অক্ষর, গার্গি! এই অক্ষর কাহারও কর্তৃক দৃষ্ট হন না, শ্রুত হন না, মত বা বিজ্ঞাতও হন না। ইনি ব্যতীত আর কোন শ্রোতাও নেই, দ্রষ্টাও নেই, মন্তাও নেই, বিজ্ঞাতাও নেই। এই অক্ষরে গার্গি! এই অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। এই অক্ষর স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এ সবকে এই অক্ষর প্রকাশ ক'রচে, চৈতন্যময় ক'রচে, সেইজন্য এদের কোনটাই এই অক্ষরকে প্রকাশ ক'রতে পারে না। ইনি এদের অগোচর। আবার এই অক্ষরই গার্গি! আমাদের প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক খণ্ড জ্ঞানের, প্রত্যেক বৃত্তির সাক্ষী, প্রত্যেক বৃত্তির অবভাসক। ইনি আছেন বলেই আমরা দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা। আমাদের দ্রষ্টৃত্ব, শ্রোতৃত্ব, মন্তৃত্ব, বিজ্ঞাতৃত্ব, সবই এই অক্ষরের প্রসাদে। সেই জন্যই ব'লেছি গার্গি! এই অক্ষর ব্যতীত অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নেই, এই অক্ষরই সর্ব্ব বিকল্পের অধিষ্ঠান। এই অক্ষরেই গার্গি, আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে।"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে গার্গীর হৃদয়, মন, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে ভ'রে উঠল। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করে বললেন, "পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, যাজ্ঞবল্ক্যকে যদি শুধু নমস্কার ক'রে আপনারা মুক্তিলাভ ক'রতে পারেন, তাহলে সেইটাই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট লাভ ব'লে মনে ক'রবেন। আপনাদের মধ্যে এমন

কেহই নেই যিনি এই ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত ক'রতে পারেন!" এই কথা ব'লে গার্গী স্বীয় আসন গ্রহণ করলেন। সভা নীরব। সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞবল্ক্যের পাণ্ডিত্যে, বিচারকৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান ক'রতে লাগলেন।

গার্গী যখন যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত ক'রতে না পেরে স্বীয় আসনে গিয়ে ব'সলেন, তখন সেই সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে জয়ের কোন আশা নেই ভেবে চুপ করে ব'সে রইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার করে দাড়িয়ে উঠলেন শাকল্য। শাকল্য একজন ঋষি; মন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বড় কম নয়। ঋষিরা হ'চ্ছেন মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্র হ'চ্ছে দেবতাদের শরীর। সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্রেরই একজন না একজন দেবতা আছেন। এখন শাকল্য এই দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে নিজেকে বড় বেদজ্ঞ বলে পরিচয় দিচ্ছ, মন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার কি জ্ঞান আছে, তারই একটা পরিচয় দাও দেখি। আচ্ছা বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত?" শাকল্যের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "শোনো শাকল্য, বর্ত্তমানে আমরা যে সমস্ত ঋক্ দেখতে পাই, সেই সব ঋক হতেও প্রাচীন মন্ত্র হ'চ্ছে নিবিদ্। বর্ত্তমান ঋক্‌গুলি সূক্ত। সূক্ত কেন বলা হয়, তাত তুমি জান শাকল্য, বর্ত্তমান ঋক্‌গুলি সুন্দরভাবে সুন্দর সুন্দর ছন্দে—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুব, জগতী, পংক্তি, বৃহতী প্রভৃতি ছন্দে নিবদ্ধ। বর্ত্তমান ঋক্‌গুলি সুন্দর ছন্দে উক্ত বলে ইহাদিগকে সূক্ত বলা হয়। কিন্তু নিবিদ মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ নয়; এই মন্ত্রগুলির ছন্দ বেশ স্পষ্ট নয়। তবে যজুর ভাগই বেশী, কারণ এই মন্ত্রগুলি না ঋক্, না যজুঃ। তবে যজুর ভাগই বেশী, কারণ এই মন্ত্রগুলি কেবল সম্পূর্ণ-রূপে যজ্ঞকালেই ব্যবহৃত হয়। তুমি ত জান শাকল্য, যে বর্ত্তমান

ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা কণ্ব, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণও তাঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্রসমূহে এই নিবিদ্ মন্ত্রসমূহের উল্লেখ করেছেন। কাব্য উশনা, কক্ষীবান্ কুৎস, হিরণ্যস্তুপ প্রভৃতি ঋষিগণ বহু নিবিদ্ মন্ত্রের দ্রষ্টা। সুতরাং এই নিবিদ্ মন্ত্রসমূহ বর্ত্তমান ঋক্‌বেদ হ'তেও প্রাচীন। তুমি ত জান শাকল্য, যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি কামনা করেছিলেন যে তিনি বহু হ'য়ে অভিব্যক্ত হ'বেন। সৃষ্টির কামনায়, তিনি এক বৎসর তপস্যা করেছিলেন। এক বৎসর তপস্যার পর, তিনি দ্বাদশটী শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। এই দ্বাদশটী শব্দই দ্বাদশ বাক্যাত্মক নিবিদের মূল। ঐতরেয় ঋষিও এই কথা বলেছেন—

"প্রজাপতির্বা ইদমেক এবাগ্র আস সো কাময়ত, প্রজায়েয় ভূয়ান্‌ৎস্যামিতি; স তপো তপ্যত। স বাচমযচ্ছৎ। স সংবৎসরস্য পরস্তাৎ ব্যাহরদ্ দ্বাদশ কৃত্বো দ্বাদশপদা বা এষাং নিবিদ্ এতাং বাব তাং নিবিদং ব্যাহরন্তাং সর্ব্বাণি ভূতান্যন্বসৃজ্যন্ত।" (ঐত, ব্রহ্মণ, ২, ৩৩)

এই নিবিদ্ সেই মন্ত্র, শাকল্য, যে মন্ত্র দ্বারা অগ্নি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। নিবিদ্ যে বর্ত্তমান ঋক্‌বেদ হ'তেও প্রাচীন তাহা কুৎস আঙ্গিরস তাহার দৃষ্ট ঋকমন্ত্রে বলেছেন "স পূর্ব্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্ মনূনাং" (ঋ ১, ৯৬,২)

নিবিদ্ স্বল্পাক্ষরযুক্ত মন্ত্র। এই নিবিদ্ মন্ত্র সকল সাধারণতঃ সোমযোগে ব্যবহৃত হয়। কোন একটী দেবতা বা বহু দেবতাকে একসঙ্গে আহ্বান করিবার সময় প্রাচীন ঋষিরা এই নিবিদ্ মন্ত্র ব্যবহার করতেন। এই মন্ত্রে ইষ্টদেবতার নাম এবং সেই দেবতার গুণ ও কার্য্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হ'ত। তোমাকে দু একটী নিবিদ্ বলি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে, শকল্য।

মরুত্বতীয় নিবিদ্

ওঁ সাবোমিন্দ্রো মরুত্বানংসোমস্য পিবতু।
মরুৎস্তোত্রো মরুদ্গণঃ। মরুৎসখা মরুদ্বৃধঃ।
ঘ্নন্বৃত্রা স্বজদপঃ। মরুতামোজসা সহ ......
......মরুদ্ভিঃ সখিভিঃ সহ। ইন্দ্রো মরুত্বাং ইহশ্রবং
ইহসোমস্য পিবতু। ... ...

সবিতৃ নিবিদ্

সবিতা দেব সোমস্য পিতভু। হিরণ্যপাণিঃ সুজিহ্বঃ ... ... দোক্ষীং বেণুং।

দ্যাবা পৃথিবী নিবিদ্

দ্যাবা পৃথিবী সোমস্য মৎসতাং। পিতাচ মাতাচ পুত্রশ্চ প্রজনঞ্চ। ধেনুশ্চ, ঋষভশ্চ। ধন্যা চ দিষণা চ ... ... প্রেদং ব্রহ্ম, প্রেদং ক্ষত্রং।

ঋভু নিবিদ্

ঋভবো দেবা সোমস্য মৎসন। বিষ্টবী স্বপসা। কৃষণ সুহস্তাঃ।
ধন্যা ধনিষ্ঠা। শম্যা শমিষ্ঠাঃ ... ...
ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপামতক্ষন্...প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রং।

প্রাচীন ঋষিগণ সোমযাগ সময়ে সাধারণতঃ মধ্যন্দিন ও সায়ংসবনে এই স্বল্পাক্ষরযুক্ত নিবিদ্ মন্ত্র দ্বারা দেবগণকে আহ্বান করিতেন এবং সোমযোগ দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিতেন। এই নিবিদ মন্ত্রগুলি শ্রেষ্ঠ সুখ বা স্বর্গ লাভের সোপান বলে গণ্য হইত। বর্তমান ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ এই নিবিদ অবলম্বনে বহু সূক্ত রচনা করেছেন। তাঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্রসমূহে বহু স্থলে, ভবত নিবিদ মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়।

গোতমো রাহূগণ 'বিশ্বেদেবা' দেবতাদিগকে সম্বোধন ক'রে ব'লেছেন—

"তান্ পূর্ব্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং মিত্রমদিতি"।

(ঋ ১, ৮৯, ৩)

প্রাচীন নিবিদ্-মন্ত্র দ্বারা আমরা ভগ, মিত্র, অদিতি প্রভৃতি দেবতা-গণের উদ্দেশ্যে হোম করি।

পূর্ব্বেও বলেছি যে কুৎস আঙ্গিরস ঋষিও অগ্নিকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন "স পূর্ব্বয়া নিবিদা কব্যাতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্মনূনাং"। (ঋ ১, ৯৬, ২)

অগ্নি প্রাচীন নিবিদের দ্বারা (প্রজাপতি) মনুসমূহের এই প্রজা সকল সৃষ্টি করেছিলেন।

ঋষি বামদেবও তদ্দৃষ্ট মন্ত্রে নিবিদ্ মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইন্দ্র, অদিতিকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—

"কিমুম্বিদস্মৈ নিবিদো ভনন্তে..." (ঋ, ৪, ১৮ ৭)

বিশ্বামিত্র ঋষির দৃষ্ট বহু মন্ত্র নিবিদ মন্ত্র অবলম্বনে রচিত। (ঋ ৩, ৩৭, ৩, ৫৪, ১১)

এখন বুঝতে পেরেছ শাকলা যে, নিবিদ অতি প্রাচীন মন্ত্র। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্রসমূহে দেবতার সংখ্যা উল্লেখ ক'রে গেছেন। বৈবস্বত মনু "যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন" ... ... (ঋ ৮, ২৮) মন্ত্রে দেবতার সংখ্যা ৩৩ বলেছেন। ঋষি পুরুচ্ছেপও বলেছেন "যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ ... ..." (ঋ, ১, ১৩৯, ১১) মন্ত্রেও দেবতার সংখ্যা ৩৩ তেত্রিশ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়েছে। এগার জন দেবতা স্বর্গে, এগার জন দেবতা অন্তরীক্ষে এবং এগার জন দেবতা পৃথিবীতে অবস্থান করেন। ঋষিগণ যে নিবিদ অবলম্বনে দেবতার সংখ্যা

নির্দ্দেশ ক'রেছেন, সেই নিবিদটি হ'চ্ছে বিশ্বেদেবা নিবিদ। বিশ্বেদেবা নিবিদটী এই :—

বিশ্বেদেবা সোমস্য মৎসন্। বিশ্বে বৈশ্বানরাঃ। বিশ্বে হি বিশ্বমহসঃ। মহি মহান্তঃ। কাম্যা নেমবিশিখানঃ। আক্রাপাতবাহসঃ। বাতাত্মানো অগ্নিদূতঃ। যে দ্যাঞ্চ পৃথিবীঞ্চ তস্থুঃ। অপশ্চ স্বশ্চ। ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ। বহিশ্চ বেদিঞ্চ। যজ্ঞং চোরচান্তরীক্ষং। যে স্থ ত্রয় একাদশা। ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। ত্রয়শ্চ ত্রি চ শতাঃ। ত্রয়শ্চ ত্রি চ সহস্রাঃ তাবন্ত ভিযাচঃ। তাবন্তো রাতিষাচঃ। তাবতীঃ পত্নীঃ। তাবতোগ্নাঃ। তাবন্ত উদরথে। তাবন্তো নিবেশনে। অতো বা দেবা ভূয়াংসঃ স্থ। মা বো দেবা অপিশঃ সামা পরিশসা বৃক্তি। বিশ্বেদেবা ইহশ্রবদ্বিহ সোমস্য মৎসন্। প্রেমাং দেবা দেবহূতিং অবন্তু দেবা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রং। প্রেদং সুন্বন্তং যজমানমবন্তু। চিত্রাশ চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবদ্‌ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমন্।

এখন বুঝতে পাচ্ছ, শাকল্য, প্রাচীন ঋষিগণ দেবতাদিগের সংখ্যা তেত্রিশ, তিন শত তিন, তিন সহস্র তিন কিংবা তাহারও অধিক উল্লেখ করেছেন। স্বর্গে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে দেবগণের বাস।

যে সব দেবতা স্বর্গে থাকেন তাহারা দ্যৌঃ, সূর্য্য, বরুণ, মিত্র, সবিতৃ, পূষণ, বিষ্ণু, বিবস্বান্, আদিত্য, উষা অশ্বিনীযুগল। অন্তরীক্ষে যে সব দেবতার বাস, তাঁহারা হচ্ছেন :—ইন্দ্র, রুদ্র, মরুদ্গণ, পর্জ্জন্য আপঃ, বায়ুবাত, অহি বুধ্ন্য, অজএকপাদ, মাতরিশ্বা, অপাং নপাৎ, ত্রিত আপ্ত্য এবং পৃথিবীতে যে সব দেবতারা অবস্থান করেন তাঁহারা —নদীসকল, সরস্বতী, পৃথ্বী, অগ্নি, বৃহস্পতি, সোম—যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় বাধা দিয়ে শাকল্য বলে উঠলেন, "থাম, থাম, যাজ্ঞবল্ক্য, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। আমার প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট ক'রে না দিয়ে,

তুমি শুধু নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে চলেছ, ওসব হবে না। বল, বেশ স্পষ্ট করে সভার সমক্ষে বল, দেবতার সংখ্যা কত।"

যাজ্ঞবল্ক্য—তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলেছি বৈশ্বদেব নিবিদে যতগুলি দেবতার উল্লেখ আছে, তাহাই দেবতার সংখ্যা। ত্রয় একাদশা, ত্রয়শ্চ, ত্রিংশচ্চ, ত্রয়শ্চ ত্রিচ শতাঃ, ত্রয়শ্চ ত্রিচ সহস্রাঃ। তেত্রিশ, তিনশত, তিন, তিন সহস্র তিন।

শাকল্য—তুমি ঠিক বলেছ যাজ্ঞবল্ক্য, তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করি—"দেবতা কতগুলি?"

যাজ্ঞবল্ক্য—তেত্রিশ।

শাকল্য—ঠিক, কিন্তু আবার বলি দেবতার সংখ্যা কতগুলি?

যাজ্ঞবল্ক্য—ছয়।

শাকল্য—সত্য, কিন্তু বল দেখি দেবতার সংখ্যা কত?

যাজ্ঞবল্ক্য—তিন।

শাকল্য—তোমার কথা সত্য, কিন্তু বল দেখি দেবতার সংখ্যা কত?

যাজ্ঞবল্ক্য—দুই।

শাকল্য—ঠিক বলেছ, আবার বলি যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি দেবতার সংখ্যা কত?

যাজ্ঞবল্ক্য—দেড়।

শাকল্য—সত্য, আচ্ছা বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত?

যাজ্ঞবল্ক্য—এক।

শাকল্য—ঠিক বলেছ যাজ্ঞবল্ক্য। এখন বল দেখি সেই তিন শত তিন সহস্র তিন দেবতা কে কে?

যাজ্ঞবল্ক্য—এই যে তিনশত তিন ও তিন সহস্র তিন দেবতা ইঁহারা সকলেই তেত্রিশটী দেবতার মহিমা, তেত্রিশটী দেবতার বিভূতি, তেত্রিশটী দেবতার বিভিন্ন বিকাশ। আসলে দেবতা হ'চ্ছেন তেত্রিশ।

শাকল্য—সেই তেত্রিশ দেবতা কে কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—সেই তেত্রিশটী দেবতা হ'চ্ছেন আট জন বসু; এগার জন রুদ্র, বার জন আদিত্য; এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

শাকল্য—বসুই বা কাহারা, রুদ্রই বা কাহারা, বার জন আদিত্যই বা কে, আর কেই বা ইন্দ্র, আর প্রজাপতিই বা কে, তা বেশ স্পষ্ট করে বল।

যাজ্ঞবল্ক্য—শোনো শাকল্য, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহকে বসু বলে। সমস্ত জগৎ এই বসুগণে নিহিত। এই দেবতাগণ সমুদয় প্রাণিগণের কর্ম্মফলের আশ্রয়। ইহারাই দেহ ইন্দ্রিয়রূপ কার্য্য ও কারণরূপে পরিণত হ'য়ে সমস্ত জগৎকে স্থিত ক'চ্ছেন এবং নিজেরাও বাস ক'চ্ছেন। এই দেবতাগণ সমস্ত জগৎকে বাস করাচ্ছেন বলে, ইহাদিগকে বসু বলে।

মনুষ্যশরীরে যে দশ ইন্দ্রিয় ও মন, এই এগার জনই হ'লেন একাদশ রুদ্র। এঁরা যখন মনুষ্য শরীর ত্যাগ করে যান, তখন সেই মনুষ্যের আত্মীয় স্বজনকে কাঁদিয়ে গমন করেন, সেইজন্য এঁদের রুদ্র বলে। আর দ্বাদশ মাসই হ'ল দ্বাদশ আদিত্য। কারণ তাঁরা পুনঃপুনঃ গমনাগমন করেন এবং প্রাণিগণের আয়ু ও কর্ম্মফল লয়ে চলে যান। এই দ্বাদশ মাস সমস্ত আদান বা গ্রহণ করে চলিয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে আদিত্য বলে। আরো শোনো শাকল্য, স্তনয়িত্নুই ইন্দ্র, অশনি বা বজ্র, বীর্য্যই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি, আর পশুগণই হ'চ্চে যজ্ঞ

শাকল্য পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে ছয় দেবতার নাম করেছিলে, সেই ছয়টী দেবতাই বা কে কে? তিনটি দেবতাই বা কারা? দুটী দেবতাই কোন্ কোন্? দেড়টী দেবতাই বা কে? আর কোনটীই বা এক দেবতা?"

শাকল্যের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "যে ছয়টী দেবতার নাম

করেছিলাম তাঁরা হ'চ্চেন অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং দ্যৌ বা দ্যুলোক। পূর্ব্বে যে তেত্রিশ দেবতার কথা বলেছি তাঁরা এই ৬য়টীর অন্তর্ভুক্ত। এই ছয় দেবতারই বিভিন্ন বিকাশ। তোমাকে যে তিনটী দেবতার কথা বলেছি সেই তিনটী দেবতা হ'চ্চেন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের অন্তর্ভূক্ত হ'চ্চে পূর্ব্বের ঐ ছয়টী দেবতা। আর যে দুটী দেবতার কথা বলেছি সেই দুটী দেবতা হ'চ্চেন অন্ন ও প্রাণ। পূর্ব্বে যত দেবতার কথা বলেছি সেই সমস্ত দেবতা অন্ন ও প্রাণ এই দুই দেবতার অন্তর্ভুক্ত। আর বায়ুই হ'চ্চেন সেই দেড়খানি দেবতা। এই বায়ুই সমস্ত জগতে কল্যাণ সাধন, সমৃদ্ধি সাধন করেন বলে ইহাকে অধ্যর্দ্ধ বলে। আর সেই একটী দেবতা, যাঁর কথা তোমায় বলেছি, তিনি হ'চ্চেন প্রাণ। এই প্রাণই ব্রহ্ম, পণ্ডিতগণ ইহাকে 'ত্যৎ' এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। দেবতা অনন্ত। সেই অনন্ত দেবতা বৈশ্বদেব নিবিদুক্ত দেবতার অন্তর্ভুক্ত। আবার বৈশ্বদেব নিবিদুক্ত দেবতাগণ তেত্রিশ দেবতার অন্তর্গত। সেই তেত্রিশ দেবতাও আবার যথাক্রমে, ছয়, তিন, দুই, দেড় ও এক দেবতার অন্তর্ভুক্ত। এই যে অসংখ্য দেবতা এঁরা এক প্রাণেরই বিস্তার। প্রাণই অগ্নি; "প্রাণো বৈ জাতবেদাঃ"। (২, ৩৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে আবার ব'লতে লাগলেন—"বৃথাই তোমার পাণ্ডিত্য, বৃথাই তোমার বড়াই, যাজ্ঞবল্ক্য আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি তুমি সেই পুরুষকে জান না, যে পুরুষের পৃথিবী আয়তন, অগ্নি চক্ষু এবং মন জ্যোতিঃ। শাকল্যের কথায় যাজ্ঞবল্ক্য একটু হেসে উত্তর দিলেন, "শাকল্য, তুমি যে পুরুষের কথা ব'লচ সেই পুরুষকে জানলেই যদি পণ্ডিত হওয়া যায়, তাহালে তুমি নিশ্চয় জেনে রাখো যে আমি সেই পুরুষকে জানি। এই যে শরীর পুরুষ, ইনিই তোমার সেই পুরুষ। এই শরীর পাঞ্চভৌতিক; ত্বক্ মাংস, রুধির, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ছয়টি

দ্বারা রচিত, এই ছয়টীও সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয়ভূত যে দেবতা এই পার্থিব শরীরকে 'আমি' বলিয়া জানে, সেই শরীরাভিমানিনী দেবতাই তোমার জিজ্ঞাসিত পুরুষ; এবং তোমার এই পুরুষের দেবতা বা অবলম্বন হ'চ্ছে ভুক্তান্নের পরিণাম যে রস সেই রস।

শাকল্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি কাম যার শরীর, হৃদয় যাহার চক্ষু, মন যাহার জ্যোতিঃ সেই পুরুষ কে? এবং তার দেবতাই বা কে? রূপসমূহ যার শরীর, চক্ষু যাহার নয়ন, মন যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত দেহের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষই বা কে, আর কেই বা তার দেবতা? আরো বলি যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি আকাশ যার শরীর, শ্রোত্র যার নয়ন, মন যার জ্যোতিঃ সমস্ত আত্মার পরম আশ্রয়স্থল সেই পুরুষই বা কে এবং কেই বা তার দেবতা! শোনো যাজ্ঞবল্ক্য, এবার তোমার বড়াই বুঝা যাবে, বল দেখি অন্ধকারই যার শরীর, হৃদয় যাহার চক্ষু, মন যাহার জ্যোতিঃ সমস্ত দেহের আশ্রয় সেই পুরুষ কে? আর তার দেবতাই বা কে! আরো বল দেখি বিশেষ বিশেষ রূপ সকল যার শরীর, চক্ষুই যার নয়ন, মন যার জ্যোতিঃ সেই পুরুষ কে, আর কেই বা দেবতা? কে সেই পুরুষ, বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, যার শরীর—জল, হৃদয়—চক্ষু, মন—জ্যোতিঃ আর সেই পুরুষের দেবতা কে? তোমার পাণ্ডিত্যের একবার পরিচয় দাও দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি শুক্রই যার শরীর, হৃদয় যার চক্ষু, মন যার জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আশ্রয় সেই পুরুষ কে, আর কেই বা তার দেবতা!

শাকল্যের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য ব'ল্‌তে লাগলেন "তুমি একেবারে অনেক প্রশ্ন করে ফেলচ দেখছি। কিন্তু তোমার এ প্রশ্নগুলি আমার নিকট বালকের প্রশ্নের ন্যায় বোধ হ'চ্ছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখন দিচ্চি শোন! আমাদের চিত্তে যে সমুদয় বৃত্তি উঠচে, আমরা সেই সেই বৃত্তির সঙ্গ অভিমানবশতঃ বদ্ধ হ'য়ে হ'য়ে যাচ্চি। যখন কামবৃত্তি চিত্তে উঠচে,

তখন আমরা কামময় হচ্ছি, যখন ক্রোধের বৃত্তি উঠছে, তখন হচ্চি ক্রোধময়; যখন লোভবৃত্তির উদয় হ'চ্ছে তখন লোভময় হ'য়ে যাচ্ছি। এইরূপে—শাকল্য, এইরূপে আমরা চিত্তের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে স্পন্দিত হচ্চি। আর এই যে স্পন্দন, এই যে বৃত্তি এটাকে জাগিয়ে দিচ্চে বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। বিষয়ই হোক, বা বিষয়ের স্মৃতিই হোক্ অবিরত আমাদের চিত্তে ঢেউ তুলচে। আর আমাদের চিত্তও সেই সেই বিষয়রূপে বা সেই সেই বিষয়ের সংস্কাররূপে পরিণত হ'চ্চে এবং আমরাও তন্ময় হ'য়ে পড়চি। এখন দেখ শাকল্য, যেই আমাদের চিত্তে অহংকারের বৃত্তি উঠছে, তখনি আমরা নিজেদের ছোট ক'রে দেখচি আর ব'লচি, 'আমি যাজ্ঞবল্ক্য,' 'আমি শাকল্য', 'আমি উস্ত,' আমি এই স্থূল দেহ। আবার যখন কামবৃত্তির উদয় হ'চ্ছে তখন এই কামবৃত্তির সঙ্গে অভিমান ক'চ্ছি এবং কামময় হ'য়ে গিয়ে ভাবচি কামই আমার শরীর, হৃদয় আমার চক্ষু, মনই আমার জ্যোতিঃ আর স্ত্রীলোক প্রভৃতি এই কামবৃত্তি চিত্তে জাগিয়ে দিচ্চে ব'লে ভাবচি স্ত্রীলোকই এই বৃত্তির দেবতা। যখন রূপের বৃত্তি জাগে তখন ভাবচি রূপই আমার শরীর, আর সেই ভোগ্যবস্তু রূপকে যে পাঠিয়ে দিচ্চে সে হ'চ্চে চক্ষু, আর মনই সেই ভোগ্যবস্তু রূপকে আমার চিত্তে নিয়ে আসচে বলে মনই আমার জ্যোতিঃ, আর লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণই আদিত্যে অন্তর্নিহিত। সুতরাং আদিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ রূপের সহিত অভিমান ক'রে ভাবছেন রূপই তাঁর শরীর, মনই জ্যোতিঃ; এই পুরুষ আর এই রূপময় আমরা একই পুরুষ এবং উভয়েরই দেবতা হ'চ্চে সত্য বা অধ্যাত্ম চক্ষু।

আবার দেখ শাকল্য, আকাশে শব্দের উৎপত্তি হ'চ্চে। এই শব্দ যখন আমরা শুনি, তখন আমরা সেই সেই শব্দের সঙ্গে অভিমান ক'রে সেই সেই শব্দময় হ'য়ে যাই, আর ভাবি আকাশ আমার শরীর, শ্রোত্র

আমার নয়ন, কেননা শ্রোত্র দিয়েইত সেই সেই শব্দ শুনি, শ্রোত্রই আমাদিগকে সেই সেই শব্দের কাছে নিয়ে যায়, তাই ভাবি শ্রোত্রই আমাদের নয়ন, মনই জ্যোতিঃ, এবং দিক সমূহই হ'চ্ছে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভিমানী পুরুষের দেবতা। আর এই যে আমাদের অজ্ঞান, এই যে মোহ, এই অজ্ঞানবৃত্তি যখন চিত্তে ওঠে তখন আমরা মোহাভিভূত হয়ে, অজ্ঞানময় হ'য়ে যাই এবং ভাবি অজ্ঞান বা তমঃই আমার শরীর, আর এই অজ্ঞান আমরা হৃদয়ে অনুভব ক'রে থাকি ব'লে, ভাবি হৃদয়ই আমার চক্ষু, মনই জ্যোতিঃ। এই যে অজ্ঞানময় বা ছায়াময় পুরুষ এই পুরুষের দেবতা হ'চ্ছেন মৃত্যু। সমস্ত বিস্মৃতিই মৃত্যু নিয়ে আসে। তাই মৃত্যুই হ'চ্ছে এই অজ্ঞানময় বা ছায়াময় পুরুষের দেবতা। আরো দেখ শাকল্য, আদর্শে বা আয়নার মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। এই যে আদর্শের পুরুষ, এই যে প্রতিবিম্ব সেটা আভাস। আভাস কাকে বলে শাত জান। আভাস বা প্রতিবিম্ব হ'চ্ছে সেই জিনিষটা যে জিনিষটায় বিম্বের কোন লক্ষণ নেই অথচ বিম্বের মত প্রকাশ পায়। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, শাকল্য। সূর্য্যের সেই প্রতিবিম্ব কিন্তু সূর্য্য নয়, অথচ সূর্য্যের মত প্রকাশ পায়। এখন শোন শাকল্য, এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপসমূহ, যা আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করি, এই সব ভিন্ন ভিন্ন রূপসমূহে যে পুরুষ অভিমান ক'চ্ছে, সেই ভাবছে এই রূপসমূহ তার শরীর, চক্ষুই তার নয়ন, মন জ্যোতিঃ, আর এই প্রতিবিম্বিত পুরুষের দেবতা হ'চ্ছে প্রাণ। আর এই যে প্রতিভোগ্য বিষয়ে আমরা রস আস্বাদন করি, এই রসই যখন আমরা হৃদয়ে অনুভব করি তখন আমরা রসময় বা জলময় হ'য়ে যাই এবং ভাবি জলই আমার শরীর, হৃদয়ই আমার চক্ষু বা রস অনুভব করবার উপায়, মন জ্যোতিঃ এই রস রূপ জলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হ'চ্ছেন বরুণ। শোনো শাকল্য, পুত্র আমাদের

গৌণ আত্মা তা তুমি জান। পুত্রের সঙ্গে যখন আমরা অভিমান করি তখন আমরা পুত্রময় হ'য়ে যাই। তখন আমরা ভাবি শুক্রই আমার শরীর, হৃদয় আমার চক্ষু এবং মনই আমার জ্যোতিঃ। এই পুত্রময় শরীরের দেবতা হ'চ্ছেন প্রজাপতি। যাজ্ঞবল্ক্য আবার ব'লতে লাগলেন, "শাকল্য, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর ত তুমি পেয়েছ কিন্তু এটা বুঝতে পাচ্ছ কি যে, এই কুরু পাঞ্চাল দেশীয় ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি সাঁড়াশীর মত ব্যবহার করছেন। নিজের হাত আগুনে না দিয়ে যেমন সাঁড়াশীকে আগুনের ভিতর দিয়ে কাজ করে নেয়, আর দগ্ধ হয় শুধু সাঁড়াশী, সেইরূপ শাকল্য, সেইরূপ এই কুরু পাঞ্চাল দেশীয় ব্রাহ্মণগণ তোমাকে আমার তেজে দগ্ধ করাচ্ছেন"।

শাকল্য চুপ করে গেছলেন কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় তাহার অভিমান আবার জেগে উঠল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ব'লতে লাগলেন, "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! কুরু পাঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদেরকে নিন্দা! তুমি কত বড় বিদ্বান্ হয়েছ? তুমি ব্রহ্মসম্বন্ধে কি জান? তুমি কি তত্ত্ব জেনেছ? যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন, "দেখ শাকল্য, আমি দিকসমূহ এবং তাদের দেবতাকে জানি"। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে শাকল্য উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললেন, 'জান, জান তুমি দিক্‌সমূহকে? জান তুমি সেই সেই দিকের দেবতাদিগকে? আচ্ছা বল দেখি –

শাকল্য। তুমি যখন দিক্‌সমূহকে জান তখন ত তুমি নিজেই দিকরূপ হয়ে গেছ। এখন বল দেখি পূর্ব্ব দিকের দেবতা কে?

যাজ্ঞবল্ক্য। পূর্ব্বদিগের দেবতা আদিত্য।

শাকল্য। আদিত্য কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য। আদিত্য চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত।

শকল্য। চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য। চক্ষু রূপে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষু দিয়াই লোকে রূপ দেখে।

শাকল্য। রূপসমূহ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য। রূপসমূহ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয় দিয়েই লোকে রূপ উপলব্ধি করে, তাই রূপসমূহ হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত।

শাকল্য। ঠিকই বলেছ যাজ্ঞবল্ক্য। কিন্তু বল দেখি দক্ষিণ দিকের দেবতা কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। যম দক্ষিণ দিকের দেবতা।

শাকল্য। যম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য। যজ্ঞে।

শাকল্য। যজ্ঞ কিসে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য। যজ্ঞ দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠিত।

শাকল্য। দক্ষিণা কিসে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য। দক্ষিণা শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত।

শাকল্য। সেই শ্রদ্ধা আবার কিসে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য। শ্রদ্ধা মনে, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ?

শাকল্য। ঠিক বলেছ, আচ্ছা বল দেখি পশ্চিম, উত্তর এবং ঊর্দ্ধ দিকের দেবতা কে কে এবং তাঁরা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য। পশ্চিমদিকের দেবতা বরুণ। বরুণ জলে প্রতিষ্ঠিত। সেই জল আবার শুক্রে প্রতিষ্ঠিত। এবং শুক্র হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই, শাকল্য, সেই জন্যই পিতার আকৃতিসদৃশ পুত্র জন্মিলে লোকে বলে 'এই পুত্র যেন পিতার হৃদয় থেকে বহির্গত হ'য়েছে। যেন হৃদয় দিয়েই নির্ম্মিত হ'য়েছে। তাই বলছি শুক্র হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। আর উত্তর দিকের দেবতা হ'চ্ছেন সোম। এই সোম দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। দীক্ষা আবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য আবার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। আমরা হৃদয় দিয়েই সত্য উপলব্ধি করি। ঊর্দ্ধ দিকের অগ্নি। অগ্নি বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। বাক্ আবার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

শাকল্য। সেই হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য। নামরূপাত্মক এই জগৎ, সবই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। মনই, হৃদয়ই, চিত্তই স্পন্দিত হয়ে বিষয়রূপে ও কার্য্য এবং কারণরূপে ফুটে পড়েছে। এই যে হৃদয় ইহা আমাদের শরীরের বাইরে অন্য কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত নেই। ওহে অহল্লিক শাকল্য, যদি এই হৃদয় আমাদের শরীরের বাইরে অন্য কোন স্থানে বর্ত্তমান থাক্‌ত, তাহলে এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করত, পাখীরা ইহাকে ক্ষত বিক্ষত ক'রত তাই বলি, অহল্লিক, এ হৃদয় আমাদের শরীরেই আছে।

শ্বেতকেতু

(১)

অরুণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উদ্দালক আরুণি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে, কেবল ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন তাহা নহে, ব্রহ্মনিষ্ঠও ছিলেন। এইরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্ উদ্দালক আরুণির শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র ছিলেন। পূর্ব্বে বৈদিক আর্য্যসমাজে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। স্থানে স্থানে গুরুকুল,:ঋষিকুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই গুরুকুলে বা ঋষিকুলে মুনি ঋষিরা বাস করিতেন। মুনি ঋষিরা আদর্শ গৃহস্থ ছিলেন। বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া সরল সাধুজীবন যাপন এবং বেদ ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। সমাজ তাঁহাদিগকে বৃত্তি-প্রদান করিত। রাজা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই গুরুকুল বা ঋষিকুলে বালকদিগকে প্রেরণ করা হইত। বালকেরা গুরুকুলে উপস্থিত হইলে ঋষিগণ তাহাদিগকে উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দিতেন। বালকগণ পঞ্চবিংশ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক বেদ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। প্রত্যেক পিতা তাঁহার পুত্রকে বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। উদ্দালক আরুণির মনেও তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী দেখিতে ইচ্ছা হইল। উদ্দালক আরুণি মহাবিদ্বান্ ছিলেন। তিনি নিজেই পুত্রকে

শিক্ষা দিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাকে কোন কার্য্যবশতঃ প্রবাসে গমন করিতে হইবে জানিয়া এবং শ্বেতকেতুরও উপনয়ন ও অধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি শ্বেতকেতুকে বলিলেন—"**শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং। ন বৈ সোম্য, অস্মৎ কুলীনঃ অননূচ্য ব্রহ্ম-বন্ধুরিব ভবতি**"।

শ্বেতকেতো! আমাদের বংশের অনুরূপ উপযুক্ত গুরুর নিকট যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। বৎস আমাদের বংশের কেহই বেদপাঠ এবং ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল ব্রহ্মবন্ধু হইয়া সংসারে অবস্থান করে নাই।

"ব্রহ্মবন্ধু" এই শব্দের অর্থ হইতেছে—ব্রাহ্মণ যাহার বন্ধু এমন ব্যক্তি। সে নিজে ব্রাহ্মণ নহে, ব্রাহ্মণের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে মাত্র। শ্বেতকেতুর সময়ে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা বেদ অধ্যয়ন না করিতেন, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহারসম্পন্ন না হইতেন, তাহারা সমাজে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। সমাজে তাহারা অনাদৃত হইতেন। সেইজন্য উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ হইয়া গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন এবং বৈদিক আচারসম্পন্ন হইতে আদেশ করিলেন। শ্বেতকেতু গুরুকুলে গমন করিলেন।

অল্পবয়সে গুরুকুলে বাস করিলেও বালকদিগের হৃদয় ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন হইত। বৈদিক সমাজের লক্ষ্য ছিল নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি (Freedom)। মুক্তি বলিতে, Freedom বলিতে ঋষিরা উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝিতেন না, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে জীবনযাপনকেই তাঁহারা মুক্তজীবন বলিতেন না। সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে অগ্রাহ্য করিয়া, পিতামাতার অবাধ্য হইয়া, যথেষ্ট ইন্দ্রিয় চরিতার্থকে তাঁহারা স্বাধীনতা বলিতেন না। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ (Social laws) অগ্রাহ্য

করিয়া, যথেচ্ছ বাধাহীন ইন্দ্রিয় সুখভোগকে তাঁহারা পরাধীনতাই বলিতেন। এইরূপ জীবনকে পশুজীবন বলিয়া অভিহিত করা হইত, কারণ এরূপ জীবন মানুষকে মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য যে মুক্তি, যে পরমানন্দ প্রাপ্তি, যে পরম কল্যাণ, সেই পরম কল্যাণের দিকে, পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মনুষ্যজীবনের লক্ষ্যের অভিমুখে লইয়া যাইতে পারে না, বরং ইহা মানুষকে শত শত কামনা জালে আবদ্ধ করিয়া অনন্ত অনর্থরাশির দিকে, অশান্তির অভিমুখে ক্রমাগত আকর্ষণ করিয়া তাহাকে পশুতে পরিণত করে। সেইজন্য বৈদিক সমাজে প্রথম হইতেই বালকদিগকে উপনীত করিয়া শ্রেয়োমার্গে পরিচালিত করা হইত। বাল্যকালে হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কিত হয়, যে আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠা জন্মে, যে সমুদয় সদাচারে বালকগণ অভ্যস্ত হয়, সেই সব সদাচার, লক্ষ্যের প্রতি সেই দৃঢ়নিষ্ঠা, গভীরভাবে অঙ্কিত হৃদয়ের সেই ভাব সমূহ যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে শ্রেয়োলাভে মনুষ্যকে বহুলপরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। উদ্দালক আরুণি সেইজন্য তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে গুরুগৃহে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক সদাচার সম্পন্ন হইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শ্বেতকেতু পিতৃ আদেশে নিজবাটী পরিত্যাগ করিয়া গুরুকুলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বালকগণ গুরুকুলে যাইয়া পিতা মাতার স্নেহের অভাব অনুভব করিত না। গুরু এবং গুরুপত্নী বালকদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। শ্বেতকেতুও আনন্দে গুরুকুলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গুরুকুলেই শ্বেতকেতুর উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর শ্বেতকেতু ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালনপূর্ব্বক, গুরুশুশ্রূষা করিয়া অতি মনোযোগের সহিত ষড়ঙ্গ চারিবেদ অধ্যয়ন করিলেন। শ্বেতকেতু যে কেবল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা নহে, বেদের অর্থও তাঁহার উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর

গুরুকুলে অবস্থান করিয়া শ্বেতকেতু বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। গুরু শ্বেতকেতুর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! এখন তোমার গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং তোমাকে এখন যাহা উপদেশ করিব গৃহে যাইয়া গার্হস্থ্যজীবনে সেগুলি যথাযথ পালন করিবে।" এই বলিয়া গুরু শ্বেতকেতুকে বলিতে লাগিলেন—

"সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ! আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনং আহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্। কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্ স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।"

প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় অবগত হইবে, সেই বিষয় সম্বন্ধে বলিবার সময় ঠিক সেইরূপই বলিবে। কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া কিংবা ভয়ে তাহার অন্যথাচরণ করিবে না। দ্বিধাহীনচিত্তে, নির্ভয়ে সত্য কথাই বলিবে। শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, যে সমুদয় সদাচার উপদিষ্ট হইয়াছে তুমি যত্নপূর্ব্বক সেই সব বিহিত কর্ম্ম, সেই সব সদাচারের অনুষ্ঠান করিবে। বেদপাঠ, শাস্ত্রাধ্যয়ন হইতে বিরত হইবে না। আলস্যত্যাগ করিয়া প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠ করিবে। গুরুকুল হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের সময়, গুরুকে তাঁহার অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া বিদ্যাদানের দক্ষিণা প্রদান করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক আত্মানুরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে এবং যাহাতে বংশের ধারা বিচ্ছিন্ন না হয় সেইজন্য পুত্রোৎপাদনে যত্নশীল হইবে। পুত্র না হইলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। তুমি যেরূপ শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছ, যেরূপ জ্ঞান এবং সদাচার সম্পন্ন হইয়াছ, তোমার সেই শক্তি, সেই জ্ঞান এবং সৎকর্ম্ম দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে।

বেদবিদ্যা বৈদিক আচার যাহাতে পুরুষানুক্রমে বৈদিক সমাজে প্রবর্ত্তিত থাকিয়া জগতের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হয় সেইজন্য বংশের ধারা বিচ্ছিন্ন করিবে না। কথনও সত্যভ্রষ্ট হইবে না। ভুলিয়াও মিথ্যাচরণ করিবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিজের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করিবে। সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে বিরত হইবে না। চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষলাভ করিতে হইলে অর্থের একান্ত প্রয়োজন। সৎপথে থাকিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে সেই অর্থদ্বারা নিজেকে এবং সমাজকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিবে। প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে এবং যাহাতে বিদ্যার বিস্মৃতি না হয় সেইজন্য প্রত্যহ অধ্যাপনা করিবে। আরও তোমাকে বলি,—

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যানি অনবদ্যানি কর্ম্মানি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যানি অস্মাকম্ সুচরিতানি, তানি ত্বয়া উপাস্যানি নো ইতরাণি।

যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি দেবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যে আলস্যপরবশ হইয়া অবহেলা করিবে না। মাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, পিতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় সেবা করিবে, অতিথিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দিত, যাহা শিষ্টাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যাহা সদাচার-বহির্ভূত, যাহা নিন্দনীয় সেরূপ কর্ম্ম কথনও করিবে না। তোমাকে বলিয়া রাখি বৎস, আচার্য্যগণ যে সমুদয় বেদবিহিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তুমি সেই সব পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যদি তাঁহারা কখনও বৈদিক আচার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, তুমি তাহা কদাপি করিবে না।

শোন বৎস—যে কে চ অস্মৎ শ্রেয়াংসঃ ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়া আসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্।

হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্ত-বিচিকিৎসা বা স্যাৎ, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ যুক্তা [illegible] অলূক্ষাঃ ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ, যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্, তথা তত্র ব[illegible] এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতৎ অনুশাসনম্। এবম্ উপাসিতব্যম্। এবম্ চ এতৎ উপাস্যম্।

আমাদিগের হইতে যে সকল শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ আচার্য্যগণ আছেন, তাঁহাদিগকে তুমি আসন প্রদান করিয়া পূজা করিবে। কোন সভায় তাঁহাদিগকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ হইবে না। তাঁহারা যাহা উপদেশ করেন, তাঁহাদের সহিত [illegible] করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবে। দান করিবার সময় অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। তাচ্ছিল্য সহকারে, অবজ্ঞাভরে, অশ্রদ্ধার সহিত কখনও দান করিবে না; নিজের অবস্থা বুঝিয়া শক্তি অনুসারে দান করিবে। গর্ব্ব ও অহঙ্কার পূর্ব্বক দান করিও না, বিনীত হইয়া [illegible] করিবে। ধনরত্ন চিরকাল থাকে না, মৃত্যু প্রতিদিন সকলের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, সেইজন্য, অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া, দান [illegible] মৃত্যুভয় মুক্ত হওয়া যায় এই বুদ্ধিতে দান করিবে। মৈত্রী প্রভৃতি কার্য্যের জন্য দান করিবে। যদি কখনও বেদবিহিত কিংবা স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মে বা আচার সম্বন্ধে তোমার মনে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় সেই স্থানে সরল স্বভাব ধার্ম্মিক সদাচারসম্পন্ন যে সকল ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাদের কর্ম্ম ও সদাচার অবলম্বন [illegible]। ইহাই শ্রুতির আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই ঈশ্বরের বাক্য। তোমাকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিলাম তুমি কায়মনোবাক্যে সেইগুলি পালন করিবে, এই উপদেশে অনাদর প্রদর্শন করিবে না।"

শ্বেতকেতু গুরুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদান্ অধীত্য মহামনাঃ, অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায়। তং হ পিতা উবাচ শ্বেতকেতো যং নু সোম্য ইদং মহামনাঃ অনূচানমানী, স্তব্ধ অসি, উত তম্ আদেশং অপ্রাক্ষ্যঃ?

শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি সমুদয় বেদ অর্থের সহিত অধ্যয়ন করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। উদ্দালকআরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বেদবিদ্যায় পারদর্শী অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার পুত্র বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও তাঁহার স্বভাব প্রাপ্ত হয় নাই। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং, বিদ্বান্ ব্যক্তি বিনয়ী হইয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতকেতুতে বিনয়ের নম্রতার অভাব দেখিলেন। আরুণি দেখিলেন শ্বেতকেতুর মনে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার হইয়াছে। শ্বেতকেতুর মনে হইয়াছে যে, শ্বেতকেতু অপেক্ষা বিদ্বান্ আর কেহ নাই, সে যেমন সুন্দরভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে পারে, আর কেহই তাহার তুল্য শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নহে। পুত্রের এইরূপ পাণ্ডিত্যাভিমান ও বিদ্যার অহঙ্কার দর্শনে আরুণি একদিন শ্বেতকেতুকে সমীপে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ সত্য কিন্তু এই বেদবিদ্যা তোমাকে বিনয় প্রদান না করিয়া ঔদ্ধত্য ও গর্ব্বই প্রদান করিয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে তুমি গুরুর নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হও নাই; যাহা কেবল শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায়, যে উপায় দ্বারা মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, সেই উপায়, সেই আদেশ কি তুমি তোমার আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? তুমি গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তোমার আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?"

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি?"

যে আদেশ শ্রবণ করিলে অন্য যাবতীয় অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, যুক্তি ও তর্কদ্বারা যাহা পূর্ব্বে বিচারিত ও নির্ণীত হয় নাই, তাহাও বিচারিত ও নির্ণীত হইয়া যায়, যাহা কিছু অজ্ঞাত আছে, সে সমস্তই অবগত হওয়া যায়, সমস্ত বেদ, প্রাকৃতিক যাবতীয় বিজ্ঞান মানুষকে যে কৃতকৃত্যতা প্রদান করিতে অসমর্থ, সেই কৃতকৃত্যতা যাহাকে জানিলে লাভ করা যায়, তুমি কি সেই আদেশ সেই বস্তুটীর সম্বন্ধে তোমার আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?

পিতার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু বিস্মিত হইলেন। সুবর্ণকে জানিলে সুবর্ণ হইতে ভিন্ন যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে, এক জাতীয় বস্তুর জ্ঞানে অপর জাতীয় বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া শ্বেতকেতুর মনে হইল ; সেইজন্য তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ?

হে ভগবন্ সে আদেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?

ঋষি আরুণি তখন শ্বেতকেতুকে বলিলেন—

যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।
যথা সোম্য, একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।
যথা সোম্য একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্।
এবং সোম্য স আদেশো ভবতি ইতি।

বৎস, তুমি যে ভাবিতেছ এক বস্তুর জ্ঞানে অপর বস্তুর জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন একমাত্র মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে মৃণ্ময় যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূপই এই আদেশ। কলসী, ঘট, সরা, হাঁড়ি ইহাদের মৃত্তিকা ব্যতীত ইহাদের কোন স্বতন্ত্র

সত্তা নাই, যদি মৃত্তিকা ব্যতীত ইহাদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকিত, তাহা হইলে মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃণ্ময়, কলসী, ঘট প্রভৃতির জ্ঞান হইত না। কিন্তু মৃত্তিকা ব্যতীত ত ইহাদের কোন পৃথক সত্তা নাই, সেইজন্য মৃত্তিকাকে অবগত হইতে মৃণ্ময় সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। আর এই যে ঘট, কলসী, হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ তোমার নয়ন-গোচর হইতেছে, ইহারা নাম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ইহার বিকার; এবং বিকারেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় মাত্র। সুতরাং ঘট, কলসী, প্রভৃতি বিকারেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র; সেইজন্য উহারা সত্য নয়, একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য ঘট, কলসী, সরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম যখন ব্যবহার করিতেছ, তখনও এ সমস্ত নাম দ্বারা মৃত্তিকাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, কারণ ঘট প্রভৃতির প্রতি অণু পরমাণু, ঘট প্রভৃতির অন্তর বাহির, অধঃ উর্দ্ধ পরিব্যাপ্ত করিয়া একমাত্র মৃত্তিকাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এক সৎ বস্তুকে, এক মৃত্তিকাকে নানা নামে অভিহিত করিলে সেই সৎ বস্তুর, সেই মৃত্তিকার সত্যত্বের, মৃত্তিকাত্বের কি কোন হানি হইয়া থাকে? মৃত্তিকা হইতে পৃথক করিয়া 'ঘট' বলিয়া কোন বস্তুকে কি দেখাইতে পারা যায়? তাহা পারা যায় না। সেইজন্য ঘট প্রভৃতি বিকারসমূহ কেবল নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য। সেইরূপ একমাত্র সুবর্ণের জ্ঞানে হার, বলয় প্রভৃতি যাবতীয় স্বর্ণময় পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। হার, বলয় প্রভৃতি বিকার কেবল নামমাত্র; স্বর্ণই একমাত্র সত্য। সেইরূপ লৌহের জ্ঞানে সমুদয় লৌহময় পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ বৎস, সেই আদেশ, যে আদেশের জ্ঞানে জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। তুমি সেই আদেশ কি তোমার আচার্য্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

পিতার বাক্য শ্রবণে শ্বেতকেতুর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ তিনি আচার্য্যকে সেই আদেশ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াই গুরুগৃহ

হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পাছে পিতা তাঁহাকে সেই আদেশ জানিবার জন্য পুনরায় গুরুগৃহে প্রেরণ করেন, সেই ভয়ে শ্বেতকেতু বলিলেন—

ন বৈ নূনং ভগবন্তঃ তে এতৎ অবেদিষুঃ। যৎ হি এতৎ অবেদিষ্যন্ কথং মে ন অবক্ষ্যন্ ইতি। ভগবান্ তু এব মে তৎ ব্রবীতু ইতি। আমার পূজনীয় আচার্য্যদেব নিশ্চয়ই সেই আদেশ জানিতেন না। যদি তিনি ইহা জানিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উহা আমাকে বলিতেন, কারণ আমি তাহার অত্যন্ত ভক্ত এবং প্রিয়পাত্র ছিলাম। সেই জন্য আমি প্রার্থনা করি আপনিই আমাকে সেই আদেশ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুর বাক্যে প্রীত হইয়া উদ্দালক আরুণি বলিলেন—

তথা সোম্য, ইতি হ উবাচ।

আচ্ছা বৎস, আমি তোমাকে সেই আদেশ সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছি। তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক উহা শ্রবণ কর।

উদ্দালক আরুণি তাহার প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—

“সৎ এব সোম্য, ইদং অগ্রে আসীৎ। একং এব অদ্বিতীয়ং।” তৎহ একে আহুঃ অসৎ এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়ত” ॥

“বৎস, সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। কেহ কেহ সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ স্বরূপই ছিল। সেই অসৎ হইতেই সৎ স্বরূপ এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।” সংবুদ্ধি আমাদিগকে কখন ও পরিত্যাগ করে না। ‘ঘট আছে’ ইহা যেমন সংবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া হয়, ‘ঘট নাই’ এই জ্ঞানও সংবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। ভাব,

অভাব সমস্তই সংবুদ্ধিকে অবলম্বন না করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। আরও দেখ, মৃণ্ময় ঘট একটি কার্য্য, ইহার কারণ হইতেছে মৃত্তিকা। মৃত্তিকা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া ঘট থাকিতে পারে না। মৃত্তিকার সত্তাই ঘটের সত্তা। ঘট, মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র-সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থ না হইলেও মৃত্তিকার সহিত ইহা সম্পূর্ণরূপে অভেদও নহে, কারণ ঘটকে কেহ মৃত্তিকা বলে না, ঘটের উৎপত্তিকে কেহ মৃত্তিকার উৎপত্তি এবং ঘটের ধ্বংস হইলে কেহ মৃত্তিকার ধ্বংস বলে না। ঘট যেরূপ আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঘটে যেমন আমরা জল, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি রাখিয়া থাকি, কেবল মৃত্তিকায় আমরা তাহা রাখিতে পারি না। সুতরাং ঘট আমাদের যেরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করে, মৃত্তিকা আমাদের সেরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। ঘটকে কেহ মৃত্তিকা বলিয়া অভিহিত করে না কিংবা ঘটে মৃত্তিকাবুদ্ধিও হয় না। মৃত্তিকার সহিত অপৃথক্‌রূপে বিদ্যমান থাকিয়া ঘটরূপ কার্য্যপদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে। উপাদান কারণ হইতে কার্য্যপদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রও নয়, কিংবা সম্পূর্ণ অভেদও নহে, কিংবা ভেদাভেদও নহে। কিন্তু ঘট, সরা, হাড়ি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপদার্থের এক মৃত্তিকাই অনুগত ধর্ম্মীরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেইরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চের প্রত্যেক পদার্থে একমাত্র সৎবস্তুই অনুগত ধর্ম্মীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইজন্যই তোমায় বলিয়াছি যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত জগৎ একমাত্র সদ্বস্তুই ছিল। সেই এক অদ্বিতীয় সংবস্তু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ইহা হইতে যেন এরূপ বুঝিও না যে এখন আর সেই এক অদ্বিতীয় বস্তু বিদ্যমান নাই। এখনও সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুই বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে 'ইদং' বিশিষ্ট হইয়া উহা বর্ত্তমানে প্রতিভাত হইতেছে, যেমন ঘটবিশিষ্ট হইয়া মৃত্তিকাই প্রতীত হইয়া থাকে।

যেমন ঘটবিশিষ্ট হইয়া মৃত্তিকাই প্রতিভাত হইতেছে, সেইরূপ, প্রিয়পুত্র, সেইরূপ নামরূপাত্মক জগৎ-বিশিষ্ট হইয়াই সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুই বিভাত হইতেছে। ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে পৃথক হইয়া, স্বতন্ত্র-সত্তা-বিশিষ্ট হইয়া কখনই অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ 'ইদং' প্রত্যয়গোচর এই বিশাল প্রপঞ্চও সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র-সত্তা-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। ঘটের সত্তা ও প্রকাশ যেমন মৃত্তিকার সত্তা ও প্রকাশকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ 'ইদং' -প্রত্যয়-গোচর এই জগতের সত্তা ও প্রকাশ সেই এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ সদ্বস্তুকেই অপেক্ষা করিয়া হইয়া থাকে। ঘট যেমন মৃত্তিকাকে কখনই অতিক্রম করিতে পারে না, ঘট ছোটই হউক আর বড়ই হউক, মৃত্তিকা যেমন সেই ছোট বড় প্রত্যেক ঘটের সীমা, প্রত্যেক ঘটের অবধি ; সেইরূপ বৎস, সেইরূপ সেই এক, অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ সদ্বস্তুকে এই বিশাল জগৎ লঙ্ঘন করিতে, অতিক্রম করিতে পারে না ; সেই এক, অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ সদ্বস্তুই এই বিশাল জগতের ছোট বড় সমস্ত পদার্থের সীমা, সমস্ত জগতের অবধি। সেইজন্য ঋষিগণ বলিয়া থাকেন—

> ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
> ভীষাস্মাৎ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু এই এক, অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ সদ্বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া স্ব-স্ব কর্ম্মে নিরত রহিয়াছে। ইহারা কখনও এই সদ্বস্তুকে লঙ্ঘন করিতে, ইহার বিরোধী, ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সমর্থ হয় না। এই এক, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, নিত্য, অবিকারী সদ্বস্তুতেই কোটি কোটি সূর্য্য, চন্দ্র, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

ঘট, কলসী হইতে ; কলসী আবার হাঁড়ি হইতে ; হাঁড়ি সরা হইতে বিভিন্ন হইলেও, ঘট, কলসী, হাঁড়ি, সরা যেমন মৃত্তিকাত্ব কখনও পরিত্যাগ

করে না, মৃত্তিকা যেমন ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনুগতধর্ম্মীরূপে বিদ্যমান থাকে; সেইরূপ, প্রিয়পুত্র, সেইরূপ আমা হইতে তুমি ভিন্ন হইলেও, মানুষ হইতে পশু, পশু হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে কৃমিকীট, কীট হইতে লতা বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে জল, জল হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ বিভিন্ন হইলেও, তুমি, আমি, পশু, পক্ষী, আকাশ, বাতাস প্রভৃতি চেতন, অচেতন সমুদয় পদার্থই এই এক, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ নিত্য অবিকারী সদ্‌বস্তুকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, এই স্বপ্রকাশ সদ্‌বস্তুই এই বিশাল জগতের চেতন অচেতন প্রত্যেক বস্তুতে, অণু পরমাণুতে অনুগত ধর্ম্মীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্বেতকেতু, তোমাকে আরও একটি কথা বলি, তুমি তাহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখ। তোমাকে পূর্ব্বে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, ঘটরূপ কার্য্য তাহার উপাদানকারণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে কিংবা ভিন্নাভিন্নও নহে। ঘটবিশিষ্ট হইয়াই মৃত্তিকা প্রতীত হইয়া থাকে। সেইরূপ এই জগৎরূপ-কার্য্য সেই এক, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ সদ্‌বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নও নহে, সম্পূর্ণরূপে অভিন্নও নহে কিংবা ভিন্নাভিন্নও নহে। সেই এক, অদ্বিতীয় নিত্য, অবিকারী, স্বপ্রকাশ, সদ্‌বস্তু 'ইদং' রূপ এই নামরূপাত্মক জগৎবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তোমাকে যে ঘট-বিশিষ্ট হইয়া মৃত্তিকাই বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াছি, এখানে এই বিশিষ্ট বা সম্বন্ধযুক্ত কথাটীর অর্থ কি তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখ। ঘটের সহিত মৃত্তিকার কি সম্বন্ধ? কোন্ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া মৃত্তিকা ঘটরূপে প্রতীত হয়? এ সম্বন্ধ কখনই সংযোগ-সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ দুইটি পৃথক পদার্থের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে। মৃত্তিকার সহিত ঘটের কোন বিশেষ দেশে সম্বন্ধ নাই। মৃত্তিকা হইতে ঘট বলিয়া

কোন স্বতন্ত্র পদার্থও থাকিতে পারে না। ঘটের প্রতি অনু পরমাণুতেই মৃত্তিকা অনুগতধর্ম্মীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে সুতরাং ঘটের সহিত মৃত্তিকার সংযোগ সম্বন্ধ অসম্ভব। এইরূপে ঘটের সহিত মৃত্তিকার সমবায়-সম্বন্ধও হইতে পারে না, স্বরূপ-সম্বন্ধও হইতে পারে না। মৃত্তিকার সহিত ঘটের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই উপপন্ন হইতে পারে। এই সম্বন্ধও কল্পিত, আধ্যাসিক। ঘট যেমন একটি বাক্য মাত্র, নাম মাত্র, মৃত্তিকাই যেমন সত্য ; সেইরূপ পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা, জড়, চেতন কেবল নাম মাত্র ; এক অদ্বিতীয়, নিত্য, অবিকারী, স্বপ্রকাশ 'সৎ' বস্তুই বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়, শুক্তিকে রজত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ এক অদ্বিতীয় সেই সদ্ বস্তুই 'ইদং' শব্দ বাচ্য হইয়া জগৎরূপে প্রতীত হইতেছে।

(২)

উদ্দালক আরুণি তাঁহার প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—বৎস শ্বেতকেতু, এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নামরূপাত্মক জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎই ছিল। এখন আমরা যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, আঘ্রাণ করিতেছি, আস্বাদ করিতেছি; স্পর্শ করিতেছি তাহাও সেই সদ্বস্তুই ; তবে সেই সদ্বস্তুই এখন নামরূপবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে। দেখ বৎস, নামরূপাত্মক এই জগৎরূপ কার্য্য হয় অসৎ, নয় সৎ, নয় সদসৎ কিংবা এই তিন প্রকার হইতে বিলক্ষণ কোন কিছু হইবে। এখন বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ এই জগৎ সদসৎ-স্বরূপ হইতে পারে না ; কারণ 'সৎ' মানে সেই বস্তু যাহা সতত সর্ব্বত্র একরূপে বিদ্যমান আছে, কখনও যাহার অভাব হয় না। দ্রব্য গুণ এবং কর্ম্মও যাহার সত্তায় 'সৎ' বলিয়া প্রতীত হইতেছে, ইহা সেই বস্তু। আর 'অসৎ' মানে যাহা নাই। সুতরাং

এমন কোন বস্তু হইতে পারে না, যাহা 'আছে' ও 'নাই'। একই আধারে যুগপৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব থাকিতে পারে না; এমন কোন বস্তু আমাদের জ্ঞানে আসিতে পারে না, যাহা অসত্ত্ব-বিশিষ্ট সত্ত্ব কিংবা সত্ত্ব বিশিষ্ট অসত্ত্ব। কারণ আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় সৎ এবং অসৎ পরস্পর বিরোধী। আরও দেখ সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ হইতে ভিন্ন এমন কোন কার্য্যবস্তু হইতে পারে না। কার্য্য হয় সৎ হইবে, নয় অসৎ হইবে, নয় সদসৎ হইবে। কার্য্য যে সদসৎ হইতে পারে না তাহা তোমাকে দেখাইয়াছি এবং এই তিন প্রকার হইতে বিলক্ষণও কোন বস্তু হইতে পারে না! যাহা এই চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে কিংবা এই তিন প্রকার হইতে বিলক্ষণও নহে, তাহা অলীক। সেই বস্তু কখনও আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। এমন কোন বস্তু হইতেই পারে না, যাহা সতের অত্যন্তাভাব, অসতের অত্যন্তাভাব, সদসতের অত্যন্তাভাব এবং এই তিন প্রকার হইতে যাহা বিলক্ষণ তাহারও অত্যন্তাভাব। সুতরাং যাহারা বলিয়া থাকে "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাহাদের সেই উক্তি সমীচীন নহে। আর 'চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত এই যে অসৎ ছিল' ইহা বলে কে? 'এক, অদ্বিতীয় অসৎ ছিল—এই বাক্যই সতের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। কেহ কখনও ইহা দেখে নাই, কাহারও জ্ঞানে ইহা প্রতিভাত হয় না যে, বন্ধ্যাপুত্র মরীচিকার জলে স্নান করিয়া, আকাশকুসুমে বিভূষিত হইয়া শশশৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধনু ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। আবার 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' এই দুইটি পদও সদ্বস্তুকেই সমর্থন করিতেছে। সুতরাং অত্যন্ত অভাব, অত্যন্ত অসৎ হইতে কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।

কারণ যদি অত্যন্ত অসৎ হয়, তাহা হইলে কারণের সহিত কার্য্যের সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ প্রভৃতি কোন প্রকার সম্বন্ধই উপপন্ন হইতে পারে

না। অসতের সহিত অসতের কিংবা সতের কোনরূপ সম্বন্ধই হইতে পারে না। কোন বিশেষ কার্য্যের অদর্শনকেই লোকে সেই কার্য্যের অভাব বলিয়া মনে করে। বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্গম্ হইয়া থাকে, মৃত্তিকা হইতেই ঘটের উৎপত্তি। বীজের যাহা অবয়ব, তাহা অঙ্কুরেই অনুবৃত্ত হইয়া থাকে; মৃত্তিকাই ঘটে অনুগত হয়। কারণ সৎ না হইলে কি প্রকারে তাহা কার্য্যে অনুগত হইতে পারে? সকলেই বলে 'ঘট আছে,' 'পট, আছে,' 'আমি আছি,' 'তুমি আছ,' কেহই 'ঘট অসৎ,' 'পট অসৎ,' 'আমি নাই', 'তুমি নাই' বলিয়া সেই সেই পদার্থ উপলব্ধি করে না। সেইজন্য বলি বৎস—

কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাৎ ইতি হোবাচ। কথংঅসতঃ সৎ জায়েত ইতি। সৎ তু এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একামেবাদ্বিতীয়ম্।

কোন প্রমাণ দ্বারাই অসৎ হইতে সদ্বস্তুর উৎপত্তি সিদ্ধ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলিয়া থাকেন বিজ্ঞানই শুধু বাহিরে বস্তুর আকারে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র; বাহ্যবস্তু বলিয়া পরমার্থতঃ কোন বস্তু নাই, তাঁহাদের মতেও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। বিজ্ঞানের অস্তিত্বও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান ক্ষণিক সুতরাং সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানের নৈরন্তর্য্যও উপপন্ন হয় না। আর ঘট বলিয়া যদি কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঘটপ্রার্থী সে কখনও মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। 'সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয়' এই বাক্যে যেন মনে করিও না যে, ঘট হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। আর কার্য্য এবং কারণের মধ্যে যদি ভেদই না থাকে, তাহা হইলে 'কার্য্য' ও 'কারণ' এই দুইটি নাম কেন বলা হয়? শোন, বৎস, ঘট হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না সত্য কিন্তু মৃত্তিকা হইতেই ঘট উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকাচূর্ণ, মাটির তাল, ঘট, সরা, হাঁড়ি প্রভৃতি মৃত্তিকারই সংস্থান মাত্র। কার্য্যে কার্য্যে ভেদ আছে

কিন্তু কার্য্যে ও কারণে ভেদ নাই। মাটির চূর্ণ, মাটির তাল, মাটির ঘট, সরা, হাঁড়ি ইত্যাদি কখনও মৃত্তিকা ব্যতীত থাকিতে পারে না; মৃত্তিকাই ইহাদের স্বরূপ। এক মৃত্তিকাই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। নাম ও রূপেরই শুধু পরিবর্ত্তন, শুধু বিকার দৃষ্ট হয় কিন্তু যাহা মৃত্তিকা তাহা মৃত্তিকাস্বরূপ কখনও পরিত্যাগ করে না। নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হইলেও মৃত্তিকা মৃত্তিকাই থাকিয়া যায়। ঘটকে মৃত্তিকা হইতে সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন বলা যাইতে পারে না, আবার ঘটকে মৃত্তিকার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নও বলা যায় না। যাহা কোন বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে কিংবা সম্পূর্ণ অভিন্নও নহে, তাহা সেই বস্তু হইতে ভিন্নাভিন্নও হইতে পারে না। দেখ বৎস, যখন অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুকে সর্প, দণ্ড, জলধারা বলিয়া লোকে মনে করে, তখন বল দেখি, সেই সর্প, দণ্ড ও জলধারা রজ্জুর অবয়ব ব্যতীত আর কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? রজ্জুর অবয়ব হইতেই রজ্জু-সর্প, রজ্জু-দণ্ড ও রজ্জু-জলধারা প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। এই রজ্জু-সর্পকে আকাশকুসুমবৎ একেবারে অসৎ বলিতে পার না; কারণ রজ্জু-সর্প প্রতীতি গ্রাহ্য হইতেছে, কিংবা রজ্জুর মত রজ্জু-সর্পকে সৎও বলিতে পার না, কারণ প্রদীপ লইয়া আসিলে সেই রজ্জু-সর্প আর দৃষ্টি-গোচর হয় না; তখন একমাত্র রজ্জুই বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য ঘট প্রভৃতি বস্তু, নামরূপাত্মক এই জগৎ সৎ হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, ভিন্না-ভিন্নও নহে। নাম-রূপাত্মক এই জগৎকে আকাশকুসুমবৎ অসৎ বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহা প্রতীতির গোচর হইতেছে; আবার ইহাকে সৎও বলা যাইতে পারে না, কারণ সৎ বস্তুর জ্ঞান হইলে, গুরু, আচার্য্য ও শাস্ত্ররূপ প্রদীপের সাহায্যে সৎবস্তুর উপলব্ধি হইলে, তখন নামরূপাত্মক এই জগৎ থাকে না। তখন শুধু সৎই বিদ্যমান থাকে। এইজন্য জগৎকে অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বলা হইয়া থাকে। এক, অদ্বিতীয় "নিষ্কলং, নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরবদ্যং, নিরঞ্জনং" সদ্বস্তুতে ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃই নামরূপাত্মক এই জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

অস্পষ্ট আলোকে যেমন রজ্জুতে রজ্জু-সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ভ্রান্তজ্ঞান বা মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তি বা তমঃ বা অবিদ্যাহেতু এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে নামরূপাত্মক জগৎ দৃষ্ট হয়। ইহা মনে ভাবিও না যে, এই মায়া, শক্তি বা প্রকৃতি স্বীকার করা হেতু অদ্বিতীয়ত্বের কোন হানি হইল। অদ্বৈততত্ত্বের হানি হইত যদি এই মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তির এই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র সত্তা স্বতন্ত্র প্রকাশ থাকিত। তুমি আমার সত্তার অপেক্ষা কর না, আমার অবিদ্যমানেও তুমি থাক, তুমি যে স্থানে, যে সময়ে থাক, আমি ঠিক সেই সময়ে, সেই স্থানে থাকি না; সেই জন্য তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র। দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা আমরা উভয়ে পরিচ্ছিন্ন। আবার আমার মস্তক হস্ত নয়; হস্ত পদ নয়, পদও আবার আমার অঙ্গুলি নয়, অঙ্গুলিগুলি আবার আমার ইন্দ্রিয় নয়, আমার ইন্দ্রিয়গণ আবার মন নয়; আমি কিছু ঐ বটবৃক্ষ নহি, না আমি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, সেইজন্য আমি স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-বিশিষ্ট। কিন্তু এই এক, অদ্বিতীয় সৎবস্তু দেশকাল বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, না ইহাতে কোন স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ বিদ্যমান আছে। এই স্বপ্রকাশ সৎবস্তু অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, একরস। একখণ্ড সৈন্ধব লবণে যেমন সৈন্ধব ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, সেইরূপ এই সৎ বস্তুতে সৎ চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, সেইজন্য মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই ব্রহ্মে কোন প্রকার নানা নাই। তবে এই যে নানাময়ী জগৎ রচনা দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে রজ্জু-সর্পের ন্যায় জানিবে। সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের কোন পৃথক সত্তা নাই। এই যে বিশাল জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, আছে বলিয়া, সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার অস্তিত্ব, ইহার সত্যত্ব এই সৎ বস্তুর উপর নির্ভর করে, এই সৎ বস্তু আছে তাই, জগৎ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে,

যেমন রজ্জু আছে তাই তাহাতে রজ্জুসর্প প্রতীত হয়। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এমন কোন স্থান নাই, এমন কোন কাল নাই যথায় এই সংবস্তু বিদ্যমান না আছে। আমাদের এই কুটীর যখন নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন যেমন সে আকাশ হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছে সেইরূপ বৎস যা কিছু আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা সচ্চিৎ আনন্দকে লইয়া প্রতীত হইতেছে। একমাত্র সৎ বস্তুই আছে, আর যাহা সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহা শুধু বিকার, শুধু নামমাত্র। যখন মায়ার সহিত এই সৎ-বস্তুর তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হয়, তখন সেই সংবস্তু যেন মায়াবিশিষ্ট হইয়া পড়েন এবং নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্ বলিয়া মনে করেন। তখন তাহাতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। সৃষ্টি বলিতে সৎ ব্যতীত অন্য একটা কিছু বুঝিও না। সেই স্বপ্রকাশ সংবস্তুর বিস্তারই হইতেছে সৃষ্টি। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথ্বী, স্বেদজ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ প্রাণিসমূহ, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণসমূহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা সেই সংবস্তুকেই অভিহিত করা হইতেছে, যেমন অন্ধকারে একমাত্র রজ্জুকেই সর্প, দণ্ড, জলধারা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। সৎ বস্তু হইতে স্বতন্ত্র মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তি জগতের কারণ নহে। এই সৎ বস্তুই জগতের কারণ। তিনিই উপাদান কারণ এবং তিনিই নিমিত্ত কারণ। সেই জন্য এই সৎ বস্তুর উপলব্ধি বা জ্ঞানে সব বিদিত হইতে পারা যায়। এখন সেই সংবস্তুর বিস্তাররূপ এই জগৎ কিরূপে হইল, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করা আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তোমার বুদ্ধি যাহাতে সংবিষয়িণী হয়, অদ্বৈত-বিষয়িণী হয়, যাহাতে একত্ব জ্ঞানে তুমি অবস্থান করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পার, সেইজন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া দেখাইব যে, এই জগতের প্রত্যেক বস্তুই সৎ—মূল; এবং কোন

অন্ধ অচেতন জড়াত্মিকা মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তি এই জগতের কারণ নয়। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি মায়াবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং এই জগৎও এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সংস্থান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আরও বলিয়াছি যে, যখনই মায়ার সহিত কল্পিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হয়, তখনই সিসৃক্ষার উদয় হয় এবং সেই সদ্‌বস্তু নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্‌ ও সর্ব্বশক্তিমান্‌ বলিয়া মনে করেন। তিনিই আকাশ ও বায়ুরূপে আপনাকে বিস্তার করিয়া পুনরায়—

তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৎ তেজঃ অসৃজত, তৎ তেজঃ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৎ অপঃ অসৃজত। তস্মাৎ যত্র ক্ব চ শোচতি, স্বেদতে বা পুরুষঃ তেজসঃ এব তৎ অধি আপঃ জায়ন্তে।

মায়ার সহিত কল্পিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধহেতু সংশব্দবাচ্য সেই পরব্রহ্মে যখন সিসৃক্ষার উদয় হইল, তখন তিনি আলোচনা করিয়া বহুরূপে উৎপন্ন হইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ তেজোরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন। তৎপরে তেজোরূপে বিবর্ত্তিত সেই সৎ ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন 'আমি বহু হইব'। এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি জল সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ জলরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন। পরব্রহ্ম স্বস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলরূপে প্রতিভাত হইলেন। জল হইতেছে তেজের কার্য্য, সেইজন্য মনুষ্য যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে শোকতপ্ত কিংবা স্বেদযুক্ত হয়, সেই সময় যে অশ্রু এবং ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহা অভ্যন্তরীণ তেজ হইতেই নির্গত হইয়া থাকে। বৎস শ্বেতকেতু, তোমাকে এই যে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের সৃষ্টির কথা বলিলাম ইহাতে মনে করিও না যে, ইহারা সদ্‌বস্তু হইতে পৃথক। রজ্জু যেমন সর্প, দণ্ড, জলধারা; মৃত্তিকা যেমন ঘট, সরা, হাঁড়ি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই এক, অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ মানবগণ এই একই সৎপদার্থকে বহুরূপে, নানারূপে, দ্বৈতরূপে দেখিতেছে। কোন পদার্থই অসৎ নহে। যাহারা সদ্‌বস্তু হইতে পৃথক অসৎ পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকে এবং সেই অসৎ পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করে, তাহারা তত্ত্বদর্শী নহে। একমাত্র সদবস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা অভিহিত করিয়া লোকে অন্যরূপে দেখিয়া থাকে। সর্প বলিয়া, জলধারা বলিয়া, ঘট বলিয়া, সরা বলিয়া একমাত্র রজ্জুকে এবং মৃত্তিকাকে যেমন লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া ভিন্নরূপে অবলোকন করে, সেইরূপ, পিতা-মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন, পশু পক্ষী, কৃমি কীট, উদ্ভিদ, পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, অবিদ্যা, তমঃ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা এই একই সৎপদার্থকে, একই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে অভিহিত করা হয় মাত্র। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে এই নাম শুধু বিকার, মিথ্যা, একমাত্র সৎপদার্থই সত্য। এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করিতেছেন। তোমার বুদ্ধিকে সদবিষয়িণী কর, পরব্রহ্মবিষয়িণী কর। নামরূপাত্মক এই বিশাল জগৎ পরব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান নাই। পিতৃবুদ্ধি, মাতৃবুদ্ধি, পুত্রবুদ্ধি, কন্যাবুদ্ধি, স্বামীবুদ্ধি, জগৎবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সেই সেই স্থানে সৎ বুদ্ধি, অদ্বৈতবুদ্ধি, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মবুদ্ধিতে উদ্‌বুদ্ধ হও, সত্যের প্রতিষ্ঠা কর, সত্যপ্রতিষ্ঠ হও—

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'

৩

এক বিজ্ঞানে কি প্রকারে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে, এক বস্তু বিজ্ঞাত হইলে কি প্রকারে সর্ব্ববস্তু বিজ্ঞাত হয়—তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে পুনরায় বলিতে

লাগিলেন—বৎস শ্বেতকেতু, তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তৎসমস্তই এই সৎবস্তুরই সংস্থান মাত্র। এই সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া, স্বতন্ত্র হইয়া কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই। 'জগৎ' বলিয়া 'জীব' বলিয়া যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহারা সকলেই এই সদ্বস্তু হইতে অনন্য, সেইজন্য একমাত্র এই সদ্বস্তু বিজ্ঞাত হইলে সব বিজ্ঞাত হয়। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সদ্‌বস্তু ঈক্ষণ করিলেন, আলোচনা করিলেন, "আমি বহু হইব"। এইরূপে আলোচনা করিয়া তিনি তেজ ও জলরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন। জলরূপে বিবর্ত্তিত সেই সদ্বস্তুই পুনরায় আলোচনা করিলেন—

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি ইতি। তা অন্নম্ অসৃজন্ত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠম্ অন্নম্ ভবতি। অদ্ভ্যঃ এব তৎ অধি অন্নাদ্যং জায়তে।

'আমি বহু হইব'।—এইরূপ আলোচনা করিয়া সেই সদ্বস্তু পৃথিবীরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন। সেইজন্য যে কোন স্থানে বৃষ্টিপাত হয়, সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণ অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। জল হইতেই অন্ন সমূহের উৎপত্তি হয়। ব্রীহি, যব প্রভৃতি অন্ন পার্থিব। জল হইতেই এই পার্থিব অন্নসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপে সেই সদ্বস্তুই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। বস্তু স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্যরূপে প্রতিভাত হওয়ার নামই বিবর্ত্তিত হওয়া; যেমন, রজ্জু তাহার রজ্জুস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অস্পষ্ট আলোকে সর্প, জলধারা, দণ্ড, মালা প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই কূটস্থ, অসঙ্গ, চিন্মাত্র, এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু মায়াশবলিত, মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইলে তাঁহাতে সিসৃক্ষার, জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইবার ইচ্ছা হয়। এই যে মায়াশক্তি, এই মায়াশক্তির, আশ্রয়

এবং বিষয় হইতেছে এই সদ্বস্তই। এই সদ্বস্তু ব্যতীত মায়াশক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বেশ ভাল করিয়া অনুধাবন কর, বৎস! উত্তমরূপে বুঝিয়া লও—এই মায়াশক্তি, প্রকৃতি, তমঃ বা অবিদ্যা সদ্বস্তু হইতে স্বতন্ত্র নয়। সদ্বস্তুর সত্তায়, সদ্বস্তুর প্রকাশেই এই মায়াশক্তির সত্তা ও প্রকাশ। সদ্বস্তু ব্যতীত মায়াশক্তির কোন স্বরূপ নাই। সংস্বরূপে এই মায়াশক্তিও তাহার কার্য্য এই জগৎপ্রপঞ্চ সত্য; কিন্তু স্বস্বরূপে মায়াশক্তি ও তাহার কার্য্য জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা; কারণ মায়াশক্তির স্বস্বরূপ বলিয়া কিছু নাই। সংপদার্থই হইতেছে মায়াশক্তির স্বরূপ। অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে যে রজ্জু-সর্প দেখা যায়, সেই রজ্জুসর্প রজ্জুস্বরূপে সত্য কিন্তু সর্পস্বরূপে সত্য নয়। সেইরূপ জগৎ ও জীব সং-স্বরূপে সত্য কিন্তু জগৎস্বরূপে বা জীবস্বরূপে সত্য নয়; কারণ জগৎ ও জীবের কোন নিজ-স্বরূপ নাই। একমাত্র চিন্ময় সংপদার্থই উহাদের স্বরূপ।

যাহারা বলেন, সত্ত্বরজস্তমোময়ী কোন এক অচেতন প্রকৃতি এই জগতের কারণ, তাঁহাদের সেই উক্তি সমীচীন নহে। এই অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল জড়াত্মিকা প্রকৃতিতে সম্ভব হইতে পারে না। চৈতন্য-অধিষ্ঠিত না হইয়া জড়ে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বা কোন ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয় না। বুদ্ধিরূপ উপাধি বিশিষ্ট হইয়া চিন্ময় সংপদার্থই হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, বিরাট প্রভৃতি-রূপে জগৎ কারণ হইয়া থাকে। আর ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা অন্তর্যামী, বিরাট এবং কোটি কোটি জীব ও জগৎ এই চিন্ময় সংপদার্থ হইতে অনন্য বলিয়া এই এক অদ্বিতীয় সংপদার্থের বিজ্ঞানে, সমুদয় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এই এক অদ্বিতীয় চিন্ময় সংপদার্থই তোমার, আমার সকলেরই আত্মা। আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি হইলে, স্বস্বরূপে অবস্থান হইলে সংসারবন্ধন দূরীভূত হয়। তাই বলি বৎস, তুমি এই অসৎ, মিথ্যাভূত জগৎপ্রপঞ্চের দিকে দৃষ্টি না দিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, এই জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ সেই এক অদ্বিতীয় সংপদার্থের প্রতি দৃষ্টি দাও।

তোমার বুদ্ধি এই অতি সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বে সমারূঢ় হউক।

জগতে পশুপক্ষী এই সমুদয় প্রাণী দৃষ্ট হইতেছে, তাহারা সবই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সেই তিন শ্রেণী হইতেছে—

তেষাং খলু এষাং ভূতানাং ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজং উদ্ভিজ্জং ইতি—

এই সমস্ত জীবগণের তিনটী কারণ—অণ্ডজ যথা পক্ষিসর্প ইত্যাদি; জীবজ যথা জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি এবং উদ্ভিজ্জ বৃক্ষলতা প্রভৃতি।

প্রিয় শ্বেতকেতু, এই জগতে যত কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই দুইটী দিক আছে, দুইটি অংশ আছে। একটা দিক হইতেছে চৈতন্যের দিক, সচ্চিদানন্দের দিক; আর একটা দিক হইতেছে ভৌতিক, জড়ের দিক; এই দুটো দিক ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়াছে—উদ্ভিদে, অণ্ডজে, জীবজে। তাই বলিয়া মনে করিও না শৈলমালা-সমন্বিতা, শস্যশালিনী এই পৃথিবী, রসাত্মিকা, স্নেহশালিনী স্বচ্ছ সলিলধারা, রূপ ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তকারী তেজ, জীবনপ্রদ, কুসুম-সৌরভবাহী সতত সঞ্চরণশীল বায়ুপ্রবাহ এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে অবকাশ প্রদানকারী সীমাহীন আকাশ ইহারা কেবল জড়াত্মক। ইহাদিগের প্রত্যেকটীতেও চৈতন্যেরও একটা দিক আছে। কিন্তু সেই চৈতন্য যেন মহাসুষুপ্তিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য উক্ত মহাভূতসমূহকে লোকে জড় বলিয়া অভিহিত করে। এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপ, চিংস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, পদার্থই উপাধিবিশিষ্ট হইয়া জীব ও জগংরূপ ব্যবহারের আস্পদ হইয়াছে, উপাধিবিশিষ্ট সেই একই সংপদার্থকে লোকে নানা জীব ও জগং বলিয়া অভিহিত করিতেছে। স্বপ্রকাশ এই সংপদার্থ সর্ব্বত্র অনুস্যূত, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভৌতিক পদার্থের সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধহেতু, সেই সেই পদার্থে অভিমানবশতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সহস্র সহস্র নাম, সহস্র সহস্র রূপে ফুটিয়া পড়িয়াছে।

সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম্ ইমাম্ তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি।

উপাধিবিশিষ্ট সেই চিন্ময় সৎপদার্থই চিন্তা করিলেন—ভাল, আমি এই জীবাত্মারূপে তেজ জল ও পৃথিবীরূপে ভূতত্রয়াত্মক দেবতাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব।

শোন শ্বেতকেতু, আমার এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, যখনই আমি "দেবতা" এই শব্দ ব্যবহার করিব, তখনই তাহাকে অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিবে। যেমন তেজ দেবতা, জল দেবতা, পৃথিবী দেবতা অর্থাৎ সমগ্র তেজ, সমগ্র জল, সমগ্র পৃথিবী। এখন যাহাকে তেজ, জল বা পৃথিবী বলিয়া জানিতেছ তাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা উক্ত তিন ভূতের সম্মিলিত অবস্থা; তাহা ব্যষ্টি, পরিচ্ছিন্ন। এই পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক পৃথিবীর দেবভাব বা পৃথিবী দেবতা হইতেছেন অগ্নি বা জ্যোতিঃ। জলের দেবভাব বা জল দেবতা হইতেছে রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তেজের দেবভাব বা তেজ দেবতা ও জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহারা সকলেই সমান সকলেই অনন্ত। উক্ত তিন মহাভূত সৃষ্টি করিয়া সেই সৎ পদার্থ জীবাত্ম-রূপে ইহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ পদার্থ পরমার্থতঃ অসঙ্গ, অসংসারী এবং নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত হইলেও মায়ারূপ উপাধি বশতঃ জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহাতে সংকল্প এবং মহাভূতের অভ্যন্তরে প্রবেশ উপপন্ন হয়। চিন্মাত্র সৎপদার্থের আভাসই হইতেছে ঈশ্বর ও জীব, নির্ব্বিকল্প চিন্মাত্র এই সৎপদার্থ মায়া-রূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঈশ্বর-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তখনই তাঁহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সংস্কার জাগিয়া উঠে। তখনই তিনি নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্, সর্ব্ব শক্তিমান্ বলিয়া মনে করেন, এবং ঈক্ষণপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করেন। মায়া হইতেছে ভোগায়তনং। এই মায়া চৈতন্যদীপ্ত হইয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে নানা নাম ও রূপে পরিণত হইতে থাকিলে চৈতন্যও

তোমাকে বলেছি একমাত্র স্বপ্রকাশ সৎপদার্থই সত্য। এই যে আকাশ, বাতাস প্রভৃতি ভৌতিক জগৎ এবং আমি, তুমি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা প্রভৃতি জীবসমূহকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে ইহাদের কাহারও নিজের বলিয়া কোন স্বরূপ নাই। যেমন মৃণ্ময় কলসী, সরা, হাঁড়ি প্রভৃতির নিজের কোন স্বরূপ নাই; মৃত্তিকাই যেমন উহাদের প্রত্যেকেরই স্বরূপ; কলসী বলিয়া, 'সরা,' 'হাঁড়ি' বলিয়া যেমন কোন সৎ পদার্থ মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বিদ্যমান নাই; কলসী, হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি যেমন এক মৃত্তিকারই সংস্থানবিশেষ; কলসী প্রভৃতি যেমন কতকগুলি নাম মাত্র, সেইরূপ শ্বেতকেতু, সেইরূপ এই বিশাল জগৎ ও জীব কেবল নামমাত্র। এই ভৌতিক জগতের ও জীবের নিজের কোন স্বরূপ নাই। একমাত্র স্বপ্রকাশ আনন্দঘন সৎপদার্থই এই জীব ও জগতের স্বরূপ। সৎস্বরূপে জীব ও জগৎ সত্য কিন্তু নিজ স্বরূপে ইহারা মিথ্যা, কেবল নামও রূপমাত্র। যেমন ঘট বলিয়া সরা বলিয়া একমাত্র মৃত্তিকাকেই লোকে অভিহিত করে, সেইরূপ পিতা বলিয়া মাতা বলিয়া, স্বামী বলিয়া, স্ত্রী বলিয়া, পুত্র বলিয়া, কন্যা বলিয়া, বন্ধুবান্ধব বলিয়া, আত্মীয়-স্বজন বলিয়া, স্থাবর বলিয়া, জঙ্গম বলিয়া, জড় বলিয়া, চেতন বলিয়া আমরা এই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দকেই অভিহিত করিয়া থাকি। আমাদের বুদ্ধি সর্ব্বদা নামরূপ-বিহারিণী হইতেছে বলিয়া আমরা আমাদের স্বরূপ এই সচ্চিদানন্দকে জ্ঞানতঃ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তুমি এই স্বপ্রকাশ, আনন্দঘন সৎপদার্থ দ্বারা জীব ও জগৎকে ঢাকিয়া দেখ। তিলে তৈলের ন্যায়, দধিতে ঘৃতের ন্যায় এই সৎপদার্থ জীব ও জগতের নাম ও রূপের অন্তর বাহির, অধঃ ঊর্দ্ধ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জগৎ 'জগৎ' বলিয়া, জীব 'জীব' বলিয়া, নামরূপ 'নামরূপ' বলিয়া যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে ইহার কারণ কেবলমাত্র এই স্বপ্রকাশ আনন্দঘন সৎপদার্থের সত্যতা। এই সৎপদার্থই 'সত্যস্য সত্যং'।

স্থূল জগতই সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র যখন পঞ্চীকৃত হয়, তখনই তাহারা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং আমাদের ব্যবহারের যোগ্য হয়। কিন্তু বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, শ্বেতকেতু, সাধারণতঃ আমরা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা, রূপ দেখিয়া সেই সেই রূপের এক একটা নাম নির্দ্দেশ করি। তেজের আবির্ভাব হইতেই স্থূল জগৎ বেশ স্পষ্টরূপে আমাদের অনুভূতিতে আসে। সেইজন্য আমি বলিয়াছি সেই সৎপদার্থ ঈক্ষণ করিয়া তেজোরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন। সেই তেজোদেবতা ঈক্ষণ করিয়া জলদেবতা এবং জলদেবতা ঈক্ষণ করিয়া পৃথিবীদেবতারূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তোমাকে যে বার বার 'দেবতা ঈক্ষণ করিলেন' 'দেবতা ঈক্ষণ করিলেন' বলিয়াছি তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে পাছে তুমি মনে না কর যে এই এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থ হইতে স্বতন্ত্র কোন মূল পদার্থ যথা মায়া, শক্তি বা প্রকৃতি জগতের কারণ। কোন জড় প্রকৃতি জগতের কারণ নহে। চেতনই জগতের কারণ। সৃষ্টিসম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য তেজ, জল ও পৃথিবী—এই তিন মহাভূতই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। জগতের সমস্ত বস্তুই, আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সবই এই তিনভূতের সংমিশ্রণ মাত্র। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, যেমন একমাত্র স্বর্ণ ই হার, অঙ্গুরী প্রভৃতি স্বর্ণময় ভূষণে অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ সেই এক, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ সৎপদার্থ স্বীয় আভাসরূপ জীবাত্মা-রূপে তেজ, জল ও পৃথিবী তন্মাত্রা মধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ভূতত্রয়কে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়া নাম ও রূপকে প্রকাশ করিলেন।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং করবাণি ইতি। সা ইয়ং দেবতা ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন এব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

সেই সৎ পদার্থ সংকল্প করিলেন যে এই তেজ, জল ও পৃথিবীরূপ দেবতাসমূহের প্রত্যেককে ত্রিবিৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তিনভূতাত্মক করিব। এইরূপ সংকল্প করিয়া জীবরূপে অর্থাৎ স্বীয় অংশরূপে উক্ত তিন দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপকে প্রকটিত করিলেন।

তেজ, জল ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত হইলেও, তাহাদের সেই মিলিত বিভিন্ন অবস্থাকে লোকে এক একটি নাম দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকে। এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, ইহা শুধু পৃথিবী নয়, ইহাতে পৃথিবী, জল ও তেজ রহিয়াছে, তবে পৃথিবীর ভাগ বেশী বলিয়া ইহাকে পৃথিবী বলা হইতেছে মাত্র।

তাসাং ত্রিবৃতং, ত্রিবৃতং একৈকাং অকরোৎ। যথা তু খলু সোম্য, ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবিৎ একৈকাভবতি তন্মে বিজানীহি ইতি।

সেই সৎ পদার্থ জীবরূপে তেজ, জল ও পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। তিনভূতাত্মক হইয়াও সেই দেবতাত্রয় (তেজ, জল পৃথিবী) যে প্রকারে এক একটি নামে পরিচিত হইয়া থাকে তাহা, হে সোম্য, আমার নিকট হইতে বিশেষভাবে অবগত হও।

এই যে একটী স্থূলপদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে যাহাকে তুমি 'অগ্নি' এ[illegible] একটি নাম দ্বারা অভিহিত করিতেছ এবং ভাবিতেছ যে উহা [illegible]টি পদার্থ মাত্র। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে— এই পদার্থটী যাহাকে তুমি অগ্নি বলিতেছ, উহা একটী পদার্থ নহে। উহাতে লোহিতরূপ দৃষ্ট হয় তাহা তেজো মাত্র, অমিশ্রিত তেজ, যে শুক্লবর্ণ উহাতে দেখা যায় তাহা শুদ্ধ অবিমিশ্রিত জলের রূপ, যে কৃষ্ণবর্ণ উহাতে লক্ষিত হয় তাহা অবিমিশ্রিত পৃথিবীর রূপ মাত্র। এখন বুঝিতে

পারিলে যাহাকে তুমি অগ্নি বলিতেছ তাহা লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এইতিন রূপের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নয় ; উহা তেজ জল ও পৃথিবী এই তিন মহাভূতের সংমিশ্রণ মাত্র। যে পদার্থে 'অগ্নি' এই নাম এবং সেই নামের অনুরূপ বুদ্ধি তোমার হইতেছিল এখন সেই পদার্থে উক্ত 'অগ্নি' এই নাম এবং সেই নামানুরূপ বুদ্ধি তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। উক্ত পদার্থে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা ঐ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত, ঐ তিনটী রূপ ছাড়া আর কিছুই নাই। তাই তোমাকে বলি বৎস—

যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তৎ রূপং, যৎ শুক্লং তৎ অপাম্, যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ অগ্নেঃ অগ্নিত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্।

অগ্নির যাহা লোহিত রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা বস্তুতঃ তেজেরই রূপ, যাহা শুক্ল রূপ তাহা জলের রূপ, যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা পৃথিবীর রূপ। এইরূপে অগ্নি বলিয়া লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ ব্যতীত কোন পদার্থ নাই। অগ্নির অগ্নিত্ব এইরূপে চলিয়া গেল। কারণ উহা নাম মাত্র, বাক্যের বিকার এবং মিথ্যাভূত। উক্ত তিনটি রূপই সত্য অর্থাৎ উক্ত তিনটী রূপ ব্যতীত অগ্নি বলিয়া কোন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ নাই।

সেইরূপ বৎস যাহা কিছু আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাদের এই অস্তিত্ব সেই সৎ পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা তোমার আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে তাহা সেই চিৎ, সেই স্বপ্রকাশ সৎ পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, যাহা কিছু ভোগ্যরূপে, সুখরূপে অনুভূত হইতেছে তাহা সেই আনন্দঘন সৎ পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। এই এক, অদ্বিতীয় আনন্দঘন স্বপ্রকাশ সৎ পদার্থকেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলিতেছি

মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ এই নাম ও রূপ মিথ্যা, কেবল বাক্যের বিকার মাত্র। একমাত্র সচ্চিদানন্দই সত্য। তাই বলি বৎস, তুমি জগতের প্রত্যেক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া বিবেক বিচার পূর্ব্বক চিৎ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এই সৎ পদার্থকেই গ্রহণ কর। হংস যেমন জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, তুমিও সেইরূপ মিথ্যাভূত নাম ও রূপকে পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া কৃতকৃত্য হও।

পুত্র শ্বেতকেতুকে একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে দেখিয়া উদ্দালক আরুণি প্রীত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

বৎস শ্বেতকেতু, পূর্ব্বে তোমাকে দেখাইয়াছি যে যাহাকে তুমি অগ্নি বলিয়া অভিহিত কর তাহা শুধু লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেইরূপ যাহাকে আদিত্য বলিয়া, চন্দ্র বলিয়া, বিদ্যুৎ বলিয়া একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিতেছ তাহাও এই লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ ছাড়া আর কিছুই নহে।

যৎ আদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসঃ তৎরূপং, যৎ শুক্লং তৎ অপাং, যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ আদিত্যাৎ আদিত্যত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্।

যৎ চন্দ্রমসঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তৎ রূপং, যৎ শুক্লং তৎ অপাং, যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ চন্দ্রাৎ চন্দ্রত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্।

যৎ বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসঃ তৎ রূপং, যৎ শুক্লং তৎ অপাং, যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্।

যাহা সূর্য্যে রক্তবর্ণ তাহা তেজের রূপ, যাহা শুক্ল তাহা জলের রূপ, যাহা কৃষ্ণ তাহা পৃথিবীর রূপ, চন্দ্রে যাহা লোহিত রূপ দৃষ্ট হয় তাহা তেজের রূপ, যাহা শুক্ল তাহা জলের রূপ, যাহা কৃষ্ণ তাহা পৃথিবীর রূপ, ঐ বিদ্যুতে যাহা লোহিত রূপ, তাহা তেজের, যাহা শুক্ল তাহা জলের রূপ, যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা পৃথিবীর রূপ। এইরূপে আদিত্যের আদিত্যত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রত্ব, বিদ্যুতের বিদ্যুতত্ব চলিয়া গেল, কারণ তাহারা কেবল মিথ্যাভূত নামমাত্র কেবল লোহিত শুক্ল, কৃষ্ণ বর্ণই সত্য অর্থাৎ যাহাকে লোকে আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ বলিয়া অভিহিত করে তাহা তেজ, জল ও পৃথিবী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপে বাহ্য জগতে যত কিছু বিশেষ বিশেষ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা তেজ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের সংমিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেইজন্য—

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্‌বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহা-শ্রোত্রিয়াঃ ন নোঽদ্য কশ্চন অশ্রুতং অমতং অবিজ্ঞাতং উদাহরিষ্যতি ইতি হি এভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ।

যৎ অবিজ্ঞাতমিব অভূৎ ইতি এতাসাং এব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্‌ বিদাঞ্চক্রুঃ যথা তু খলু সোম্য ইমাঃ তিস্র দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহি ইতি।

এই রূপত্রয়ের বিজ্ঞান হইতে অর্থাৎ নামরূপাত্মক এই জগৎ যে কেবল লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ তেজ জল পৃথিবী এই তিন মহাভূতের সমষ্টি মাত্র ইহা উত্তমরূপে অবগত হইয়া এবং এই নামরূপাত্মক জগৎ যে জগৎরূপে মিথ্যা ও সৎস্বরূপে সত্য, একমাত্র স্বপ্রকাশ সৎ পদার্থই সত্য এইরূপে সৎ পদার্থের বিজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ব্বতন বড় লোক, বিদ্বান্

পণ্ডিতগণ বলিয়াছিলেন—আমাদের অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত এমন কোন বিষয়ই এ পর্য্যন্ত কেহ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহারা রূপত্রয়ের বিজ্ঞান হইতেই জগতের যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। জগতে যত কিছু পদার্থ আছে তাহারা তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন মহাভূতের সমষ্টি মাত্র। কেবল নাম ও রূপ। নাম কেবল বাক্যের বিকার মাত্র, মিথ্যাভূত। সচ্চিদানন্দই একমাত্র সত্য বস্তু। এই সৎ বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিলে জগতের সমুদয় পদার্থই বিজ্ঞাত হইয়া যায়। বাহ্য জগৎ যেরূপ মিথ্যা, কেবল নাম মাত্র, সেইরূপ আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরও উক্ত তেজ, জল পৃথিবী এই তিন মহাভূতের সমষ্টি মাত্র, কেবল নাম-রূপ শুধু মিথ্যা। একমাত্র এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ সৎ পদার্থই সত্য।

৫

উদ্দালক আরুণি একজন মহর্ষি। ঋষিগণ সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। এখন যেরূপ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা, মনের দ্বারা জ্ঞান লাভ করি, ঋষিরা সেরূপ-ভাবে জ্ঞানলাভ করিতেন না। মন আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কেবল এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহারা মনেরই বিভিন্ন প্রকাশ। স্বপ্নাবস্থায় 'এক মনই' বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করিয়া বিষয়ভোগজনিত জ্ঞান অনুভব করে। জাগ্রৎ অবস্থার সংস্কার লইয়া মনই স্বপ্নাবস্থায় বিষয়সমূহও সৃষ্টি করিয়া থাকে। সমুদয় বিষয় ও সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মানবীয় মন সাধারণতঃ বহির্মুখ বলিয়া, পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, অন্নময় ও প্রাণময় কোষদ্বারা বদ্ধ বলিয়া ইহা জ্ঞানলাভের জন্য ইন্দ্রিয়, এবং প্রাণময় অন্নময় কোষের উপর নির্ভর

করে। ঋষিগণ সাধনাবলে মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের পরিচ্ছিন্নত্ব দূর করিয়া তাহাদিগকে দেবভাব প্রাপ্ত করাইতেন। তাঁহাদের দেহ পর্য্যন্ত দিব্যভাব ধারণ করিত। শ্রুতি বলেন—

পৃথিব্যৈ চ এনম্ অগ্নেশ্চ দৈবী বাক্ আবিশতি। সা বৈ দৈবী বাক্ যয়া যৎ যৎ এব বদতি তৎ তৎ ভবতি।

দিবশ্চ এনম্ আদিত্যাৎ চ দৈবং মন আবিশতি, তৎ বৈ দৈবং মনো যেন আনন্দী এব ভবতি অথো ন শোচতি।

অদ্ভ্যশ্চ এনম্ চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি, স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সঞ্চরংশ্চ অসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতে অথো ন রিষ্যতি।

পৃথিবী হইতেছে স্থূল জড়দেহ। সাধনাবলে ঋষিগণের স্থূলদেহ প্রাণদেহ, মনোময়দেহ দিব্যভাব ধারণ করিত। দেহ দিব্যভাব ধারণ করিলে দৈবী বাক্ ঋষিতে প্রবেশ করিত, তখন তিনি যাহা যাহা বলিতেন ঠিক তাহাই হইত। দ্যুলোক এবং আদিত্য ইন্দ্রিয়াতীত [illegible] সম্যক্‌জ্ঞানের দ্যোতক। তখন দ্যুলোক হইতে আদিত্য হইতে দৈব মন তাঁহাতে প্রবেশ করিত। তখন মন অতিমনে পরিণত হইত। [illegible] অতিমন যুগপৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎকে প্রকাশ করিতে সমর্থ। [illegible] সমগ্র বিশ্ব এই অতিমনে বিধৃত। স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় বিশ্বের জ্ঞানও [illegible] খণ্ডরূপে এই অতিমনে বিদ্যমান। সুতরাং ঋষিগণের জ্ঞান [illegible] উপর নির্ভর করিত না। তাঁহাদের জ্ঞান-ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ, [illegible] অপরোক্ষ ছিল। মন দৈব হইলে শোক মোহ বিদূরিত হইত [illegible] ঋষিগণ আনন্দী হইতেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের নিরাবিল [illegible] আনন্দে সতত অধিষ্ঠিত থাকিতেন। জল এবং চন্দ্রমা আনন্দের [illegible] শ্রুতিতে সমুদ্র বা আপঃ পরমাত্মার প্রতীক। তখন [illegible] সচ্চিদানন্দ হইতে দৈব প্রাণ ঋষিতে প্রবেশ করিত। দৈব

প্রাণ তাহাকে বলে—যে প্রাণ, সঞ্চরণশীল কিংবা অসঞ্চরণশীল কোন অবস্থায় ব্যথা প্রাপ্ত হয় না, কি স্থাবর কি জঙ্গম কোথায়ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। ঋষিগণের জীবন জন্ম-মৃত্যু পরিচ্ছেদ রহিত হইত, অন্ন বা জড় তাঁহার জীবনকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না। ঋষিগণ দিব্যদেহে দিব্য-জীবনে দিব্যমনে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের নিরাবিল আনন্দ আস্বাদন করিতেন। উদ্দালক আরুণি এইরূপ একজন ঋষি ছিলেন। এক বস্তুর বিজ্ঞানে কি প্রকারে সমুদয় পদার্থের জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই তিনি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি শ্বেতকেতুকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে জানিলে সব পদার্থই অবগত হওয়া যায়। মৃত্তিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি শ্বেতকেতুকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে একমাত্র সচ্চিৎ আনন্দ পরমেশ্বরই সত্য। তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত করা হয় মাত্র। যেমন মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন সংস্থানকে সরা, হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়; যেমন রজ্জুকে সর্প, জলধারা, দণ্ড, মালা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দকে শক্তি, মায়া, প্রকৃতি, ঈশ্বর, জীব, এক, বহু, দ্বৈত, অদ্বৈত, সগুণ, নিগুর্ণ নিগুর্ণোগুণী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। জগতে কোন পদার্থ সৎস্বরূপে মিথ্যা নহে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্যতীত জগতের পৃথক্ সত্তা নাই, যেমন রজ্জু ব্যতীত সর্পের পৃথক্ সত্তা নাই, মৃত্তিকা ব্যতীত কলসীর পৃথক্ সত্তা নাই। রজ্জু ও মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে রজ্জু ও মৃত্তিকার বিবর্ত সর্প কলসী প্রভৃতি পদার্থ ও তাহাদের জ্ঞান যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ ও জগতের জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় থাকে না। একমাত্র সচ্চিদানন্দই জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়। আমরা অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রয়োগ করিয়া

এক একটী পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকি ; কিন্তু সেই সেই নামীয় কোন বস্তু নাই। সেই বস্তুগুলি কেবল তেজ, জল ও পৃথিবীর সংমিশ্রণ মাত্র। আমাদের দেহও উক্ত তিন বস্তুর সংমিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক্ষণে উদ্দালক আরুণি ইহাই শ্বেতকেতুকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিলেন।

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যঃ অণিষ্ঠঃ তৎ মনঃ।

আপঃ পীতাঃ ত্রেধা বিধীয়ন্তে। তাসাং যং স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ তৎ মূত্রং ভবতি, যো মধ্যমঃ তৎ লোহিতং, যঃ অণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ।

তেজঃ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ তৎ অস্থি ভবতি, যো মধ্যমঃ স মজ্জা, যঃ অণিষ্ঠঃ সা বাক্। অন্নময়ং হি সোম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্ ইতি।

আমরা যে অন্ন ভক্ষণ করি তাহা জীর্ণ হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যাহা স্থূলতম অংশ তাহা পুরীষ, যাহা মধ্যম অংশ তাহা মাংস এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মনোরূপে পরিণত হয়। মন অন্নেরই সূক্ষ্মতম পরিণাম বলিয়া ইহা ভৌতিক বস্তু। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে মন ব্যাপিয়া থাকে এবং ইহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ। মনকে যে নিত্য বলা হয় তাহা আপেক্ষিক জানিবে। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নিত্য নহে।

জল পান করিলে সেই জল জঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া তিনরূপে বিভক্ত হয়। তাহার যে স্থূল অংশ তাহা মূত্ররূপে, যে মধ্যম অংশ তাহা রক্তরূপে, যাহা সূক্ষ্মতম ভাগ তাহা প্রাণরূপে পরিণত হয়।

তৈল ঘৃত প্রভৃতি তেজোময় পদার্থ ভক্ষিত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলতম ভাগ অস্থিরূপে, মধ্যম ভাগ মজ্জারূপে এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্‌রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

প্রিয় শ্বেতকেতু, তুমি নিশ্চয়রূপে অবগত হও যে মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী। ইহা যেন ভুলিয়া যাইও না যে আমরা অত্রিবৃৎকৃত অন্ন, জল ও তেজ ভক্ষণ বা পান করি। ত্রিবৃৎ অর্থাৎ অন্ন, জল ও তেজের মিলিত বস্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকি। তেজের মাত্রা $\frac{২}{৪}$ এবং জল ও অন্নের মাত্রা যাহাতে $\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}$ অর্থাৎ $\frac{২}{৪}$ তাহাই ত্রিবৃৎ তেজ, এইরূপে জল $\frac{২}{৪}$+তেজ $\frac{১}{৪}$+ অন্ন $\frac{১}{৪}$=ত্রিবিৎ জল এবং অন্ন $\frac{২}{৪}$+তেজ $\frac{১}{৪}$+ জল $\frac{১}{৪}$=ত্রিবিৎ অন্ন। সুতরাং আমরা কখনও অত্রিবৃৎকৃত অন্ন বা ঘৃতাদি ভোজন করি না কিংবা অত্রিবৃৎকৃত সলিলও পান করি না। শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আপনি যে বলিলেন মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাক্য তেজোময় তাহা আমি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং পুনরায় আপনি আমাকে ঐ বিষয়ে উপদেশ করুন।

ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ।

শ্বেতকেতুর প্রশ্নে উদ্দালক আরুণি অতীব প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যঃ অণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তৎসর্পির্ভবতি॥ এবমেব খলু সোম্য অন্নস্য অশ্যমানস্য যঃ অণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি। তৎ মনো ভবতি।

অপাং সোম্য পীয়মানানাং যঃ অণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি। স প্রাণো ভবতি।

তেজসঃ সৌম্য অশ্যমানস্য যঃ অণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি। সা বাগ্‌ভবতি।

অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ; আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্। ইতি।

বৎস শ্বেতকেতু, তুমি দেখিয়াছ দধি মন্থন করিলে তাহার অতি সূক্ষ্মাংশ নবনীতরূপে উর্দ্ধে উত্থিত হয়, পরে তাহাই ঘৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সেইরূপ বৎস, ভুক্তান্ন জঠরাগ্নিদ্বারা মথিত হইলে তাহার অতি সূক্ষ্মাংশ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ক্রমে মনোরূপে পরিণত হয়।

জল পান করিলে জলের অতিসূক্ষ্মভাগ উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং ক্রমে তাহা প্রাণরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ, শ্বেতকেতু, আমরা ঘৃতাদি যে সব তেজোময় পদার্থ ভক্ষণ করি সেই তেজোময় পদার্থের অতিসূক্ষ্ম অংশ উর্দ্ধে সমুত্থিত হয় এবং তাহাই ক্রমে বাক্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইজন্যই তোমাকে বলিয়াছি মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাক্ তেজোময়ী।

শ্বেতকেতু স্বীয় পিতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পুনরায় বলিলেন—

ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সৌম্যেতি হোবাচ।

ভগবন্, আপনি যাহা উপদেশ করিলেন তাহা এখনও আমি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই সুতরাং আপনি কৃপাপূর্ব্বক পুনরায় উক্তবিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

শ্বেতকেতুর তত্ত্ব অবধারণ বিষয়ে ঐকান্তিকতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া উদ্দালক আরুণি বলিলেন, "আচ্ছা, বৎস, আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।"

৬

মহর্ষি আরুণি মনের অন্নময়ত্ব, প্রাণের আপোময়ত্ব এবং বাকের তেজোময়ত্ব স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝাইয়া দিলেও শ্বেতকেতু তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন না। প্রাণ আপোময় এবং বাক্ তেজোময়ী ইহা বুঝিতে পারিলেও মনের অন্নময়ত্ব বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ থাকিয়া গেল। সেইজন্য যখন তিনি মহর্ষি আরুণিকে বলিলেন, "ভগবন্ আপনি দৃষ্টান্তদ্বারা মনের অন্নময়ত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন," তখন মহর্ষি আরুণি বলিলেন—

ষোড়শকল সৌম্য পুরুষঃ, পঞ্চদশাহানি মাশীঃ; কামমপঃ পিব; আপোময়ঃ প্রাণো, ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি॥

বৎস, পুরুষ ষোড়শকলাযুক্ত; পঞ্চদশ দিবস ভোজন করিও না, কিন্তু যথা ইচ্ছা জল পান করিও; কারণ প্রাণ আপোময়; জল পান না করিলে প্রাণ-বিয়োগ হইতে পারে।

আমরা যে সমুদয় অন্ন ভোজন করি সেই অন্নের সূক্ষ্মতম ভাগ মনকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলে। অন্নের দ্বারা বর্দ্ধিত মনের সেই শক্তি ষোড়শভাগে বিভক্ত হইয়া কলা নামে অভিহিত হয়। এই ষোড়শশক্তি-সমন্বিত, দেহেন্দ্রিয়যুক্ত, জীববিশিষ্ট পুরুষকেই ষোড়শকল বলা হইয়া থাকে। এই মানসীশক্তিবিশিষ্ট হইয়াই পুরুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, জ্ঞাতা, বিজ্ঞাতা, কর্ত্তা এবং অপর সর্ব্ববিধকার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকে। মনের এই শক্তি যদি না থাকে, পুরুষ যদি এই মানসীশক্তি-শূন্য হয়, তাহা হইলে কোন বিষয়েই তাহার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য মনেরই কার্য্য। আবার মনের এই শক্তি অন্ন হইতে লব্ধ হয়। ভুক্তান্ন হইতে জাত এই শক্তি মনে ষোড়শভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া এই শক্তিযুক্ত

পুরুষকে ষোড়শকল বলে। যদি তুমি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে পঞ্চদশ দিবস ভোজন করিও না। কিন্তু প্রাণ জলের বিকার বলিয়া যথেচ্ছ জল পান করিও; তাহা না হইলে তোমার প্রাণ-বিয়োগ হইতে পারে। কার্য্য কখনও স্বীয় কারণকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ মত কার্য্য করিলেন। অর্থাৎ—

স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ। কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজুংষি সামানি ইতি, স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি॥

শ্বেতকেতু মনের অন্নময়ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষে পঞ্চদশ দিবস ভোজন করিলেন না। তৎপরে ষোড়শ দিবসে স্বীয় পিতা মহর্ষি আরুণির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ, আমি এখন কি বলিব, তাহা আদেশ করুন।" আরুণি বলিলেন—"বৎস, তুমি ঋক্, যজু, সাম মন্ত্রসমূহ বল।" পিতার আদেশ শ্রবণে শ্বেতকেতু বলিলেন—"পিতঃ ঋগাদি বেদত্রয় আমার মনে স্ফুরিত হইতেছে না।" মহর্ষি আরুণি তখন শ্বেতকেতুকে বলিলেন—"বৎস, তোমার মনে ঋক, যজু, সাম মন্ত্র কি কারণে প্রতিভাত হইতেছে না তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।"

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্য একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ, তেন ততোঽপি ন বহু দহেৎ, এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানাম্ একা কলা অতিশিষ্টা স্যাৎ; তয়া এতর্হি বেদান্ ন অনুভবসি। অশান; অথ মে বিজ্ঞাস্যসি ইতি॥

যেমন প্রভূত পরিমাণ কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্বলিত মহান্ অগ্নির সামান্য খদ্যোৎ পরিমাণ একখণ্ড অঙ্গার অবশিষ্ট থাকিলে সেই অঙ্গারস্থিত অগ্নি-তাহা হইতে অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ তৃণাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ হে সৌম্য, অন্নোপচিত তোমার মনের ষোড়শকলার মধ্যে একটী

মাত্র কলা অবশিষ্ট থাকায় সেই একটী মাত্র কলা দ্বারা বেদসমূহ স্মরণ করিতে পারিতেছ না। এখন যাও, ভোজন কর, তাহা হইলে আমার উপদেশ-বাক্য নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিবে।

শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ মত কার্য্য করিলেন।

সহাশাথ হৈনমুপসসাদ। তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বং হ প্রতিপেদে।

তং হোবাচ যথা সৌম্য মহতোঽভ্যাহিতস্য একম্ অঙ্গারম্ খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈঃ উপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ ; তেন ততোঽপি বহু দহেৎ।

এবং সৌম্য তে ষোড়শানাং কলানাম্ একা কলা অতিশিষ্টা অভূৎ ; সা অন্নেন উপসমাহিতা প্রাজ্বালীৎ তয়া এতর্হি বেদান্ অনুভবসি। অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্ ইতি। তৎ হ অস্য বিজজ্ঞৌ ইতি বিজজ্ঞৌ ইতি ॥

শ্বেতকেতু পিতার আদেশ [illegible] পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন [illegible] যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শ্বেতকেতু [illegible] শব্দতঃ ও অর্থতঃ বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তখন আরুণি পুনরায় [illegible] দিদ্বারা বর্দ্ধিত প্রজ্বলিত অগ্নির [illegible] অবশিষ্ট থাকে এবং সেই অঙ্গারটিকে [illegible] করা যায়, তাহা হইলে সেই অগ্নি [illegible] দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ বৎস, তুমি [illegible] করায় কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায়, অন্নের দ্বারা উপচিত [illegible] শক্তিরূপা ষোড়শ কলা

হ্রাস হইতে হইতে একটী মাত্র কলায় অবশিষ্ট হইয়াছিল, এখন ভোজন করা হেতু সেই কলা অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেইজন্য তুমি এখন বেদাদি শাস্ত্র স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছ। আহারাভাবে মনের শক্তির হ্রাস এবং আহারে মনের শক্তির বৃদ্ধি হয় বলিয়া মনকে অন্নময় বলা হইয়া থাকে। মনের অন্নময়ত্ব যেরূপে সিদ্ধ হইল, প্রাণের আপোময়ত্ব এবং বাকের তেজোময়ত্বও সেইরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। সেইজন্য আমি বলিয়াছি মন অন্নময়, প্রাণ সলিলময় এবং বাক্ তেজোময়ী। শ্বেতকেতুও পিতার উপদেশে মনের অন্নময়ত্ব, প্রাণের আপোময়ত্ব এবং বাক্যের তেজোময়ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলেন।

উদ্দালক আরুণি বলিতে লাগিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু, এখন তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছ আমাদের বাহিরে এই বিশাল ব্যক্ত জগৎ তেজ, জল ও পৃথ্বী এই ভূতত্রয়াত্মক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং আমাদের স্থূলদেহ আমাদের প্রাণ, আমাদের মন ইহারাও এই ভূত-ত্রয়াত্মক। আবার এই ভূতত্রয় হইতেছে সন্মূলক। সেই একই সৎপদার্থ এইরূপে বিভাত হইতেছে। জগৎ ও আমাদের দেহ প্রাণ ও মন সেই সৎপদার্থের সংস্থান ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেই একমাত্র সৎপদার্থকেই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও বিভিন্নরূপ দ্বারা লোকে অভিহিত করে মাত্র। মৃন্ময় ঘট, কলসী, সরা, হাঁড়ি যেমন মৃত্তিকারই সংস্থান-বিশেষ, ঘট কলসী প্রভৃতি যেমন নাম মাত্র এবং মৃত্তিকাই যেমন সত্য, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থই একমাত্র সত্য বস্তু, আর জগৎ, দেহ, প্রাণ, মন ইত্যাদি কেবল নাম মাত্র। কলসী প্রভৃতির যেমন মৃত্তিকা ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সেইরূপ এই জগতেরও সেই এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থ ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সেই এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থই জগতের স্বরূপ। সৎস্বরূপে জগৎ সত্য, কিন্তু জগৎ-স্বরূপে জগৎ মিথ্যা, কারণ জগতের কোন স্বীয় স্বরূপ নাই। যাহার কোন স্বীয় স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই,

শুধু প্রতীতির গোচর হয় তাহা মিথ্যা ব্যতীত কি হইতে পারে? তুমি সর্ব্বদা এই এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থের মনন কর। তোমার বুদ্ধি অদ্বৈততত্ত্বে সমারূঢ় হউক।

৭

মহর্ষি উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে কি প্রকারে এক বস্তুর বিজ্ঞান হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। যেমন এক মৃত্তিকার তত্ত্ব অবগত হইলে মৃন্ময় যাবতীয় পদার্থ জানিতে পারা যায় সেইরূপ এমন এক বস্তু আছে যাহাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে পারিলে, জগতের সমুদয় পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই বস্তুটী হইতেছে **সৎ**। 'সৎ' হইতেছে সেই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ; কারণ সেই সদ্বস্তু এক। এই এক সৎ বস্তুটী স্বগত-স্বজাতীয়-ভেদরহিত। ইহা অখণ্ড, একরস। এমন কোন পদার্থ নাই যাহা এই এক, অখণ্ড, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন সৎ বস্তুটী হইতে পৃথক্ হইয়া বিদ্যমান থাকিতে পারে; সেইহেতু ইহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদরহিত। এই স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত এক, অদ্বিতীয় সদ্বস্তুই জগতের উপাদান; উপাদান বলিয়া এই সদ্বস্তু মৃত্তিকার ন্যায় জড় নয়; ইহা স্বপ্রকাশ, চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ। এই চৈতন্যস্বরূপ সদ্বস্তু নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ। এই এক, অদ্বিতীয় সচ্চিৎ আনন্দঘন বস্তুটীই সত্য; এবং সতত পরিবর্ত্তনশীল, বিকারী 'ইদং' প্রত্যয়ের গোচর এই জগৎ মিথ্যা। 'মিথ্যা' মানে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় সত্তের অত্যন্তাভাব নয়। 'মিথ্যা' মানে নাস্তিত্ব নয়, শূন্য নয়। কারণ আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, নাস্তিত্ব, শূন্য আমাদের প্রতীতির গ্রাহ্য হয় না; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ আমাদের প্রতীতির গোচর হইতেছে।

সুতরাং এই জগতের নিশ্চয়ই প্রাতীতিক সত্তা আছে। এই যে প্রাতীতিক সত্তা ইহা আরোপিত সত্তা। সেই এক, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন নিত্য সদ্বস্তুর সত্যত্ব জগতে আরোপিত হওয়ায় জগৎকে সত্য বলিয়া আমরা অভিহিত করি। কিন্তু সচ্চিদানন্দ, এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু যেরূপ সত্য, এই জগৎ সেরূপ সত্য নয়। সংবস্তুটী নিত্য, জগৎ অনিত্য, সদ্বস্তু অপরিণামী, কিন্তু জগৎ সতত বিকারী; সদ্বস্তু চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু জগৎ জড়; সদ্বস্তু নিরতিশয় আনন্দ, কিন্তু জগৎ নিরতিশয়, নিরাবিল নিত্য আনন্দের প্রতিবন্ধক। এখন প্রশ্ন হইতেছে যদি এক অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ সদ্বস্তুই বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তদ্বিলক্ষণ এই জগৎ কি প্রকারে হইল। এই জগৎ সচ্চিদানন্দ হইতে পৃথক্ নয়; ইহা সেই সদ্বস্তুরই সংস্থান-বিশেষ। যেমন রজ্জুর অবয়ব হইতে সর্প, জলধারা, দণ্ড, মালা প্রভৃতি পদার্থ এবং তত্তদ্বিষয়িণী বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈক্ষণ বা চিৎ-শক্তি সমন্বিত সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু হইতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জগৎ ও জগৎ-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। রজ্জু যখন সর্পরূপে, জলধারারূপে, দণ্ড বা মালারূপে আমাদের জ্ঞানের গোচর হয়, তখনও যেমন রজ্জুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, যে রজ্জু সেই রজ্জুই থাকে, সেইরূপ সৃষ্টিকালেও সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুই বিদ্যমান রহিয়াছে। রজ্জুতে সর্প প্রভৃতি যেমন নাম ও রূপমাত্র, এবং উহার নিজের কোন বাস্তব সত্তা নাই; রজ্জুর সত্তাই যেমন উহার সত্তা; সেইরূপ জীব ও জগৎ কেবল নাম ও রূপমাত্র; ইহাদের নিজের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুর সত্তাই উহাদের সত্তা। জগৎ এই সদ্বস্তুর বিবর্ত্তমাত্র।

যাহা বিকারী, যাহা কার্য্য, তাহা কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নয়; সেইহেতু তাহা মিথ্যা। কার্য্য যখন কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নয়; উহা যদি কারণেরই সংস্থান বা আকারবিশেষ হয়, তাহা হইলে কার্য্য

মিথ্যা হইলে কারণও মিথ্যা হইতে পারে এরূপ মনে করা ঠিক নয়; যেহেতু কার্য্যের সত্তা হইতে কারণের সত্তা ভিন্ন; কারণ অধিক সত্তাক, আর কার্য্য ন্যূন-সত্তাক। ঘট নষ্ট হইলে মৃত্তিকা নষ্ট হয় না; কিন্তু মৃত্তিকা না থাকিলে ঘটের উৎপত্তিই অসম্ভব। কার্য্যের সত্তা সম্পূর্ণরূপে কারণের সত্তার উপর নির্ভর করে বলিয়া এবং কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন না হওয়া হেতু কারণের জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। সেইজন্য সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু বিজ্ঞাত হইলে যাবতীয় বস্তু বিজ্ঞাত হয়।

এই নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অমূর্ত্ত, চৈতন্যময় সদ্বস্তু হইতে, রজ্জুর অবয়ব হইতে সর্প, জলধারা প্রভৃতি আকারের ন্যায় নাম-রূপাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিশ্ব সেই সদ্বস্তুরই বিবর্ত্ত। সৃষ্টির অর্থই হইতেছে আধিক্য। সদ্বস্তু যখন নাম-রূপ-বিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হন তখন সেই সচ্চিৎ বস্তুকেই জীব, জগৎ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই সদ্বস্তু চিৎশক্তিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার এই চিৎশক্তি, মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা, তমঃ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই চিৎশক্তির সদ্বস্তু হইতে কোন স্বতন্ত্র পৃথক্ সত্তা নাই; সৎবস্তুই এই চিৎশক্তির স্বরূপ; সেইজন্য এই শক্তি এক, অদ্বিতীয় স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ-রহিত সদ্বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। ইহা এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু হইতে কোন পৃথক্ বস্তু নহে বলিয়া একত্বের, অদ্বৈতের কোন হানি হয় না। শ্রুতির উদ্দেশ্য শক্তির পরিণাম এই বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা নয়; এই বিশ্ব যাহার বিভূতি, যাহার উপাধি, যাহার ঐশ্বর্য্য, সেই বিশ্বাতীত নামরূপদ্বারা অসংস্পৃষ্ট, "নেতি নেতি"র অবধি, সর্ব্বপ্রকার ভেদ-রহিত, অখণ্ড, একরস সেই সদ্বস্তুর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শ্রুতির একমাত্র উদ্দেশ্য। চিৎশক্তিবিশিষ্ট সেই সদ্বস্তুই পঞ্চ-ভূতাত্মক এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া, এই বিশ্বে অনুস্যূত আছেন।

বাহিরের এই বিশাল বিশ্ব এবং অন্তরের বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও স্থূলদেহ সকলই এক শক্তির বিকার। যাহা বিকার তাহা সত্য নয়; তাহা নাম ও রূপমাত্র। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য। এই কথাটিই সুস্পষ্টরূপে বিবিধ উদাহরণ দ্বারা উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্বেতকেতুর বুদ্ধি যাহাতে এই অদ্বৈততত্ত্বে স্থির হয় সেইজন্য শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিলেন—

উদ্দালকো হ আরুণিঃ শ্বেতকেতুম্ পুত্রম্ উবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহি ইতি, যত্র এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি। স্বম্ অপীতো ভবতি, তস্মাৎ এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে। স্বং হি অপীতো ভবতি।

উদ্দালক আরুণি পুনরায় পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতে লাগিলেন—“বৎস, আমি তোমাকে অনেক বিবরণ দিয়াছি। তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছ এই জগৎ কেবল তেজ, জল এবং পৃথিবীর বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের স্থূল দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং ষোড়শ কলাযুক্ত মন যে ঐ তেজ, জল এবং পৃথিবীর বিকার তাহাও তোমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। তুমি এখন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছ যে স্থূলদেহ [illegible] এবং মন জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্নময়। মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাক্ তেজোময়ী। কিন্তু এই যে তেজ, জল ও পৃথিবীর কথা বলিলাম ইহা অবান্তর কথা। সেই এক অদ্বিতীয় [illegible] বলিবার জন্যই এত অবান্তর বিষয় আলোচনা করিয়াছি, সৃষ্টিকে, নানাকে, ভেদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শুধু এই নানাত্বময়ী বিশ্ব রচনাকে, এই পৃথক্ পৃথক্ পদার্থনিচয়কে বিশ্লেষণ করিয়া, ইহাদের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করাইয়া তোমার

বুদ্ধিকে সেই এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত অখণ্ড, একরস, নিষ্কল, নিরবয়ব, সচ্চিদানন্দঘন একমাত্র সত্য সেই সদ্বস্তুতে নিবদ্ধ করাইবার জন্য। আমার প্রিয় পুত্র, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার উপদেশ শ্রবণ কর, তাহা হইলে সেই সদ্বস্তুর অপরোক্ষানুভূতিলাভে ধন্য হইবে। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ঈক্ষণ করিয়া বিশ্বরূপে নিজেকে বিস্তার করিয়াছেন। তিনিই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথ্বী, স্থূলদেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনরূপে বিভাত হইতেছেন। তোমাকে আমি আরও বলিয়াছি এই সদ্বস্তুর ঈক্ষণ হইতেছে চিৎশক্তি, চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তি। চৈতন্যময়ী এই শক্তি বল এবং ক্রিয়াত্মিকা। বল মানে প্রাণ, ইচ্ছা। জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা এই চিন্ময়ী শক্তি অখণ্ডা, একরসা, সর্ব্বানুস্যূতা এবং সমুদয় বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই শক্তি সেই সচ্চিদানন্দঘন সদ্বস্তু হইতে অনন্যা। চিন্ময়ী এই শক্তি সচ্চিদানন্দঘন এই সদ্বস্তুর উপাধি। এই শক্তি দেশ ও কালে বিভক্ত হইয়া নিজেতেই সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই চিন্ময়ী প্রাণ শক্তিই কার্য্য ও করণরূপে, দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপে ফুটিয়া পড়িয়াছে। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন সেই সদ্বস্তু এই শক্তি ও তাহার প্রত্যেক সমষ্টি ও ব্যষ্টি পরিণামকে সত্তা ও প্রকাশ প্রদান করিয়া, প্রত্যেক নাম ও রূপকে স্বীয় সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সেইজন্য এই সদ্বস্তু সেই সেই নাম, সেই সেই রূপে অভিহিত হইয়াছেন। শক্তি ও তাহার প্রাণন, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, মনন, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধহেতু সেই এক অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর এবং তিনিই জ্ঞাতা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, ঘ্রাতা, 'আমি' প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ন। শোন বৎস শ্বেতকেতু, যেমন একই জলরাশি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দিক্

সমূহের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ উত্তর সাগর, দক্ষিণ সাগর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর নামে অভিহিত হয়; যেমন একই স্ত্রী কিংবা পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া ভার্য্যা, মাতা, ভগ্নী, জনক, স্বামী, ভ্রাতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এক, অদ্বিতীয় সদ্বস্তু চিন্ময়ী প্রাণশক্তি ও তাহার বিকারের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ সেই শক্তি ও তাহার বিকারের সহিত একীভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছেন। মন সেই সদ্বস্তুর উপাধি। এই উপাধিবিশিষ্ট হইয়া সেই এক অদ্বিতীয় আনন্দঘন সদ্বস্তুর জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তোমার সম্মুখে যদি একখানি দর্পণ রাখি তাহা হইলে সেই দর্পণ মধ্যে তুমি নিজেকে প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ করিবে, কিন্তু সেই দর্পণখানি তোমার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইলে যেমন দর্পণমধ্যস্থিত তোমার মুখ থাকে না, সেইরূপ, বৎস, মনরূপ উপাধির বিলয়ে 'জীব' সংজ্ঞা দূরীভূত হয়; তখন জীবকে 'স্বপিতি' এই নামে অভিহিত করা হয়। সেইজন্য তোমাকে বলিয়াছি যে তুমি আমার নিকট হইতে সুষুপ্তির তত্ত্ব অবগত হও। এই জীব যখন সুষুপ্ত অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে তখন লোকে তাহাকে 'স্বপিতি' এই নামে অভিহিত করে। এই নামে তাহাকে কেন অভিহিত করে জান? সেই জীব তখন সতের সহিত, এই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুর সহিত মিলিত হয়; সে তখন স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সেইজন্য তখন তাহাকে 'স্বপিতি' বলা হয়, কারণ সে তখন "স্ব" বা স্বীয় স্বরূপ সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবিরত ধাবিত হইয়া যখন পরিশ্রান্ত হয় তখন শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত জীব সুষুপ্তাবস্থায় স্ব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার শ্রম দূর করিয়া থাকে; যেমন—

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা বন্ধনমেব উপশ্রয়তে। এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে; প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।

যেমন সূত্রদ্বারা আবদ্ধ পক্ষী চারিদিকে গমন করিয়া অন্যত্র কোথাও কোন বিশ্রামস্থান দেখিতে না পাইয়া বিশ্রামের জন্য পুনরায় সেই বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে সেইরূপ হে সোম্য, মন-উপাধিযুক্ত সেই জীবাত্মাও জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় নানাবিধ বিষয় ভোগের নিমিত্ত দিকে দিকে পরিভ্রমণ করিয়া অন্যত্র কোথাও বিশ্রামস্থান প্রাপ্ত না হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণের প্রাণ সেই পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে। হে সোম্য, তুমি নিশ্চয় জানিও যে প্রাণ উপলক্ষিত সেই পরমাত্মাই মন উপাধিযুক্ত জীবের বন্ধন বা আশ্রয়।

৮

শ্বেতকেতুকে নিবিষ্টচিত্তে উপদেশ শ্রবণ করিতে দর্শন করিয়া মহর্ষি উদ্দালক আরুণি পুলকিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন—"বৎস শ্বেতকেতু, তোমাকে যে আমি সুষুপ্তির তত্ত্ব আমা হইতে অবগত হইতে বলিয়াছিলাম কেন তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। জাগ্রৎ কিংবা স্বপ্ন অবস্থার তত্ত্ব না বলিয়া তোমাকে যে সুষুপ্তির তত্ত্ব বলিয়াছি তাহার কারণ আছে। বৎস, তুমি প্রথমে দৃক্, দৃশ্য ও দর্শন, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ও জ্ঞান এই তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য কর। জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের জ্ঞান হইতে হইতেছে। এই জ্ঞান মানে কি? বিষয়ের জ্ঞান মানে হইতেছে এই যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহকে ব্যাপ্ত করিতেছে। চক্ষু ইন্দ্রিয় রূপকে, কর্ণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, জিহ্বা রস, এবং ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শকে ব্যাপ্ত করিয়া

তাহাদিগকে প্রকাশ করিতেছে, তবে সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইতেছে। তুমি বলিতে পার যে সূর্য্যই ত সব বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু বৎস, যদি আমাদের ইন্দ্রিয়গণ না থাকে তাহা হইলে সূর্য্য উদিত হইয়া সব বস্তুকে প্রকাশ করিলেও সেই সব বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের কখনই কোন জ্ঞান হইতে পারে না। সূর্য্য অস্তমিত হইলে চন্দ্র; চন্দ্র অস্তমিত হইলে তারকাসমূহ; অমানিশিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে অগ্নি এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে কেবল বাক্ বস্তু-সমূহকে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যদি আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয় না থাকে তাহা হইলে সূর্য্যই প্রকাশ পাউক, চন্দ্রই উদিত হউক, তারকাসমূহই কিরণ প্রদান করুক, অগ্নিই প্রজ্বলিত হউক, কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কেহ আমাদিগকে আহ্বান করুক, আমাদের বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞানই হইবে না। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ আমাদের ইন্দ্রিয়গণই বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু বৎস, ইন্দ্রিয়গণের এই যে প্রকাশ, এই প্রকাশ তাহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়। ইন্দ্রিয়গণ জড়, ইহাদের নিজের কোন প্রকাশ নাই; জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গণ যে জড় তাহা আমরা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা তুলনা করিয়া সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় বহির্বিষয় হইতে উপরত হয়। চক্ষু আর বাহিরের রূপরাশি দেখে না; কর্ণ আর বহির্জগতের কোন শব্দ শোনে না, নিদ্রিত পুরুষের নাসিকার নিকট চন্দন কিংবা কোন উগ্রগন্ধযুক্ত বস্তু রাখিলেও সে তাহা আঘ্রাণ করে না, না সে কোন বস্তু ভক্ষণ করে, না কোন বস্তুর স্পর্শ তাহার অনুভূত হয়। কিন্তু এই স্বপ্নাবস্থায় সেই নিদ্রিত পুরুষ ঠিক জাগ্রৎ অবস্থার মত দেখে, শোনে, আঘ্রাণ, ভক্ষণ ও স্পর্শ করিয়া থাকে। ঠিক

জাগ্রৎ অবস্থার মত সে তাহার বাহিরে নানাবিধ বস্তু প্রকাশিত দেখিতে পায়। কে তখন এই স্বপ্নাবস্থার বস্তুসমূহকে নির্ম্মাণ করে আর কেই বা তাহাদিগকে প্রকাশ করে? স্বপ্নাবস্থার এই যে প্রকাশ, এই প্রকাশ হইতেছে অন্তঃকরণের প্রকাশ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার লইয়া অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণ কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন বা চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখন দেখিতে পাইতেছ জাগ্রৎ অবস্থার ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়সমূহকে প্রকাশ করে সেই প্রকাশ ইন্দ্রিয়গণের নিজের নয়, সেই প্রকাশ 'ধার করা' প্রকাশ—ইন্দ্রিয়গণের এই প্রকাশ অন্তঃকরণের প্রকাশ, বুদ্ধির প্রকাশ, মনের প্রকাশ, চিত্তের প্রকাশ। আরও দেখ স্বপ্নাবস্থায় বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট থাকে না অথচ আমরা স্বপ্নাবস্থায় ঠিক জাগ্রৎ অবস্থার অনুরূপ জগৎ দেখিয়া থাকি। এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কেই বা স্বপ্নাবস্থার এই জগৎকে নির্ম্মাণ করিল? স্বপ্নাবস্থায় এক অন্তঃকরণ ব্যতীত, মন ব্যতীত, বুদ্ধি ব্যতীত, চিত্ত ব্যতীত অন্য কেহ নাই। সুতরাং ইহাই যুক্তিযুক্ত যে স্বপ্নাবস্থার জগৎ মনই নির্ম্মাণ করে। মন কোন্ উপাদান দিয়া স্বপ্নাবস্থার এই জগৎকে নির্ম্মাণ করে? জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা যে সমুদয় বস্তু উপলব্ধি করি, সেই সেই বস্তুসমূহের সংস্কার দ্বারাই মন এই স্বপ্নাবস্থার জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে প্রকাশ করে। এই সংস্কারসমূহ মনেতেই লীন থাকে, ইন্দ্রিয়গণও মনেতেই লীন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ মনেরই শক্তি-বিশেষ, বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য মনই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপ আকার ধারণ করে মাত্র। আর স্বপ্নাবস্থার জগৎও সূক্ষ্মরূপে মনেতেই লীন থাকে, সুতরাং মনের বাহিরে স্বপ্নাবস্থার জগৎ বিদ্যমান নাই। কিন্তু বৎস, এই যে মন বা বুদ্ধি বা চিত্ত বা অন্তঃকরণ যাহা ইন্দ্রিয়গণ এবং বিষয়সমূহকে নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই মন বা বুদ্ধি বা চিত্তের প্রকাশও তাহার স্বপ্রকাশ নয়। এ প্রকাশও তাহার 'ধার করা'

প্রকাশ ; কারণ মন বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার ইহারা জড় ; সেইজন্য ইহাদের নিজের কোন প্রকাশ বা চৈতন্য নাই, ইহারাও ইন্দ্রিয়, কেবল সাধন মাত্র। সেইজন্য ইহাদের সমষ্টিকে অন্তঃকরণ বলে। মন বা বুদ্ধি যে জড় তাহা আমরা বুঝিতে পারি যখন সুষুপ্তির সহিত জাগ্রৎ অবস্থার তুলনা করি। সুষুপ্তি অবস্থাতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার স্ব স্ব কার্য্য হইতে উপরত হয়, তাহারা প্রাণশক্তিতে যাইয়া বিলীন হয়। এই যে প্রাণশক্তি ইহা পরিচ্ছিন্না, তমঃপ্রধানা; সেইজন্য মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার তমঃ দ্বারা অভিভূত হইয়া কিছুই জানিতে পারে না। এই প্রাণশক্তিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং ইহাই আবার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দরূপেও পরিণত হইয়াছে। সুষুপ্তি অবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও মন তাহাদের বিষয়-সংস্কারের সহিত তাহাদের কারণ এই প্রাণশক্তিতে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে। সুপ্ত অবস্থা হইতে যখন মানুষ জাগিয়া উঠে তখন সে বলে "আমি এতক্ষণ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।" সুষুপ্ত অবস্থায় অন্তঃকরণ তমঃদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় বলিয়া এই তমঃকেই সে তখন বিষয় করে অর্থাৎ তমঃর আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণে তখন কেবল অজ্ঞানবৃত্তি থাকে, সেইজন্য অন্তঃকরণ বিষয় সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিতে পারে না। রজোগুণের প্রাবল্যেই বিক্ষেপর সৃষ্টি হয়; বিক্ষোপের সৃষ্টি হইলেই ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য, কার্য্য-কারণ, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব জাগিয়া ওঠে এবং তখনই মানুষ পৃথক্ পৃথক্ বিষয়সমূহকে জানিতে পারে। সুষুপ্তি অবস্থা তমঃপ্রধান বলিয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণকে আত্মলাভ করিতে দেয় না। মেঘাচ্ছন্ন অমানিশিতে যেমন গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুসমূহকে আবৃত করিয়া তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বকে লুপ্ত করিয়া দেয়, সেইরূপ বৎস, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় তমোগুণ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত,

অহঙ্কারকে আবৃত করিয়া তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বের লোপসাধন করে। তখন বিদ্যমান থাকে শুধু তমঃ-প্রধানা প্রাণশক্তি। তখন চিত্তও এই তমঃ-প্রধানা প্রাণশক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়া চিত্তে তমঃ বা অজ্ঞানের ছাপ পড়িয়া যায় এবং সেইজন্য জাগরিত হইয়া মানুষ বলিয়া থাকে "এতক্ষণ আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।" সুষুপ্তি অবস্থায় রজঃ ও স্বত্ব অভিভূত থাকে; শুধু এক অনির্ব্বাচ্য, অখণ্ড অজ্ঞানরূপা প্রাণশক্তি বিদ্যমান রহে বলিয়া নিরাবিল আনন্দের অনুভূতি চিত্তে প্রকাশ পাইতে থাকে, সেইজন্য সুপ্তপুরুষ জাগরিত হইয়া বলে "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।" সুষুপ্তি অবস্থার এই যে সুখের এবং অজ্ঞানের স্মৃতি জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের হইয়া থাকে, এই স্মৃতি কখনই সম্ভবপর হইত না যদি অজ্ঞান এবং সুখ সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভূত না হইত; কারণ অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে। অনুভূত মানে জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ হওয়া, এই জ্ঞান বৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া, বুদ্ধির সহিত চিত্তের সহিত, মনের সহিত, ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া বিষয়কে প্রকাশ্য করে; কিন্তু যখন বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ইন্দ্রিয় তাহাদের কারণ তমঃতে অর্থাৎ তমঃ-প্রধান প্রাণশক্তিতে লীন হইয়া যায়, তখন এই জ্ঞান সেই তমঃ-প্রধান প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই তমঃ-প্রধান প্রাণশক্তি বুদ্ধির, মনের, চিত্তের, অহঙ্কারের বাসনায় বাসিত থাকে বলিয়া সুপ্তোত্থিত পুরুষ পুনরায় বাসনা জালে জড়িত হইয়া পড়ে।

শোন শ্বেতকেতু, তোমাকে পূর্ব্বে যে সদ্বস্তুর কথা বলিয়াছি সেই সদ্বস্তু নাম-রূপকে অভিব্যক্ত করিয়া প্রত্যেক নাম ও রূপের সহিত অভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'ঘট আছে', 'পট আছে', 'আমি আছি', 'তুমি আছ'—এই যে 'আছে', 'আছে', এই যে অস্তিত্ব, এই যে সত্তা, এই সত্তাকে ঘট, পট, আমা তোমা হইতে কখনই পৃথক্ করিয়া জানা যায়

না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ প্রভৃতি সব পদার্থের সহিতই এই সদ্বস্ত অভেদে প্রতীত হইয়া থাকে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার সত্তা এই সদ্বস্তর সত্তার সমান কিংবা ইহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। সেইজন্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" এই সদ্বস্তর সমান কিংবা ইহা হইতে বড় কিছুই দেখা যায় না। দেশ কালও এই সদ্বস্ত হইতে ন্যূন-সত্তাক। এখন বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের কারণ তমঃ প্রধান প্রাণশক্তিতে বিলীন হইলে এই সদ্বস্ত অজ্ঞানরূপা প্রাণশক্তির সহিত অভেদে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সদ্বস্ত চিৎ ও আনন্দময়; সেইজন্য সুষুপ্তি অবস্থায় তমঃ-প্রধানা প্রাণশক্তি কেবল আনন্দময়রূপে প্রকাশ পায়, এবং চিত্ত স্বীয় কারণ তমঃ-প্রধানা প্রাণশক্তিতে পরিণত হয় বলিয়া চিত্তে আনন্দ ও অজ্ঞানের ছাপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং সেইজন্য সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হইলে চিত্ত যখন মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপে ফুটিয়া পড়ে তখনই সেই সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞান ও আনন্দের স্মৃতি হইয়া থাকে। এই সদ্বস্ত নিরপেক্ষ, নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্বানুস্যূত ও স্বপ্রকাশ। এমন কোন দেশ নাই, এমন কোন কাল নাই যেখানে, বা যখন এই স্বপ্রকাশ সদ্বস্তর প্রকাশ বা চৈতন্যরূপতার বিলোপ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ।"

মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, দেশ-কাল-জলধিতে
উঠিছে মিশিছে দেখি সদা
কিন্তু এ সত্তার কভু নাহি হেরি জন্ম লয়;
'অস্তি', 'ভাতি,' এ সত্তা সর্ব্বদা॥

এই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সদ্বস্ত জ্ঞাত অজ্ঞাত সব পদার্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সেই সব পদার্থকে প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত

অভেদে প্রতীত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়গণ এবং অন্তঃকরণ তমঃপ্রধানা প্রাণশক্তিতে বিলীন হয়, তখন এই স্বপ্রকাশ, আনন্দঘন সদ্বস্তু সেই প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। এই প্রাণশক্তি স্বপ্রকাশ আনন্দঘন সদ্বস্তুর উপাধি। এই শক্তি সদ্বস্তুতে কল্পিত হইয়া থাকে। সেইজন্য এই প্রাণশক্তি ও তাহার বিকার, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, স্থূলদেহ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির দোষ ও গুণদ্বারা এই অকল্পিত চিৎ ও আনন্দস্বরূপ সদ্বস্তু দুষ্ট হন না। এই সদ্বস্তুর প্রকাশে সমস্ত বিশ্ব এবং আমাদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, দেহ প্রকাশিত হইয়া আত্মলাভ করে; ইহারই আনন্দে, ইহারই অমৃতে, ইহারই রসে সব রসিত রহিয়াছে। এই রস, এই অমৃত, এই আনন্দ জীবসমূহ সুষুপ্তি অবস্থায় তমঃ দ্বারা অভিভূত থাকিয়া আস্বাদন করে এবং তাহাদের জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন শ্রান্তি দূর করিয়া পুনরায় সজীব হইয়া উঠে। তুমিও এই অমৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হও। যাহাতে এই অমৃতস্বরূপ রসস্বরূপ প্রকাশস্বরূপ সদ্বস্তুতে তোমার চিত্ত আরূঢ় হয় সেইজন্য তোমাকে বলি, তুমি আমার নিকট বুভুক্ষা ও পিপসার তত্ত্ব অবগত হয়।

অশনা-পিপাসে মে সোম্য বিজানীহি ইতি যত্র এতৎ পুরুষঃ
অশিশিষতি নাম, আপঃ এব তৎ অশিতং
নয়ন্তে। তৎ যথা গোনায়ঃ
অশ্বনায়ঃ, পুরুষনায়ঃ, ইতি এবং তৎ অপঃ
আচক্ষতে অশনায় ইতি।
তত্র এতৎ শুঙ্গং উৎপতিতং সোম্য বিজানীহি,
নেদং অমূলং ভবিষ্যতি ইতি।

হে সোম্য, তুমি আমার নিকট হইতে ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছার তত্ত্ব অবগত হও। পুরুষ যখন ভোজন করিতে ইচ্ছা করে তখন

তাহাকে "অশিশিষতি" এই নামে অভিহিত করা হয়। সে যখন জলপান করে তখন সেই পুরুষ কর্ত্তৃক পীত জলসমূহ ভুক্তদ্রব্যের কঠিন ভাগকে দ্রবীভূত করিয়া তাহাকে রসাদিরূপে পরিণত করে; তখন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়া থাকে। পুরুষ কর্ত্তৃক পীত জলসমূহ ভুক্ত অন্নকে দ্রবীভূত করিয়া রসাদিরূপে পরিণত করে বলিয়া জলকে 'অশনায়' নামে অভিহিত করা হয়, যেমন লোকে দেখা যায় গোসমূহকে যাহারা লইয়া যায় তাহাদিগকে গোনায়, অশ্বপালককে অশ্বনায় এবং সৈন্যগণকে পরিচালন করেন বলিয়া রাজা বা সেনাপতিকে পুরুষনায় বলা হয়। বীজ হইতে যেমন কার্য্যরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় সেইরূপ এই শরীর রূপ শুঙ্গ বা কার্য্য জন্য পদার্থ বলিয়া কখনই অমূল অর্থাৎ কারণরহিত হইতে পারে না। এইরূপে কার্য্যপরম্পরাক্রমে জগতের মূল সেই সদ্বস্তুকে উপলব্ধি করিতে প্রযত্ন কর।

৯

শ্বেতকেতু স্বীয় পিতা মহর্ষি উদ্দালক আরুণির উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আপনি যে বলিলেন আমাদের এই শরীর মূল-রহিত নয়, বটাদি বৃক্ষের অঙ্কুরের ন্যায় আমাদের শরীর যদি সমূলই হয়, তাহা হইলে শরীরের সেই মূলটী কোন্ বস্তু?" শ্বেতকেতুর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহর্ষি আরুণি পুনরায় বলিলেন—

তস্য ক্ব মূলং স্যাৎ অন্যত্র অন্নাৎ? এবমেব খলু সোম্য!

অন্নেন শুঙ্গেন আপো মূলং অন্বিচ্ছ; অদ্ভিঃ সোম্য! শুঙ্গেন তেজোমূলং অন্বিচ্ছ; তেজসা সোম্য! শুঙ্গেন সন্মূলং অন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ, সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

প্রিয় শ্বেতকেতু, আমাদের এই শরীরে মূল অর্থাৎ কারণ অন্নব্যতীত আর কি হইতে পারে? আমি পূর্ব্বেই ত্রিবৃৎ প্রকরণে তোমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, আমরা যে সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করি সেই অন্নসমূহই জীর্ণ হইয়া আমাদের, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, রুধির, মাংস, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং ভুক্ত অন্নকেই শরীরের মূল বলিয়া জানিবে। এইরূপে অন্নরূপ কার্য্য দ্বারা অন্নের মূল জলকে অবগত হইবে। জলও একটি কার্য্য বা জন্য-পদার্থ, সুতরাং জলরূপ কার্য্যদ্বারা জলের কারণ বা মূল তেজকে জানিবে। বৎস! আবার তেজকেও কার্য্য বলিয়া জানিবে, সুতরাং কার্য্যরূপ তেজেরও কারণ আছে; সেইজন্য তেজরূপ কার্য্যদ্বারা তেজের মূলকারণ সদ্বস্তুকে কারণরূপে অনুসন্ধান কর। হে সোম্য, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, যত কিছু জন্য পদার্থ বিদ্যমান আছে সবই সন্মূলক অর্থাৎ এই সদ্বস্তু হইতে উৎপন্ন, এই সদ্বস্তুতেই স্থিত এবং প্রলয়কালে এই সদ্বস্তুতেই বিলীন হইয়া থাকে। তোমাকে আবার বলিতেছি—

অথ যত্র এতৎপুরুষঃ পিপাসতি নাম;
তেজ এব তৎপীতং নয়তে;
তদ্ যথা গোনায়ঃ, অশ্বনায়ঃ, পুরুষনায় ইতি
এবং তৎ তেজ আচষ্ট উদন্যা ইতি,
তত্র এতৎ এব শুঙ্গম্ উৎপতিতম্।
সোম্য! বিজানীহি নেদম্ অমূলং ভবিষ্যতি ইতি

"অশিশিষতি", 'স্বপিতি, নামের ন্যায় পুরুষের আর একটী নাম পিপাসতি। পুরুষ যখন পান করিতে ইচ্ছা করে তখন তাহাকে "পিপাসতি" এই নামে অভিহিত, করা হয়। আমরা যে সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করি, আমাদের সেই ভুক্ত অন্ন জলদ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। জল

যদি জঠরাগ্নিদ্বারা শুষ্ক না হইত তাহা হইলে জলরাশি আমাদের দেহকে ক্লিন্ন করিয়া দ্রবীভূত করিয়া ফেলিত। সেইজন্য তেজ বা দৈহিক অগ্নি যখন আমাদের শরীরস্থ জলকে শুষ্ক করে তখন আমাদের জল পানের ইচ্ছা হয়। সেই সময় পুরুষকে "পিপাসতি" এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; এবং তেজ শরীরস্থ জলরাশিকে বা উদককে রুধির, শুক্র, প্রাণাদিরূপে পরিণত করে বলিয়া তেজকে "উদন্য" বলা হয়। যেমন যে ব্যক্তি গো-গণকে পরিচালিত করে তাহাকে "গোনায়," অশ্বগণকে যে পরিচালিত করে তাহাকে "অশ্বনায়" এবং সৈন্যগণকে যে পরিচালিত করে তাহাকে "পুরুষনায়" বলা হয়, সেইরূপ তেজ শরীরস্থ জলকে পরিচালিত করিয়া রুধিরাদিরূপে পরিণত করে বলিয়া তেজকে "উদন্য" নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের এই শরীর যেরূপ ভুক্তান্নের পরিণাম, সেইরূপ ইহা আমাদের কর্তৃক পীত জলেরও পরিণাম। সুতরাং এই দেহ কখনই অমূল হইতে পারে না অর্থাৎ ভুক্তান্ন এবং পীত জলের পরিণাম এই দেহের মূল বা কারণ আছে।

তস্য ক্ব মূলং স্যাৎ অন্যত্র অদ্ভ্যঃ ?
অদ্ভিঃ সোম্য! শুঙ্গেন
তেজোমূলং অন্বিচ্ছ, তেজসা.
সোম্য! শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ;
সন্মূলাঃ সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।
যথা নু খলু সোম্য! ইমাঃ তস্রঃ দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য
ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাৎ এব ভবতি।
অস্য সোম্য! পুরুষস্য প্রয়তো বাক্ মনসি
সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে,
প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্॥

শোন বৎস, ভুক্তান্ন ও পীত জলসমূহের পরিণাম এই দেহের মূল জল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু জলও একটী কার্য্য, সুতরাং এই কার্য্যরূপ জলেরও কারণ আছে। এই জলরূপ কার্য্যদ্বারা জলের কারণ তেজের অনুসন্ধান কর এবং তেজ-রূপ কার্য্য দ্বারা তেজের কারণ সেই সৎপদার্থের অনুসন্ধান কর। হে সোম্য, সমুদায় প্রজার মূল হইতেছে এই সৎপদার্থ। সকলেই সন্মূলক, সকলেই এই সৎপদার্থে স্থিত রহিয়াছে, এবং সৎবস্তুতেই এই সব প্রজাগণ লীন হয়। হে সোম্য, তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। হে সোম্য, পুরুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তখন তাহার বাগিন্দ্রিয় মনে লীন হয়, মন প্রাণে এবং প্রাণ যাইয়া তেজে মিলিত হয়; তেজ আবার পরদেবতা আত্মায় মিলিত হইয়া থাকে।

এখন তুমি সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ আমাদের স্থূলদেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন—সমস্তই পঞ্চভূতের কার্য্য। আমরা যাহা ভক্ষণ করি, পান করি তাহা তিনরূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। যাহা নিকৃষ্ট তাহা মলমূত্রাদি-রূপে পরিণত হয়, যাহা মধ্যমভাগ তাহা মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজ ধাতুতে পরিণত হইয়া সপ্তধাতুময় এই স্থূল শরীরকে বর্দ্ধিত করে। যে ভাগ অতিশয় সূক্ষ্ম তাহা মন, প্রাণ, বাক্ প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া সূক্ষ্ম-শরীরের পুষ্টি সাধন করে। আমাদের এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ সংঘাত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীর সমষ্টি, উহারা কার্য্য সুতরাং উহাদের কারণ আছে, সেই কারণেরও আবার কারণ আছে, এইরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে জীব ও জগতের কারণ একমাত্র সেই সদ্বস্তু। এই জগতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে তাহারা সকলেই সন্মূল্য সৎ প্রতিষ্ঠা, সদায়তনা; অর্থাৎ এই সচ্চিৎ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই জাত, তাঁহাতেই স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, আমাদের স্থূলদেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এ সবই এই সচ্চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাধি। উপাধি সেই জিনিষ যাহা বস্তুর স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু উপাধির ধর্ম্মে, উপাধির রঙে বস্তুকে গুণবিশিষ্ট করিয়া তোলে, রঙিয়ে তোলে। স্ফটিকের নিকট যদি জবা ফুল রাখ তাহা হইলে স্ফটিককে লাল দেখাইবে; কিন্তু জবাফুলের লালিমা স্ফটিকের স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। স্ফটিক সত্য সত্যই লাল হইয়া যায় না; জবাফুল সরাইয়া লইলে স্ফটিক যেরূপ স্বভাবতঃ শুভ্র, সেইরূপ শুভ্রই থাকে। লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি বর্ণের কাচপাত্রে জল রাখিলে, জলকেও লাল প্রভৃতি রঙে রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইবে। সেইরূপ আমাদের স্থূলদেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন সচ্চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাধি বলিয়া তাঁহাকেও এই সব উপাধির ধর্ম্মে রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। স্থূলত্ব, কৃশত্ব, প্রভৃতি দেহধর্ম্ম; অন্ধত্ব, বধিরত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম; ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি প্রাণধর্ম্ম। সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি চিত্তধর্ম্ম দ্বারা পরমার্থ সত্য, অভয়, অমৃত, অজর, অশোক এই সদ্বস্তুকে বিশেষিত করিয়া দেখি এবং তখনই তাহাকে "অশিশিসতি" পিপাসতি কর্ত্তা, ভোক্তা, মন্তা, দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, পাপী, পুণ্যবান, জ্ঞানী, মূর্খ, সুখী, দুঃখী—এই সব নামে অভিহিত করি। উপাধির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরই বিভিন্ননামে অভিহিত হন, বিভিন্নরূপে রূপায়িত হইয়া থাকেন। উপাধির সহিত এই যে সম্বন্ধ এই সম্বন্ধকে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ, আধ্যাসিক-সম্বন্ধ, কল্পিত-সম্বন্ধ বলা হইয়া থাকে। যখন দুইটী বিভিন্ন বস্তু অভেদে প্রতীত হয় তখন সেই সম্বন্ধকে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ আধ্যাসিক-সম্বন্ধ, কল্পিত-সম্বন্ধ বলা হয়। এখন তুমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ কেবল অবিবেক বশতঃই আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, সুখী দুঃখী বলিয়া, কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি বিবেক অবলম্বন

কর এবং মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রাণীর মূল কারণ এই এক, অখণ্ডৈকরস, অদ্বৈত সদ্বস্তুকে অবধারণ কর। তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে—কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে। যাহা কার্য্য, যাহা বিকারী, তাহা কখনই অমূল বা নিষ্কারণ হইতে পারে না। পৃথিবী বা অন্ন হইতেছে একটী কার্য্য ; ইহা বিলীন হইয়া যায় ইহার কারণ জলে ; জলও কার্য্য এবং ইহা বিলীন হইয়া যায় ইহার কারণ তেজে। তোমাকে আর অধিক কি বলিব ; এই সমুদয় ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎও একটী কার্য্য ; সুতরাং জগতেরও কারণ আছে এবং সেই কারণ হইতেছে এই সদ্বস্তু। সদ্বস্তু যদি স্ব-প্রকাশ না হয় তাহা হইলে তাহা জড় ও দৃশ্য হইয়া যায় ; কার্য্যও বিকারী হইয়া পড়ে। সেইজন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে এই মূল কারণ সদ্বস্তু চিৎস্বরূপ বা স্বপ্রকাশ। আরও একটা বিষয় তুমি নিশ্চিতরূপে মনে স্থির করিয়া রাখিবে যে অস্তিত্ব বা 'সৎ' এবং 'স্বপ্রকাশ' এর কোনই সার্থকতা থাকে না যদি না এই স্বপ্রকাশ, চিৎ-স্বভাব সদ্বস্তু আনন্দস্বরূপ না হয়। এই সচ্চিদানন্দই জগতের মূল কারণ। সেইজন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম ইতি।"

যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত হয় ; যাহাতে এই ভূতসমূহ স্থিতিলাভ করে ; যাহাতে এই ভূতসমূহ পরিণামে বিলীন হইয়া থাকে সেই বস্তুর অনুসন্ধান কর। সেই বস্তু ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ। তুমিও জগৎরূপ কার্য্যদ্বারা এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুসন্ধান কর।

শোন বৎস, মনুষ্য যখন মুমূর্ষু হয়, তখন তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার নিকট উপবেশন করিয়া বলিতে থাকে "একী ভবতি ন পশ্যতি" এই মুমূর্ষু ব্যক্তি এখন দেখিতেছে না ; "একী ভবতি ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে,

ন বদতি, ন মনুতে, ন স্পৃশতি, ন বিজানাতি," এ ব্যক্তি এখন আর আঘ্রাণ করিতেছে না, আস্বাদ করিতেছে না, কথা বলিতে পারিতেছে না, কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছে না, কিছুই জানিতে পারিতেছে না। ক্রমে ক্রমে তাহার ইন্দ্রিয়গণ মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি প্রাণে যাইয়া বিলীন হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাণ আবার এই সদ্বস্তুতে বিলীন হইয়া যায়। জানিও বৎস, 'জগৎ', 'জগৎ' বলিয়া যাহাকে অভিহিত করিতেছ তাহা এই সচ্চিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মারই বিস্তার ব্যতীত—সংস্থান ব্যতীত আর কিছুই নয়। মৃন্ময় ঘট, কলসী, সরা যেরূপ মৃত্তিকার সংস্থান ব্যতীত আর কিছুই নয়; সেইরূপ এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ, আমাদের স্থূল সূক্ষ্মদেহ এমন কি যা কিছু বিভক্ত হইতেছে তাহা সচ্চিৎ-আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঘট বলিয়া যেমন কোন বস্তু মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বিদ্যমান নাই সেইরূপ এই চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া কোন বস্তু নাই।

স যঃ এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং ;
তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।
ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি।
তথা সোম্য ইতি হোবাচ।

সেই এই যে অণু হইতেও অতি সূক্ষ্ম অণু এই সদ্বস্তু; এই সমস্ত জগৎই সচ্চিদানন্দময়। এই চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সদ্বস্তুই সত্য। 'আমি' 'আমি' বলিয়া যাহাকে লক্ষ্য করিতেছ, এই সদ্বস্তুই সেই আত্মা। 'প্রিয় শ্বেতকেতো, তুমিই সেই আত্মা,' তুমিই সচ্চিৎ-আনন্দস্বরূপ। তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, মোহ নাই, জরামৃত্যুরূপ স্থূলদেহের ধর্ম্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ প্রাণের ধর্ম্ম, শোকমোহাদি মনের ধর্ম্ম তোমাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তুমি নিজেকে কখনও ছোট

করিয়া দেখিবে না। তুমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। সচ্চিৎ-আনন্দই তোমার স্বরূপ, সতত সর্ব্বত্র 'আমিই সচ্চিৎ-আনন্দস্বরূপ' এইরূপ মনন কর, তাহা হইলে স্ব-স্বরূপ অমৃতত্বে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে।

১০

যাহাতে শ্বেতকেতুর বুদ্ধি অদ্বৈততত্ত্বে আরূঢ় হয়, সেইজন্য মহর্ষি উদ্দালক অরুণি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বাছা, শ্বেতকেতু, যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি যাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি বিষয়সমূহ কেবল নাম ও রূপ মাত্র; তাহারা বিকারী। সমুদয় জগৎ তেজ, জল ও অন্নের বিকার; আবার এই তেজ, জল, ও অন্নের মূল কারণ হইতেছে সদ্বস্তু। এই সদ্বস্তুই "সত্যস্য সত্যং"। যাহা কিছু "আছে" বলিয়া, 'সত্য' বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহারা প্রত্যেকেই এই 'সত্যস্য সত্যং সদ্বস্তুরই সত্তাতে সত্তাবান্। এই সদ্বস্তুই পরমার্থ সত্য, ইহাই অভয়প্রদ। সুষুপ্তি সময়ে এই সদ্বস্তকেই প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিগণ আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। একমাত্র এই সৎস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ বস্তুই বিভাত হইতেছে। জগৎ সচ্চিৎ-আনন্দময়। যেমন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কলসী, সরা প্রভৃতি মৃন্ময়, স্বর্ণ-নির্ম্মিত হার প্রভৃতি স্বর্ণময়; যেমন উচ্চ নীচ তরঙ্গসমূহ সলিলময়; সেইরূপ ব্যষ্টি, সমষ্টি এই বিশাল বিশ্ব সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়। এই সচ্চিদানন্দই তোমার স্বরূপ: তুমিই সচ্চিনানন্দ ব্রহ্ম।

শ্বেতকেতু স্বীয় পিতা মহর্ষি আরুণির উসদেশ শ্রবণ করিয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন—"আপনি যে বলিলেন প্রতিদিন প্রাণিগণ সুষুপ্তিসময়ে চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এই সদ্বস্তকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমারও ত' প্রতিদিন সুষুপ্তি অবস্থা হয়; কিন্তু কৈ আমি ত এই সচ্চিদানন্দকে লাভ করি না। এই সচ্চিদা-

নন্দ, যখন আমার স্বরূপ তখন সুষুপ্তি অবস্থায় স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুনরায় সেই স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হই কেন? জাগ্রৎ অবস্থায় স্বরূপের জ্ঞান আমার থাকে না কেন? আপনি অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা পুনরায় আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিন—

ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি।

তথা সোম্য ইতি হোবাচ॥

শ্বেতকেতু সুষুপ্তি অবস্থায় সচ্চিদানন্দ প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া যখন বলিলেন, "হে ভগবন্, আপনি পুনরায় আমাকে বুঝাইয়া দিন।" তখন মহর্ষি আরুণি "আচ্ছা তাহাই হউক" বলিয়া পুনরায় শ্বেতকেতুকে বলিলেন—

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি,
নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং
রসান্ সমবহারং একতাং রসং গময়ন্তি।
তে যথা তত্র
ন বিবেকং লভ্যন্তে অমুষ্য অহং
বৃক্ষস্য রসঃ অস্মি ইতি,
এবমেব খলু সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ
প্রজাঃ সতি
সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি।

বৎস, মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্প হইতে রস সংগ্রহ করিয়া সেই সেই বিভিন্ন রসসমূহকে মধুতে পরিণত করিলে, মধুরূপে অবস্থিত সেই বিভিন্ন রসসমূহের যেমন কোন পার্থক্য থাকে না অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের রস যেমন বলিতে পারে না "আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস,"

সেইরূপ বৎস প্রাণিগণ প্রতিদিন সুষুপ্তি সময়ে এই সদ্বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া জানিতে পারে না যে তাহারা সচ্চিদানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রলয়কালে এবং মৃত্যুসময়েও এইরূপই হইয়া থাকে জানিবে। প্রাণিগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংস্কার লইয়া সুষুপ্তি সময়ে এই সদ্বস্তুর সহিত মিলিত হয় বলিয়া সুষুপ্তিভঙ্গে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ দেহেতে ফিরিয়া আসে। তাই বলি বৎস—

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা, সিংহো বা, বৃকো বা, বরাহো বা,
কীটো বা, পতঙ্গো বা, দংশো বা, মশকো বা,
যৎ যৎ ভবন্তি, তদা ভবন্তি।

সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া, তাহারা সুষুপ্তি সময়ে সৎ-সম্পন্ন হয় বলিয়া সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে পুনরায় জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক সুষুপ্তি-ভঙ্গে পুনরায় নিজ নিজ যোনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু বৎস, যাহাকে ব্যাঘ্র বলিয়া, সিংহ বলিয়া, মনুষ্য বলিয়া, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথ্বী বলিয়া আমরা অভিহিত করিতেছি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এবং জ্ঞাতার প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না কেন তাহা জান? নাম ও রূপ 'অহং' রূপে এবং 'ইদং' রূপে সচ্চিদানন্দকে যেন আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। সুবর্ণকে হার বলিয়া, বলয় বলিয়া অভিহিত করিলেই কি সুবর্ণ অন্য বস্তু হইয়া যায়? হার ও বলয় শুধু নাম ও রূপ মাত্র। এই হার ও বলয়রূপ নাম ও রূপ যেমন সুবর্ণকে জানিতে দেয় না সেইরূপ বৎস, মায়াও তাহার কার্য্য নামরূপাত্মক এই জগৎ সচ্চিদানন্দকে জানিতে দেয় না। যেমন হার ও বলয় সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, হার ও বলয় যেমন সুবর্ণাত্মক, সেইরূপ—

স য় এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং।
তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি,
ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি।
তথা সোম্য ইতি হোবাচ।

"সুষুপ্তিসময়ে প্রাণিগণ যে সদ্বস্তুর সহিত মিলিত হয়, এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা হইতে ফিরিয়া আসে সেই সদ্বস্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সদ্বস্তুই একমাত্র সত্য। এই সচ্চিদানন্দ সদ্বস্তুর সত্তায় বিশ্ব সত্তাবান্ নামরূপাত্মক সমুদায় বিশ্বই সচ্চিদাত্মক। 'অহং' 'অহং' বলিয়া 'আমি' 'আমি' বলিয়া যাহাকে আমরা সর্ব্বদা অভিহিত করি সেই আত্মাও সচ্চিদানন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্বেতকেতু, তুমিও সেই সচ্চিদানন্দ।" শ্বেতকেতু স্বীয় পিতা মহর্ষি আরুণির উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি যে বলিলেন প্রাণিগণ প্রতিদিন সুষুপ্তিসময়ে সচ্চিদানন্দে মিলিত হয় এবং জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁহা হইতেই ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা জানিতে পারে না কেন? আমি যখন একগ্রাম হইতে অন্যগ্রামে গমন করি তখন ত আমি বেশ জানিতে পারি যে আমি অমুক গ্রাম হইতে আসিয়াছি, সেইরূপ সুষুপ্তিসময়ে যদি আমি সচ্চিদানন্দে মিলিত হই তাহা হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় আমি জানিতে পারি না কেন যে, আমি সচ্চিদানন্দ হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা আমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন।" শ্বেতকেতুর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি উদ্দালক আরুণি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি পুনরায় তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি; তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।" মহর্ষি আরুণি দৃষ্টান্তদ্বারা শ্বেতকেতুকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে,
পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেব অপি যন্তি সমুদ্র

এব ভবন্তি, তা যথা তত্র ন বিদুঃ 'ইয়ম্
অহম্ অস্মি,' 'ইয়ম্
অহম্ অস্মীতি। এবমেব খলু সোম্য
ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ
সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি।
ত ইহ
ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো
বা কীটো বা
পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্
যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি।

প্রিয় শ্বেতকেতু, পূর্ব্বদিক্‌স্থিত এই নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, এবং পশ্চিমদিক্‌স্থিত নদীসমূহ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীসমূহ সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; সমুদ্রের জলরাশিই মেঘাকার ধারণপূর্ব্বক পুনরায় বৃষ্টিরূপে পর্ব্বত প্রভৃতির উপর পতিত হইয়া নদীর আকার ধারণ করিয়া থাকে; পরে এই নদীসমূহ ধাবিত হইয়া যখন সমুদ্রে পতিত হয়, তখন তাহারা সমুদ্রই হইয়া যায়। তখন সেই নদীসমূহ জানিতে পারে না "আমি গঙ্গা নদী কিংবা আমি সিন্ধু নদী।" সেইরূপ, বৎস, উৎপন্ন সমুদয় প্রজা সুষুপ্তি সময়ে সদ্বস্তুতে মিলিত হইয়াও তাহাকে জানিতে পারে না এবং এই সচ্চিৎ-আনন্দঘন পরমেশ্বর হইতে আসিয়াও অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে পুনরায় জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারে না যে তাহারা এই সদ্বস্তু হইতে আসিয়াছে। এই জন্মের এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে সব কর্ম্ম ও জ্ঞানসংস্কার লইয়া তাহারা নিদ্রিত হইয়াছিল,

নিদ্রাভঙ্গের পরও সেই সেই সংস্কারাপন্ন হইয়া আপনাদিগকে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁস কিংবা মশক বলিয়াই মনে করে। এই যে স্বপ্রকাশ, আনন্দঘন সদ্বস্তু ইহাই তোমার আমার সমস্ত জগতের স্বরূপ। তাই তোমাকে বলি—

"স য এষ অণিমা, ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং,

তৎ সত্যং, স আত্মা,

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।" ভূয় এব মা

ভগবন্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি।

"তথা সোম্য" ইতি হোবাচ।

শ্বেতকেতো এই যে স্ব-প্রকাশ সদ্বস্তু ইহা অতি সূক্ষ্ম। এই যে সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাইতেছ এই সূর্য্যালোক হইতেও ইহা নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম। এই স্বপ্রকাশ সদ্বস্তুর প্রকাশেই সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে, এই যে সর্ব্বব্যাপী আকাশ দেখিতেছ এই আকাশ হইতেও এই স্বপ্রকাশ সদ্বস্তু সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল। এই আকাশও এই সদ্বস্তুতে ওতপ্রোত হইয়া থাকে, মৃন্ময় কলসী যেমন মৃত্তিকায় ওতপ্রোত হইয়া থাকে, ছোট বড় তরঙ্গগুলি যেমন জলে ওতপ্রোত হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ এই বিশাল বিশ্ব এই নির্ম্মল স্ব-প্রকাশ সদ্বস্তুতেই ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সমুদয় পদার্থকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছ তাহারা সকলেই সচ্চিদানন্দময়; তাহাদের কোন বাস্তব সত্তা নাই; এই সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া তাহারা বর্ত্তমান নাই, সদ্বস্তুর সত্তাতেই তাহারা সত্তাবান্, সদ্বস্তুর প্রকাশেই তাহারা সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সদ্বস্তুই একমাত্র সত্য; ইহাই সকলের স্বরূপ; ইহাই প্রকৃত "আমি"; ইহাই তোমার আমার সকলের আত্মা। তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ।

শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "পিতঃ, আপনি যে বলিলেন ছোট বড় তরঙ্গগুলি যেমন জলে ওতপ্রোত হইয়া আছে সেইরূপ জগতও সেই সদ্বস্তুতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে, ইহা আমি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি নাই। জলে যে সব ছোট বড় তরঙ্গ বুদ্বুদ্ প্রভৃতি উত্থিত হয় তাহারা ত দেখিতে পাই জল হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় জলকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু আপনি বলিলেন জীবগণ অহরহঃ সুষুপ্তি সময়ে এই সদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কৈ তাহারা ত এই সদ্বস্তুর সহিত সুষুপ্তি সময়ে মিলিত হইয়াও বিনষ্ট হয় না; তাহারা ত সুষুপ্তি হইতে আবার পূর্ব্ব দেহ মন লইয়া জাগিয়া উঠে। সুতরাং আপনি পুনরায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিন।" মহর্ষি আরুণি পুত্রের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বৎস, আমি পুনরায় তোমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। প্রজাগণ প্রত্যহ সুষুপ্তি সময়ে এই সদ্বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াও কেন বিনষ্ট হয় না! শোন বৎস—

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলে
অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ,
যো মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ
যঃ অগ্রে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্
স্রবেৎ, স এষ জীবেন আত্মনা
অনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো
মোদমানঃ তিষ্ঠতি।
অস্য যৎ একাং শাখাং জীবো জহাতি অথ সা
শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাতি অথ সা
শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাতি

অথ সা শুষ্যতি, সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যতি।
এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধি ইতি
হোবাচ, জীবাপেতং বাব
কিল ইদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে ইতি।
স য এষঃ অণিমা
ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং,
স আত্মা ; তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো
ইতি। ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি,
তথা সোম্য ইতিহোবাচ।

এই যে বিশাল বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহার মূলে যদি তুমি কুঠারদ্বারা আঘাত কর তাহা হইলে বৃক্ষটী বিনষ্ট হইবে না, কেবল উহা হইতে রস নির্গত হইবে মাত্র, যদি মধ্যভাগে কিংবা অগ্রভাগে আঘাত কর তাহা হইলেও বৃক্ষটী মরিয়া যাইবে না, কেবল আঘাত-প্রাপ্ত স্থান হইতে রস নির্গত হইবে। কিন্তু বৃক্ষটী জীবদ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় স্বীয় শিকড়দ্বারা মাটী হইতে জল ও রস সংগ্রহ করিয়া এবং পত্রসমূহদ্বারা বায়ু হইতে স্বীয় দেহের পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া বিদ্যমান থাকিবে।

এই বৃক্ষের একটী শাখা যদি জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সেই শাখাটী শুষ্ক হইয়া যাইবে, জীব যদি দ্বিতীয় শাখাটী পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সে শাখাটীও শুষ্ক হইয়া যাইবে ; জীব যদি সমস্ত বৃক্ষটীকে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সমস্ত বৃক্ষটী শুষ্ক হইয়া যাইবে। সেইরূপ, বৎস, জীব-রহিত হইয়া এই দেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। তুমি সর্ব্বদা এই এক অদ্বিতীয় নির্ম্মল আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম স্ব-প্রকাশ, আনন্দস্বরূপ এই সদ্বস্তুতে স্বীয় চিত্তকে একাগ্র কর।"

মহর্ষি উদ্দালক আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন—"বৎস, এখন তুমি বুঝিতে পারিলে জীব প্রতিদিন স্বীয় স্বরূপ এই স্ব-প্রকাশ সদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়াও কেন বিনষ্ট হয় না। আমি পূর্ব্বে তোমাকে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছি যে জীবগণ সুষুপ্তি অবস্থায় স্ব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়াও জানিতে পারে না যে তাহারা স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ। সমুদ্রজল সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, পরে সেই মেঘ বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হইয়া নদীসমূহের সৃষ্টি করে। এই নদীসমূহ পুনরায় ধাবিত হইয়া যখন সমুদ্রে পতিত হয়, তখন তাহারা জানিতে পারে না যে তাহারা সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রই হইয়া গিয়াছে; নানাবিধ পুষ্প হইতে রস সংগ্রহ করিয়া মধুমক্ষিকা যখন সেই বিভিন্ন রসসমূহকে এক মধুতে পরিণত করে তখন সেই বিভিন্ন রসসমূহ জানিতে পারে না যে তাহারা মধু হইয়াছে এবং মধুই তাদের স্বরূপ; সেইরূপ বৎস, জীবগণ সুষুপ্তি অবস্থায় জানিতে পারে না যে তাহারা স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমাকে আরও বলিয়াছি যে জীবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহাদি বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু জীবগণ বিনষ্ট হয় না। সমুদ্রে যে ছোট বড় তরঙ্গ উত্থিত হয় সেই তরঙ্গসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব আকার পরিত্যাগ করে মাত্র কিন্তু সেই তরঙ্গগুলির অন্য তরঙ্গাকারে পরিণত হইবার উন্মুখতা থাকিয়া যায়। সেইরূপ মৃত্যুসময়ে জীবকর্ত্তৃক স্থূলদেহ পরিত্যক্ত হইলেও, স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলেও, অন্য স্থূলদেহ ধারণ করিবার উন্মুখতা জীবের থাকিয়া যায়। সদ্য-প্রসূত শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি, তাহার হাসি ও কান্না প্রভৃতি দর্শনে প্রতীত হয় যে শিশুর উক্ত প্রবৃত্তি তাহার জন্মান্তরের অনুভূত স্তন্যপান ও সুখদুঃখের স্মৃতিবশতঃই হইয়া থাকে। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত পুরুষও তাহার অসমাপ্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেইজন্য কি মৃত্যু সময়ে, কি সুষুপ্তি অবস্থায়, কি প্রলয়কালে জীব মরে না। জীবের অতীত ও বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার

তাহাকে বাসনা-বাসিত করিয়া রাখে বলিয়া সে মৃত্যুসময়ে কিংবা সুষুপ্তিকালে স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়াও জ্ঞানতঃ স্ব-স্বরূপকে জানিতে পারে না এবং জ্ঞানতঃ স্ব-স্বরূপ নিত্য, সচ্চিৎ সুখাত্মক এই নির্ব্বিশেষ সদ্বস্তুকে জানিতে পারে না বলিয়াই অহংতা ও মমতাভিমানে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। এইজন্য মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন **"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"** একমাত্র স্বীয় স্বরূপ নির্ব্বিশেষ, নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ, স্ব-প্রকাশ এই সদ্বস্তুকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; জন্মমৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার আর অন্য উপায় নাই। নামরূপাত্মক এই বিশাল জগৎ আকাশ হইতেও নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম এই সদ্বস্তু হইতেই জাত হইয়া এই সদ্বস্তুতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রলয়ে ইহাতেই লীন হইয়া থাকে। সেই যে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সদ্বস্তু, সে সদ্বস্তুই তোমার, আমার, সমস্ত জগতের স্বরূপ; সমস্ত জগৎ সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়; যাহা কিছু বিভাত হইতেছে তৎসমস্তই সচ্চিদানন্দ। বৎস শ্বেতকেতু, তুমি তাহাই; তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ।"

পিতার উপদেশ শ্রবণে শ্বেতকেতু বিনীতভাবে স্বীয় পিতা মহর্ষি আরুণিকে বলিলেন—"পিতঃ, দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে কি প্রকারে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে? এই বিশাল জগৎ বহু নাম ও বহু রূপ-বিশিষ্ট, আর সেই সদ্বস্তু নামরূপ-বিরহিত; সেই সদ্বস্তু সূক্ষ্ম আর এই জগৎ স্থূল। সেই সদ্বস্তু নিত্য ও স্ব-প্রকাশ; আর এই জগৎ সতত পরিণামশীল এবং পর-প্রকাশ্য; সুতরাং নামরূপবিশিষ্ট এই অত্যন্ত স্থূল জগৎ, নামরূপরহিত সেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম সত্যস্বরূপ সদ্বস্তু হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনরায় আমাকে বুঝাইয়া দিন।"

শ্বেতকেতুর প্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি আরুণি বলিলেন—"বৎস, আমি

অপরাবিদ্যাবিষয়ক তত্ত্বসমূহ লাভ করা দুর্লভ তখন পরাবিদ্যাবিষয়ক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মনকে কি প্রকার সমাহিত করা প্রয়োজন তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। মন বাহ্যবিষয়ে আসক্ত থাকিলে, বহির্মুখ হইয়া সর্ব্বদা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের প্রতি ধাবিত হইতে থাকিলে পরাবিদ্যা অর্জ্জন করা সুদূর পরাহত। তোমাকে আমি এতদিন ধরিয়া যুক্তি, শ্রুতি ও অনুভূতির সাহায্যে যে তত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তোমার যদি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকে, যদি তুমি অনন্যচিত্ত না হও, তাহা হইলে এই অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা যে শুধু আমার অনুভূত সত্য তাহা নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণও এই সত্য অনুভব করিয়াছেন; শ্রুতিও এই সত্য প্রতিপাদন করেন এবং যুক্তিও এই সত্য সমর্থন করিয়া থাকে। তাই তোমাকে বলি, তুমি আমার বাক্যের উপর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হও। আমার বাক্যের উপর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন না হইলে আমার উপদেশ তোমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইবে না। এই সূক্ষ্ম বটবীজকণাটির মধ্যে তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু বৎস, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, এই সূক্ষ্ম বটবীজ কণাটির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে বহু শাখা-পল্লব ফলসমন্বিত বিশাল একটি বট বৃক্ষ। সেইরূপ এই বিশাল জগৎ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে নিত্য, স্বপ্রকাশ, সুখাত্মক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এই সদ্বস্তুতে। সর্ব্বদা মনে রাখিও—

সঃ য এষঃ অণিমা, ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং।
তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো ইতি।
ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি।
তথা সোম্য ইতি হোবাচ।

সেই যে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সদ্বস্তু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সব তন্ময়। এই নিত্য অপরিণামী সৎ-চিৎ-সুখাত্মক বস্তুই একমাত্র সত্য। এই বিশাল

জগৎ সচ্চিদানন্দময়। সুবর্ণ-নির্ম্মিত হার যেমন স্বর্ণময়, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কলসী যেরূপ মৃন্ময়, ফেন বুদ্বুদতরঙ্গ যেরূপ জলময়, সেইরূপ বৎস এই বিশাল জগৎ সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ব্যতীত এই জগতের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। মহর্ষিগণ সেইজন্য বলিয়া থাকেন—

ব্রহ্মৈবেদং অমৃতং। পুরস্তাৎ ব্রহ্ম, পশ্চাৎ ব্রহ্ম,
দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ, অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং,
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং ইদং বরিষ্ঠম্।

এই নির্ব্বিশেষ সদ্বস্তু, এই ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর অমৃতস্বরূপ। তিলে তৈলের ন্যায়, দধিতে ঘৃতের ন্যায়, সেই অমৃত সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। যাহা কিছু বিভাত হইতেছে তাহা আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরই। সম্মুখে পরমেশ্বর, পশ্চাতে পরমেশ্বর, দক্ষিণে, উত্তরে, অধঃ উর্দ্ধে, সতত সর্ব্বত্র সেই পরমেশ্বরই বিরাজ করিতেছেন। এই যে বিশাল বিশ্ব ইহা পরমেশ্বরই। প্রিয় শ্বেতকেতু, এই অমৃতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ সদ্বস্তুই একমাত্র সত্য। এই সদ্বস্তুই আত্মা। এই সদ্বস্তুব্যতীত অন্য কোন দ্রষ্টা নাই, অন্য কোন শ্রোতা নাই, অন্য কোন বিজ্ঞাতা নাই, অন্য কোন ভোক্তা নাই। এই সদ্বস্তুই তোমার, আমার সকলের আত্মা। ইহা হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা নাই। বৎস, তুমিই সেই আত্মা, তুমিই সচ্চিদানন্দ।

মহর্ষি আরুণির উপদেশ শ্রবণে শ্বেতকেতু পুনরায় বলিলেন— পিতঃ, যাহা আমরা দেখিতে পাই, শুনিতে পাই, আঘ্রাণ করিতে পারি, স্পর্শ করিতে পারি তাহার অস্তিত্বসম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত হয় না। কিন্তু এই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর যাঁহাকে আপনি একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি না, সুতরাং, প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত যে বস্তু তাহার অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? আপনি

কৃপা পূর্ব্বক পুনরায় আমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝাইয়া দিন। শ্বেতকেতুর প্রার্থনা শুনিয়া মহর্ষি আরুণি বলিলেন—"বৎস, তাহাই হইবে, আমি পুনরায় তোমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ঐ যে আকাশে ছোট ছোট তারা দেখিতেছ উহারা আমাদের পৃথিবী হইতেও বড়। কিন্তু তুমি চক্ষুদ্বারা উহাদিগকে কত ক্ষুদ্র দেখিতেছ; আরও দূরে যে সমস্ত নক্ষত্র রহিয়াছে তাহাদিগকে তুমি চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাও না, তাই বলিয়া কি তাহারা নাই? তোমার শরীরে কত কীট রহিয়াছে তাহা তুমি দেখিতে পাও না। ইন্দ্রিয়গণের শক্তি সীমাবদ্ধ; তাহাদের শক্তিকে যদি বৰ্দ্ধিতও কর তাহা হইলেও তাহাদের বাহিরে পদার্থ থাকিতে পারে যাহার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গণ কিছুই জানিতে পারে না। তোমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছি—

লবণং এতৎ উদকে অবধায় অথ মা প্রাতঃ উপসীদথা ইতি। স হ তথা চকার। তং হোবাচ—যৎ দোষা লবণং উদকে অবাধাঃ অঙ্গ, তৎ আহর ইতি। তৎ হ অবমৃশ্য ন বিবেদ।

"তুমি এই লবণখণ্ডকে জলপূর্ণ একটি পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখ; পরে আগামীকল্য প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।" শ্বেতকেতু পিতার আদেশমত কার্য্য করিয়া পরদিন প্রত্যূষে পিতার নিকট উপস্থিত হইলে মহর্ষি আরুণি বলিলেন—"বৎস, তুমি জলপূর্ণ পাত্রে যে লবণখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা লইয়া আইস।" শ্বেতকেতু লবণখণ্ড আহরণ করিবার জন্য পাত্রস্থ জল পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে জলে লবণখণ্ড রহিয়াছে। তখন শ্বেতকেতু তাহার পিতাকে বলিলেন—পিতঃ জলমধ্যে সেই লবণখণ্ডকে ত দেখিতে কিংবা স্পর্শ করিতে পারিতেছি না।" শ্বেতকেতুর উত্তর শ্রবণে মহর্ষি আরুণি বলিলেন—"প্রিয় পুত্র, পাত্রস্থ জলমধ্যে নিক্ষেপ

করিবার পূর্ব্বে সেই লবণখণ্ড বিদ্যমান ছিল; তুমি তাহাকে দেখিয়াছ এবং স্পর্শ করিয়াছ কিন্তু জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত সেই লবণখণ্ডকে তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না, স্পর্শ করিতে পারিতেছ না, তাহা হইলে তামার মতে সেই লবণখণ্ড অস্তিত্ব-হীনই বলিতে হইবে। কিন্তু সেই লবণখণ্ড ঐ জলমধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি জলমধ্যে সেই ল-বণখণ্ডের অস্তিত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে—

যথা বিলীনঃ এব অঙ্গ অস্য অন্তাৎ আচাম ইতি। কথম্ ইতি? লবণম্ ইতি। মধ্যাৎ আচাম ইতি। কথম্ ইতি? লবণম্ ইতি। অন্তাৎ আচাম ইতি। কথম্ ইতি? লবণম্ ইতি। অভিপ্রাস্য এতৎ অথ মা উপসীদথা ইতি। তৎ হ তথা চকার। তৎ শশ্বৎ সংবর্ত্ততে তং হোবাচ অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে অত্রৈব কিল ইতি। ...তে।

এই জলের উপরিভাগ হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া সেই...র। "শ্বেতকেতু সেইরূপ করিলে তাহাকে মহর্ষি আরুণি জিজ্ঞাসা ক...রলেন "জলের স্বাদ কিরূপ অনুভব করিলে?" পুত্র বলিল—লবণ-স্বাদ অনুভব করিলাম। পিতা বলিলেন—"ঐ জলের মধ্যভাগ হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পান কর।" পুত্রও সেইরূপ করিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জলের স্বাদ কিরূপ?" পুত্র বলিল—"জলের স্বাদ লবণাক্ত।" মহর্ষি পুনরায় শ্বেতকেতুকে বলিলেন—"ঐ জলের নিম্নভাগ হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পান কর।" পুত্র সেইরূপ, করিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জলের স্বাদ কিরূপ অনুভব করিলে?" পুত্র বলিল—"জলের স্বাদ লবণাক্ত।" মহর্ষি আরুণি তখন শ্বেতকেতুকে বলিলেন—"বৎস তুমি ঐ জল দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুখ ধুইয়া আমার নিকট আইস।" শ্বেতকেতু মুখ ধুইয়া এই কথা বলিতে বলিতে পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত

হইলেন—"আমি রাত্রিতে যে লবণখণ্ড পাত্রস্থ জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম উহা ঐ জলমধ্যেই সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।" শ্বেতকেতুর উক্তপ্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া মহর্ষি আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন—বৎস, ঠিক এইরূপই সেই নিত্য, স্বপ্রকাশ, সদ্বস্তু ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ না হইলেও, বটবীজাণুর মধ্যে বটবৃক্ষের ন্যায়। জলে অবস্থিত লবণখণ্ডের ন্যায়, তেজ জল ও অন্নের পরিণাম এই দেহেই সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। জলমধ্যস্থিত লবণখণ্ডকে চক্ষু ও স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও তাহাকে যেমন জিহ্বাদ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছ সেইরূপ এই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে, জগৎকারণ এই সদ্বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও অন্য উপায়ে ইহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। সর্ব্বদা স্মরণ

স য এষোঽণিমা এতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং।
তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো
ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি।
তথা সোম্য ইতি হোবাচ।

সেই এই সদ্বস্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সমুদয় জগৎ সদাত্মক। সেই সৎ পদার্থই একমাত্র সত্য। তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমি তিনিই।

স্বীয় পিতা মহর্ষি আরুণির উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন—"পিতঃ, সেই নিত্য, স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ সদ্বস্তুই যখন আত্মা, তখন আমার যথার্থ স্বরূপ, আমার প্রকৃত "আমি" বা আত্মাকে যতক্ষণ না উপলব্ধি করিতে পারিতেছি ততক্ষণ ত আমার জীবন কৃতকৃত্য হইতেছে না। অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন আমি কোন্ উপায়ে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ধন্য

হইতে পারি ?" শ্বেতকেতুর প্রার্থনা শ্রবণে মহর্ষি বলিলেন—"বৎস, তাহাই হইবে।"

মহর্ষি আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস শ্বেতকেতু, তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাত্মক এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল। ইহাও তোমাকে বলিয়াছি যে সেই সদ্বস্তুর ঈক্ষণই সৃষ্টির কারণ। সেই সদ্বস্তুর ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রেই জীব-জগৎ-ঈশ্বররূপ সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন শুদ্ধ রজ্জুতে দৃষ্টিভঙ্গীবশতঃ সর্প, জলধারা, মালা, দণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপ প্রতীত হয়, যেমন নির্ম্মল স্বুবর্ণে দৃষ্টির ভিন্নতা অনুসারে হার, বলয়, অঙ্গুরী দৃষ্টিগোচর হয়, নির্ম্মল সূর্য্যকিরণে যেমন জল দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইরূপ বৎস সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুর ঈক্ষণ বা দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ জীব-জগৎ ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছে। সেই সদ্বস্তুর ঈক্ষণ হইতেছে জ্ঞানশক্তি বা চৈতন্য—উদ্ভাসিত শক্তি। এই সম্বিদ্ বা চিৎ-শক্তি সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সদ্বস্তুর উপাধি। এই চিৎ-শক্তিরূপ উপাধিবশতঃ সেই অখণ্ড, একরস, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত, সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন বস্তুই নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মনে করেন এবং বহু হইয়া প্রকটিত হইবার অভিলাষ হয়। সেই সৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে যেন এই শক্তি আবরিত করে। অন্ধকার যেমন কক্ষকে আশ্রয় করিয়া সেই কক্ষকেই আবরিত করে সেইরূপ এই শক্তি চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সেই সদ্বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তাহাকেই আবরিত করিয়া ফেলে। কিন্তু তাহাকে পরমার্থতঃ আবৃত করিতে পারে না। মেঘ যেমন সূর্য্যকে আবরিত করিতে পারে না শুধু দর্শকের দৃষ্টি ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া সতত প্রকাশশীল সূর্য্যকে দর্শককে দেখিতে দেয় না, সেইরূপ এই শক্তি আমাদের সম্যক্‌দৃষ্টি ও স্বরূপের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া

আমরা স্বীয় স্বরূপ দেখিতে পাই না। আমাদের চক্ষুকে যেন এক আবরণ আসিয়া ঢাকিয়া ফেলে।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যঃ অভিনদ্ধাক্ষং আনীয় তং,
ততঃ অতিজনে বিসৃজেৎ, স যথা তত্র প্রাঙ্ বা উদঙ্ বা অধরাং বা,
প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীত—অভিনদ্ধাক্ষ আনীতঃ অভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ ॥

হে সোম্য, কোন পুরুষকে চক্ষু বাঁধিয়া গান্ধার দেশ হইতে আনিয়া বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ করিলে সে যেমন পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, দক্ষিণমুখ কিংবা পশ্চিমমুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে—আমি বদ্ধ-চক্ষু অবস্থায় এখানে আনীত হইয়াছি এবং এই অবস্থাতেই এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি গন্তব্যস্থান নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াছি। সেইরূপ বৎস, আমাদের সম্যক্‌দৃষ্টিতে আসিয়া পড়িয়াছে একটা আবরণ, একটা মোহ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, শীতউষ্ম, রাগদ্বেষ প্রভৃতি বহুবিধ দ্বন্দ্বভাববিশিষ্ট, তেজ, জল ও অন্নের বিকার, বাত-পিত্ত-কফ-মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র-কৃমি-মূত্র-পুরীষযুক্ত এই দেহরূপ অরণ্যে আমরা পরিত্যক্ত হইয়াছি। বিজন অরণ্যে পরিত্যক্ত বদ্ধচক্ষু সেই পুরুষের ন্যায় আমরাও চীৎকার করিতেছি—আমি রাম, আমি শ্যাম, আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের পিতা, আমি অমুকের স্বামী, এই গৃহ, ঐ অর্থ, এই সব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আমার, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি ধনী, আমি নির্ধন, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধার্ম্মিক, আমি পাপী, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহী, আমি বাণপ্রস্থী, আমি সন্ন্যাসী, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি বালক, আমি যুবা, আমি প্রৌঢ়, আমি বৃদ্ধ, আমি ব্যাধিগ্রস্ত, আমি স্বাস্থ্যবান্, আমি নারী, আমি পুরুষ। আমার অর্থ হইয়াছে, আমার

ধন নষ্ট হইল, আমার স্ত্রী মরিয়াছে, আমার সন্তান মরিল, আমি কিপ্রকারে বাঁচিয়া থাকিব? আমার টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে, কি করিয়া আমি আমার স্ত্রীকে, পুত্রকে, আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করিব, আমি অতি নিষ্ঠাবান্, আমি অনাচারী, আমি কাহার নিকট পরিগ্রহ করি না, আমি ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করি। আমি দুর্ব্বল, আমার কেহ নাই, কে আমাকে সাহায্য করিবে? আমি বিপদ্‌গ্রস্ত, কে আমাকে রক্ষা করিবে? এইরূপে সহস্র সহস্র অনর্থজালে জড়িত হইয়া আমরা চীৎকার করিতেছি। আমাদের এই যে চীৎকার ইহার মূলে রহিয়াছে সম্যক্‌দৃষ্টির অভাব। মোহ বা ভ্রান্তজ্ঞানরূপ বসনে আমাদের চক্ষু আবৃত থাকায় আমরা আমাদের লক্ষ্য স্থির করিতে পারিতেছি না। বৎস শ্বেতকেতু,

তস্য যথা অভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াৎ এতাং দিশং গন্ধারাঃ
এতাং দিশং ব্রজ ইতি। স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী,
গন্ধারান্ এব উপসম্পদ্যেত, এবমেব ইহ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।
তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে ইতি।

বনমধ্যে পরিত্যক্ত বদ্ধ-চক্ষু ব্যক্তি পথহারা হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলে কোন দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তি তাহার চীৎকার শ্রবণে তাহার চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাকে বলেন "এই দিকের উত্তরে গান্ধার দেশ। তুমি এই দিকে গমন কর। তখন যেমন সেই মেধাবী পণ্ডিত ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া গান্ধার দেশ প্রাপ্ত হয়, ঠিক্ সেইরূপ আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য-

লাভের সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব যতক্ষণ না কর্ম্মপাশ হইতে তিনি মুক্ত হন; কর্ম্মক্ষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন।

বাক্যের অর্থজ্ঞান বিষয়ে যদ্যপি বাক্যই উপায় তাহা হইলেও শাস্ত্র-উপদিষ্ট মহাবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশ ব্যতীত অনুভব করিতে পারা যায় না। বহুলোক আছেন যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের মুখ-নিঃসৃত মহাবাক্য শ্রবণমাত্রেই সেই মহাবাক্য প্রতিপাদিত সত্যকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন না। তখন আচার্য্য তাঁহাদিগকে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিদ্বারা সদ্বস্তুসম্বন্ধে যত কিছু সংশয় থাকে তাহা দূর করিয়া দেন। সেইজন্য তোমাকে বলিয়াছি 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন বস্তুকে আত্মরূপে অনুভব করিয়া স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, সংসারচক্রে আর আবর্ত্তিত হন না। এইজন্য মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে বিষয়ে আসক্তি দূরীভূত হয়, চিৎ-জড়বন্ধন ছিন্ন হয়, পরমেশ্বর সম্বন্ধে সমুদয় সংশয় দূর হইয়া যায় এবং তাহার সঞ্চিত ক্রিয়মান প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, যিনি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে আত্মরূপে অনুভব করিয়াছেন তাঁহার শরীরে অভিমান না থাকা হেতু তাঁহার পক্ষে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি তখন অশরীর হন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান, ভোক্তৃত্বাভিমান থাকে না বলিয়া তাহার পক্ষে কোন কর্ম্মই ফলদায়ক হইতে পারে না। যাঁহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়, যাঁহারা শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন নাই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে আত্মসাক্ষাৎকারের পর

প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিয়া যায়। কিন্তু বৎস শ্বেতকেতু তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে তত্ত্বজ্ঞানীর কোন কর্ম্মই থাকে না; কারণ, বাসনা ক্ষয় হওয়া হেতু তাঁহার মন অমন হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ বলেন—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
তদ্ যথাহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতে প্রত্যস্তা শয়ীত
এবমেব ইদং শরীরং শেতে।

মুমুক্ষুব্যক্তি ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানপ্রভাবে যখন হৃদয়স্থিত সর্ব্ববিধ বাসনা হইতে বিমুক্ত হন, তখন তিনি এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করেন। যেরূপ সাপের খোলস উইস্তুপের উপর জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে সেই খোলসকে সর্প যেমন উপেক্ষা করে সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী আত্মদর্শীর শরীরে আত্মাভিমান থাকে না; সুতরাং 'তাঁহার পক্ষে তাঁহার শরীর' বলিয়া কোন বিশেষ শরীর না থাকায় তাঁহার পক্ষে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা মনে রাখিও বৎস যে, কর্ম্ম বা দেহ কখনই বন্ধের কারণ নয়। কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান এবং দেহে আত্মাভিমানই বন্ধের কারণ। অভিমান ভ্রান্তজ্ঞানপ্রসূত আর তত্ত্বজ্ঞানীর আচার্য্যের উপদেশে ভ্রান্তজ্ঞান দূর হইয়া যায় বলিয়া ভ্রান্তজ্ঞান বা অজ্ঞানের কার্য্যও তাঁহার নিকট থাকে না। বৎস শ্বেতকেতু, তুমি আত্মবিত্তারসিক হইয়া সর্ব্ববিধ আর্ত্তি সর্ব্ববিধ ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হও।

স য এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং,
স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।" ভূয় এব মা ভগবান্
বিজ্ঞপয়তু ইতি। তথা সোম্য ইতি হোবচ।

এই যে সেই আত্মা ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিবিড় ধ্যানদ্বারা এই আত্মতত্ত্ব অবগত হও। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত কিছু সবই

আত্মময়। তিনিই সত্য, তিনিই সকলের আত্মা। হে শ্বেতকেতু, "তিনি তুমিই।" স্বীয় পিতা মহর্ষি আরুণির উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু বিনীতভাবে বলিলেন—"পিতঃ, ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় তাহা আমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা পুনরায় বুঝাইয়া দিন।" শ্বেতকেতুর প্রার্থনা শ্রবণে মহর্ষি অরুণি বলিলেন—"প্রিয় পুত্র, আমি পুনরায় তোমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।"

মহর্ষি অরুণি বলিলেন—

পুরুষং সোম্য উভ উপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে—
জানাসি মাং জানাসি মাং ইতি, তস্য যাবৎ ন বাক্
মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি,
তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং, তাবৎ জানাতি।
অথ যদা অস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে,
প্রাণঃ তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং অথ ন জানাতি।
স য এষঃ অণিমা, ঐতদাত্ম্যং ইদঃ সর্ব্বং তৎ সত্যং,
স আত্মা, তত্ত্বমসি; শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্
বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্য ইতি হোবাচ।

বৎস শ্বেতকেতু, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি কি প্রকারে এই স্বপ্রকাশ আনন্দময় সদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হন, সেই ক্রম বা প্রণালী তোমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি অবহিত হও। হে সোম্য জরাদি ব্যাধিগ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া তাহার জ্ঞাতিগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—আমাকে জান? আমাকে জান? যতক্ষণ সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্ মনেতে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ ও পরাদেবতাতে মিলিত না হয়, ততক্ষণ সে জানিতে পারে। অনন্তর যখন তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে,

প্রাণ তেজে এবং তেজ পরাদেবতায় মিলিত হয়, তখন আর সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি জ্ঞাতিগণকে চিনিতে পারে না।

এই সব জগৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেই সদ্বস্তুময়। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমি তিনিই।" শ্বেতকেতু বলিলেন—"ভগবান্, পুনরায় আমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিন।" পিতা বলিলেন—"হে সোম্য, তথাস্তু।"

শ্বেতকেতুর স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার আগ্রহদর্শনে প্রীত হইয়া মহর্ষি আরুণি বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়পুত্র, তোমাকে মরণক্রম বলিয়াছি। প্রত্যেক মানুষের তিনটী অবস্থা হইয়া থাকে। সেই তিনটী অবস্থা হইতেছে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি! মানুষের যত কিছু জ্ঞান, মানুষের যা কিছু কর্ম্ম, মানুষের সমুদয় জগৎ এই তিন অবস্থার অন্তর্গত। এই তিন অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে, তুমি ইহলোক, পরলোক, বন্ধন ও মুক্তি, জন্ম ও মৃত্যু বুঝিতে পারিবে। এই তিন অবস্থার বিশ্লেষণ দ্বারা তুমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে—তুমি কে, তোমার যথার্থস্বরূপ কি। এই যে আমাদের সকলেরই 'আমি' 'আমি' এইরূপ জ্ঞান হইতেছে। এই "আমি"র অনুসরণ করিয়া গমন করিলে তোমার স্বরূপ সেই সদ্বস্তুকে লাভ করিতে পারিবে। এখন এস বৎস, আমরা আমাদের জাগ্রৎ অবস্থাটীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। জাগ্রৎ অবস্থায় তুমি ভাবিতেছ তুমি শ্বেতকেতু; তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি যুবক, তোমার পিতা উদ্দালক আরুণি, তুমি বেদজ্ঞ। এই স্থূলশরীর তোমার; চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তোমার। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, প্রাণের এই পাঁচটী কার্য্যও তোমার। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইহারাও তোমার। এখন বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ যাহা তোমার তাহা কিন্তু তুমি নয়। তোমার পুস্তক, কিন্তু তুমি পুস্তক নও। বাড়ী তোমার কিন্তু তুমি বাড়ী নও। পিতা তোমার কিন্তু তুমি

পিতা নও। মাতা তোমার কিন্তু তুমি মাতা নও। সেইরূপ এই স্থূলদেহ তোমার কিন্তু তুমি এই স্থূলদেহ নও। ইন্দ্রিয়গণ তোমার কিন্তু তুমি ইন্দ্রিয়গণ নও। প্রাণসমূহ তোমার কিন্তু তুমি প্রাণসমূহ নও। তোমারই মন, তোমারই বুদ্ধি, কিন্তু তুমি মন, বুদ্ধি নও। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই উনিশটী তোমার, কিন্তু তুমি এই উনিশটী হইতে ভিন্ন। জাগ্রৎ অবস্থায় তুমি নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া, ভোক্তা বলিয়া, জ্ঞাতা বলিয়া, দ্রষ্টা বলিয়া, মন্তা বলিয়া ভাবিতেছ। যে কর্ত্তা সে কিন্তু করণ হয় না, কর্ম্মও হয় না; যে ভোক্তা সে ভোগ্য নয় ভোগও নয়, যে জ্ঞাতা সে কখন জ্ঞেয় হয় না, যে দ্রষ্টা সে কখন দৃশ্য হয় না। প্রিয়পুত্র, তুমি এইবার ভাবিয়া দেখ যে তুমি কে। তোমার এই স্থূলশরীর যেন একটী ঘর; এই ঘরের উনিশটা দরজা আছে। সেই উনিশটা দরজা হইতেছে—পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটা কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটা প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই উনিশটা দরজাবিশিষ্ট স্থূলশরীররূপ ঘরের মধ্যে বাস করিতেছে কর্ত্তা তুমি, ভোক্তা তুমি, দ্রষ্টা তুমি, মন্তা তুমি, জ্ঞাতা তুমি। তুমি এই উনিশটা দরজার সাহায্যে তোমার বাহিরে যে সব পদার্থ আছে তাহাদিগকে দেখিতেছ, শুনিতেছ, আঘ্রাণ করিতেছ, আস্বাদন করিতেছ, গমন করিতেছ, গ্রহণ করিতেছ, বাক্য উচ্চারণ করিতেছ, মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিতেছ; সংকল্প বিকল্প করিতেছ, নিশ্চয় করিতেছ, তোমার জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার সমুদয় ধরিয়া রাখিতেছ, এবং অভিমান করিতেছ। এইরূপে এই উনিশটা সাধনের সাহায্যে তুমি জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয়সমূহ অতি স্থূলরূপে ভোগ করিতেছ। কিন্তু বৎস, স্বপ্নাবস্থায় তোমার ভোগ্যবস্তু স্থূল থাকে না। স্বপ্নাবস্থায়ও তুমি এই উনিশটী দ্বার দিয়া যাহা ভোগ কর সেই ভোগ্যবস্তুসমূহ অতি সূক্ষ্ম। জাগ্রৎ অবস্থার বিষয়ভোগের সংস্কার হইতে তাহারা জাত।

তুমি নিজ বাটীতে নিদ্রিত আছ কিন্তু তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ যে তুমি হিমালয়ে গিয়া মুনিঋষিদের সহিত কথোপকথন করিতেছ। কত নদ, কত পাহাড়, কত জীবজন্তু, তুমি দর্শন করিতেছ; ঠিক জাগ্রৎ অবস্থার মত স্বপ্নাবস্থায় সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছ এবং বিষয়সমূহকে তোমার বাহিরে দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু বৎস, স্বপ্নকালীন জগৎ ত তোমার বাহিরে নাই। তোমার মনই বিষয়সমূহ সৃষ্টি করিয়াছে। তুমি সেই মনঃকল্পিত বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া সুখী দুঃখী হইতেছ। জাগ্রৎ অবস্থার জগৎও সেইরূপ মনঃকল্পিত জানিবে। স্বপ্নাবস্থায় তোমার স্থূলদেহ শয্যায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু তুমি তোমার স্থূলদেহের সাহায্য ব্যতীত অন্য জগতে ঠিক জাগ্রৎকালীন জগতের ন্যায়ই বিচরণ করিয়া থাক। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে যে তুমি এই স্থূলদেহ নও। এই স্থূলদেহ হইতে তুমি বিলক্ষণ; এই স্থূলদেহ হইতে তুমি পৃথক্ একটী পদার্থ। আবার দেখ, যখন তোমার সুষুপ্তি হয়, তখন তোমার স্থূল, সূক্ষ্ম কোন দেহই থাকে না। তখন না থাকে তোমার মন, না থাকে বুদ্ধি, না থাকে অহঙ্কার; তোমার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তখন নিশ্চেষ্ট। সুষুপ্তি অবস্থায় কেমন একটা গাঢ় অজ্ঞান আসিয়া যেন তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তুমি তখন কিছুই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানিতে পার না। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে তোমার স্মরণ হয় যে এতক্ষণ ধরিয়া তুমি নিদ্রাভিভূত ছিলে, কিছুই জানিতে পার নাই বটে কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া বেশ সুখেই নিদ্রা গিয়াছিলে। অনুভূত বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং সুষুপ্তিতে তোমার নিশ্চয়ই সুখ ও অজ্ঞান অনুভূত হয়েছিল। তুমি সেই সময় চিত্তরূপ দ্বার দিয়া উহা অনুভব করেছিলে। জ্ঞানতঃ সুষুপ্তি দ্বারাই সুখাত্মক যে তোমার স্বরূপ সেই স্বরূপ তুমি স্থায়ীরূপে লাভ করিতে পার।

জাগ্রতের পর স্বপ্ন, স্বপ্নের পর সুষুপ্তি এবং সুষুপ্তির পর পুনরায়

জাগ্রতাদি অবস্থা হইয়া থাকে। একই অবস্থা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে থাকে না। স্তুতরাং এই অবস্থাগুলির ব্যভিচার হয় বলিয়া উহারা অনিত্য এবং পর-প্রকাশ্য। এই অবস্থাগুলিকে প্রকাশ করিয়া তুমি নিত্য বিগুমান রহিয়াছ। বৎস শ্বেতকেতু, সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ তুমি আপন সত্তা ও প্রকাশ দিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন স্বুষুপ্তি অবস্থাকে প্রকাশ করিয়া স্ব-স্বরূপে নিত্য বিগুমান রহিয়াছ। এই স্বুষুপ্তি অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন—

> সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি।
> এষ ব্রহ্মলোকঃ, অস্য এষা পরমা গতি।
> এষা অস্য পরমা সম্পৎ। এষঃ অস্য পরমো লোকঃ।
> এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ॥

স্বুষুপ্তি সময়ে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না। যে অবিদ্যাশক্তি দেশ ও কালরূপে বিভক্ত হইয়া আমাদের নিকট অবিরত ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন, খণ্ড খণ্ড, বহুবিধ বস্তু উপস্থিত করিতেছে, সেই শক্তি স্বুষুপ্তি সময়ে শান্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য স্বুষুপ্তিকালে অবিদ্যাশক্তিদ্বারা প্রবিভক্ত, খণ্ডীকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের অভাব হয় বলিয়া তখন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানেরও অভাব হইয়া থাকে। সেইজন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য লোপ পায়, স্তুতরাং স্বুষুপ্তি সময়ে কেহ কাহাকেও দেখে না, শুনে না, বলে না, জানে না। তখন আত্মা স্বীয় স্বরূপ স্বপ্রকাশ স্বয়ং-জ্যোতি আনন্দঘন সদ্বস্তুকর্ত্তৃক সম্পরিষক্ত হইয়া পরিচ্ছিন্নত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সমগ্র অপরিচ্ছিন্নস্বরূপে অবস্থান করিয়া আপ্তকাম, আত্মকাম হইয়া সলিলের ন্যায় নির্ম্মলরূপ ধারণ করে। অবিদ্যা শান্ত হয় বলিয়া বহুবিধ দ্বৈতজাল আর প্রতীত হয় না, সেইজন্য আত্মা তখন স্বীয় নির্ম্মল, এক, অদ্বিতীয় আনন্দঘনরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাই অমৃত, অভয়পদ। কার্য্য-কারণরূপ উপাধির বিলয়ে স্বয়ংজ্যোতি আত্মা সর্ব্ববিধ

সম্বন্ধ-রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মানন্দরূপে বিরাজ করে। ইহাই পরমাগতি। ইহাই ভূমা; ইহাই চিৎসুখাত্মক ব্রহ্ম।

বৎস শ্বেতকেতু, প্রতিদিন প্রাণিগণ তাহাদের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মন নির্ম্মল না হওয়া হেতু, তাহাদের মন বাসনাদ্বারা ভাবিত, বাসনাদ্বারা বাসিত, বাসনাদ্বারা অনুরক্ত থাকা হেতু জ্ঞানতঃ স্ব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বাসনাই তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত করে। জাগ্রৎ অবস্থার পর যেমন স্বপ্ন অবস্থা তারপর যেমন সুষুপ্তি; সুষুপ্তির পর যেমন আবার জাগ্রৎ অবস্থা হইয়া থাকে, সেইরূপ বৎস ইহলোক হইতেছে জাগ্রৎ অবস্থা, মুমূর্ষু অবস্থা হইতেছে স্বপ্নলোক এবং সুষুপ্তি অবস্থা হইতেছে মৃত্যু। মৃত্যুর পর নিজ নিজ জ্ঞান-কর্ম্ম-বাসনা অনুসারে আবার জাগ্রৎ অবস্থারূপ পুনর্জন্ম। এইরূপে ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ প্রাণিগণ মুগ্ধ হইতেছে।

এখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ শ্বেতকেতু, সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ মনে লীন হয়, মন প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি তাহার আশ্রয় সচ্চিদানন্দে লীন হইয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় তোমাকে এই সুষুপ্তি অবস্থা আনিতে হইবে; তাহা হইলে তুমি স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে সতত সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারিবে। বিশেষ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ বৎস, আমাদের মনে যত কিছু সংকল্প যত কিছু চিন্তা উদিত হয় সে সবগুলিই বাক্‌রূপেতে উদিত হইয়া থাকে। মনে মনে যে সংকল্পই কর না কেন 'আমি ওখানে যাব'; 'আমি অমুক কার্য্য করিব' ইত্যাদি তোমার যাবতীয় কার্য্য, যাবতীয় চিন্তাই অতি সূক্ষ্ম বাক্‌রূপে তোমার মনে উদিত হয়। এখন যদি তুমি বাক্‌কে মনে লীন করিতে পার, তাহলে মন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সংকল্প-সমূহ যদি তাহাদের বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করিতে না পারে তাহলে মন বাহ্যবস্তুর চিন্তা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিবে। তারপর বৎস, মনকে

বুদ্ধিতে লীন করিবে। বুদ্ধিই দেশ ও কালের কল্পনা করিয়া সমস্ত বাহ্য পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন সত্তা প্রদান করিয়া থাকে। মন যদি সংকল্প ত্যাগ করে তাহলে বুদ্ধি কোন বাহ্যবস্তুকে তোমা হইতে এক পৃথক্ সত্তা প্রদান করিতে পারে না। তখন বুদ্ধি তোমার বাহিরে কোন বস্তুকে তোমা হইতে পৃথক্ করিয়া, তাহাকে এক বিশেষ নাম ও রূপ দিয়া তোমা হইতে ভিন্ন একটী সত্য বস্তুরূপে নিশ্চিত করিতে পারিবে না। তখন বুদ্ধি তোমাতে লীন হইয়া যাইবে। তখন 'অহং'রূপে সদা প্রকাশমান তুমি কেবল বিদ্যমান থাকিবে। তখন তোমার সর্ব্বাত্মভাবের উপলব্ধি হইবে। তুমি চরাচর সমুদয় জগৎকে তোমার অঙ্গীভূত এবং তোমাকে সর্ব্বত্র অনুস্যূত দর্শন করিতে থাকিবে। তৎপরে 'অহং'রূপে প্রকাশমান যে তুমি, তোমার সেই অহংকে 'সর্ব্বজগৎ' এইভাব হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া তোমার প্রকৃত স্বরূপ 'শান্তং, শিবং, অদ্বৈতং'রূপ সচ্চিদানন্দে স্থিতি লাভ করিবে। এইজন্য ঋষিগণ বার বার বলিয়াছেন—

যচ্ছেদ বাক্ মনসি প্রাজ্ঞঃ
তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানম্ আত্মনি, মহতি নিযচ্ছেদ
তৎ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি ॥

এইরূপে 'অহং'এর অনুসরণ ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ আত্মায় পর্য্যবসিত হয়। এই প্রত্যক্ আত্মা সতত প্রকাশশীল; জ্যোতিঃস্বরূপ এই প্রত্যক্ আত্মা আপন মহিমায় আপনি ভাস্বান্। প্রতি শরীরে অঞ্চতি বিরাজতে প্রতি শরীরে, প্রত্যেক অনুপরমাণুতে, স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক বস্তুর ভিতর বাহির ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে বলিয়া এই সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ বস্তুকে প্রত্যক্ আত্মা বলা হয়। এই আত্মা প্রতীপেন, বিপরীত-ভাবেন অঞ্চতি গচ্ছতি আস্তে; এই আত্মা বিপরীতভাবে বিদ্যমান রহে বলিয়া প্রত্যক্-আত্মা বলা হয়।' কাহার বিপরীতভাবে ইহা বিদ্যমান

থাকে? যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যবস্তু তাহার বিপরীতভাবে ইহা বিদ্যমান থাকে। দৃশ্য খণ্ড; আত্মা অখণ্ড; দৃশ্য পরিণামী, আত্মা অপরিণামী; দৃশ্য ধীবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ্য, আত্মা ধীবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ্য নহে। দৃশ্য জড়, আত্মা চেতন। অখণ্ডৈকরস, নিত্য, অপরিণামী স্ব-প্রকাশ আত্মা জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ইহা প্রত্যক্-আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্-আত্মাই একমাত্র সত্য। ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহাদের সত্যতা আপেক্ষিক, তাহাদের বাধ হইয়া থাকে, সেইজন্য তাহাদিগকে মিথ্যা বা প্রাতীতিক সত্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে যেরূপ সর্প দৃষ্ট হয় এবং সেই সর্পের সত্যতা যেরূপ প্রাতীতিক মাত্র, ঐ সর্প এবং সর্প-জ্ঞানের যেরূপ রজ্জুর জ্ঞান হইলে বাধ হইয়া যায় সেইরূপ এই সদ্‌ঘন, আনন্দঘন, আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে নামরূপাত্মক জগৎ ও জগতের জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন কেবল আত্মাই 'স্বেমহিম্নি' বিরাজ করেন। বৎস শ্বেতকেতু তুমি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অমৃত অভয়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। ঋষি বলেন—

তদ্ যথা অপি হিরণ্যনিধিং নিহিতং
অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ
এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ
এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥

যাহারা নিধি-বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা ভূমি দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে সেই ভূমির নীচে স্বর্ণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু যাহারা নিধিবিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তাহারা স্বর্ণখনির উপর পুনঃপুনঃ বিচরণ করিলেও জানিতে পারে না যে সেই ভূমির নীচে স্বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত প্রাণিগণ ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ প্রত্যহ সুষুপ্তি সময়ে স্ব-স্ব

হৃদয়াকাশে বিরাজমান সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াও জানিতে পারে না যে আমি স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। কেন পারে না? পারে না এইজন্য যে তাহাদের দৃষ্টি আবৃত রহিয়াছে অজ্ঞানের এক ঘন আবরণ-দ্বারা। তাই তোমাকে বার বার বলিতেছি তুমি বিচারবান্ হইয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনদ্বারা অজ্ঞান অপনীত কর। তাহা হইলে আপনাতে আপনি উপলব্ধি করিবে যে তুমি "অপহত পাপ্মা, বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো, বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ, সত্যকাম, সত্যসংকল্পঃ"। তোমার ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, মোহ নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। তুমি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, সর্ব্বদুঃখ-বিরহিত, সচ্চিৎসুখাত্মক।

যাহারা অবিদ্বান্, যাহাদের চিত্ত সামান্য পরিচ্ছন্ন বিষয়ে আসক্ত, যাহারা ভেদদর্শী, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা যাহাদের চিত্তের রজস্তমোরূপ মলিনতা সম্যক্‌রূপে বিধৌত হয় নাই, তাহারাই পুনঃপুনঃ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহাদের অসংযতচিত্তে কামনা বিষয়ভোগের শত শত বাসনা জাগাইয়া তোলে। সেই সেই বাসনাভোগের নিমিত্ত তাহারা পুনঃপুনঃ দেহ ধারণ করিয়া সুখদুঃখে মুহ্যমান হইতে থাকে। শোন বৎস শ্বেতকেতু, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন—

স যত্র অয়ম্ আত্মা অবলং ন্যেত্য
সম্মোহং ইব ন্যেতি, অথ এনং এতে
প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি। সঃ এতা তেজো মাত্রাঃ
সমভ্যাদদানঃ হৃদয়ং এব অন্বু অবক্রামতি।
সঃ যত্র এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাক্ পর্য্যাবর্ত্ততে, অথ
অরূপজ্ঞো ভবতি।

মুমূর্ষ ব্যক্তি মৃত্যু সময়ে বলহীন হইয়া যেন সম্মোহপ্রাপ্ত হইয়া

থাকে। তখন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ আত্মার অভিমুখে গমন করে। তখন সেই আত্মা প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়-বর্গকে সমাহৃত করিয়া হৃদয়ে অবস্থান করে। চক্ষুর অনুকূলতারূপ স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলে এই মুমূর্ষ ব্যক্তি আর রূপ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না ; তখন তাহার দর্শন শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সেই মুমূর্ব ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনগণ বলিতে থাকে—

একীভবতি ন পশ্যতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি ন জিঘ্রতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি ন রসয়তে ইতি আহুঃ,
একীভবতি ন বদতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি ন মনুতে ইতি আহুঃ,
একীভবতি ন স্পৃশতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি ন বিজানাতি ইতি আহুঃ, ।
তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে।
তেন প্রদ্যোতেন এব আত্মা নিষ্ক্রামতি। চক্ষুষ্টো
বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যঃ শরীরদেশেভ্যঃ তম্ উৎক্রামন্তং
প্রাণঃ অনু উৎক্রামতি, প্রাণং অনু উৎক্রামন্তং সর্ব্বে
প্রাণাঃ অনু উৎক্রামন্তি। সবিজ্ঞানো ভবতি। সবিজ্ঞানমেব
অন্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞাচ।

এই মুমূর্ষ ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া একীভূত হওয়ায়, এই ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া একীভূত হইতেছে সেইজন্য আঘ্রাণ করিতেছে না, রসনেন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া একীভূত হইতেছে সেইজন্য স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, বাক্ ইন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া

একীভূত হইতেছে সেইজন্য কথা বলিতে পারিতেছে না, শ্রবণেন্দ্রিয় যাইয়া হৃদয়ে একীভূত হইতেছে সেইজন্য ইহার শ্রবণশক্তি লোপ পাইতেছে। মন যাইয়া হৃদয়ে একীভূত হইতেছে সেইজন্য চিন্তা করিতে পারিতেছে না, ত্বক্ ইন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া একীভূত হইতেছে সেইজন্য স্পর্শ অনুভব করিতে পারিতেছে না, বুদ্ধি যাইয়া হৃদয়ে একীভূত হইতেছে সেইজন্য ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হইতেছে না।

মৃত্যু সময়ে হৃদয়ের অগ্রভাগ দিয়া আত্মা নির্গত হয়, সুতরাং আত্মার নির্গমপথ হৃদয়ের সেই নাড়ীদ্বার আত্মজ্যোতিঃদ্বারা উদ্ভাসিত হয় এবং সেই জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়াগ্রপথে আত্মা বিনির্গত হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে আত্মা হৃদয়াগ্রপথে বহির্গত হইয়া সূর্য্যালোকে যাইতে হইলে চক্ষু দিয়া ; ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে কিংবা অন্যান্য স্থানে যাইতে হইলে শরীরের অন্য অন্য অবয়বপথে নিষ্ক্রান্ত হয়। আত্মা যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করে তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ করিতে থাকে এবং প্রাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ উৎক্রমণ করিতে থাকে। উৎক্রমণ কালে আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংস্কারযুক্ত হইয়াই পরলোকে প্রস্থান করে। তখন ইহ-জীবনের ও পূর্ব্ব পূর্ব্বজীবনের প্রাক্তন কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানের সংস্কার আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। শোন শ্বেতকেতু, আত্মা পরমার্থতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহরূপ উপাধিবশতঃই আত্মাতে ইহলোক পরলোক গমনাগমনরূপ ব্যবহার আরোপিত হয় মাত্র। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি লইয়া সূক্ষ্মদেহ গঠিত। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ লইয়া গঠিত। এই সূক্ষ্মদেহ আত্মজ্যোতিঃদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া চৈতন্যময় হইয়া থাকে। এই চৈতন্যময় দেহই গমনাগমন করে, সুখদুঃখ ভোগ করে। এই দেহই আত্মার উপাধি। উপাধি কখন বস্তুর স্বরূপে প্রবেশ করিতে

পারে না, কিন্তু উপাধির ধর্ম্মের দ্বারা বস্তুকে রঞ্জিত করিয়া তোলে মাত্র। এই সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্মদ্বারা আত্মাকেও সেই সেই ধর্ম্মবান্ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্বরূপের জ্ঞান্ না হয় ততক্ষণ আত্মা সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্মসমূহ নিজেতে আরোপিত করিয়া আমি মুমূর্ষু, আমি মৃত, আমার পরলোকে গমন হইল, আমার জন্ম হইল এইরূপ মনে করে, কিন্তু যাহার একাত্মজ্ঞান-দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে তাহার জন্ম মৃত্যু কিংবা ইহলোক পরলোকে গমনাগমন হয় না। সেইজন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন—

পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মনশ্চ
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।
ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ইহৈব
সমবলীয়ন্তে।

আপ্তকাম কৃতকৃত্য বিদ্বান্‌ব্যক্তির সমস্ত কামনা ক্ষয় হইয়া যায় সুতরাং তাঁহার আর স্থূলদেহ ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। তাঁহার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ মৃত্যুর পর আর কোথায়ও উৎক্রমণ করে না তাহারা স্ব স্ব কারণে লীন হইয়া যায়। ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃই অবিদ্বান্ ব্যক্তি কামনা-তাড়িত হইয়া সুষুপ্তি, মৃত্যু কিংবা প্রলয়কালে স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াও স্বরূপচ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি, প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সত্যস্বরূপে সদা সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি অবিদ্যা ও তৎকার্য্য এই জগতের সুখদুঃখে বিচলিত হন না। শোন বৎস তোমাকে একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি।

পুরুষং সোম্য উত হস্তগৃহীতং আনয়ন্তি অপহার্ষীৎ স্তেয়ম্ অকার্ষীৎ, পরশুম্ অস্মৈ তপত ইতি। স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি, তত এব অনৃতং আত্মনাং কুরুতে; সঃ অনৃতাভিসন্ধঃ অনৃতেন আত্মানং অন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স দহ্যতে অথ হন্যতে।

হে সোম্য রাজপুরুষগণ যদি কাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করে এবং তাহার হাত বাঁধিয়া বিচারার্থ লইয়া আসে এবং বলে যে এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক, তখন তাহার পরীক্ষার জন্য যখন একখণ্ড কুঠার তপ্ত করা হয়, তখন সেই ব্যক্তি চুরি করিয়াও যদি বলে "আমি চুরি করি নাই" এবং নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য মোহবশতঃ সেই তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে তাহা হইলে সে অসত্যদ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করায় দগ্ধ হয় এবং অতঃপর রাজপুরুষগণদ্বারা প্রহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু—

অথ যদি তস্য অকর্ত্তা ভবতি, তত এব সত্যং আত্মানং কুরুতে, স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেন আত্মানং অন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স ন দহ্যতে অথ মুচ্যতে।

যদি সেই ব্যক্তি বাস্তবিকই চুরি না করিয়া থাকে তাহা হইলে সে সত্যের বলে আপনার নির্দোষিতা প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সত্যের দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া সেই তপ্ত পরশু গ্রহণ করিলেও দগ্ধ হয় না কারণ সে সত্যসন্ধ। তখন সে মুক্তিলাভ করে। তাই বলি বৎস

স যথা তত্র ন অদাহ্যেত ; ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। তৎ হ অস্য বিজজ্ঞৌ ইতি বিজজ্ঞৌ ইতি।

সেই সত্যবাদী পুরুষ যেরূপ তপ্ত পরশু হস্তে গ্রহণ করিয়াও দগ্ধ হয়না এবং বন্ধন হইতেও বিমুক্ত হয়, সেইরূপ সত্যাভিসন্ধ ও অনৃতাভিসন্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের সুষুপ্তিকালে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের প্রাপ্তি তুল্য হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনাকে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বলিয়া অনুভব করেন আর স্বীয় স্বরূপানভিজ্ঞ অজ্ঞানী পুরুষ সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া বা মৃত্যুর পর পুনরায় সুখে দুঃখে মুহ্যমান হইতে থাকে। তুমি নিশ্চয় জানিও বৎস এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ইহাই একমাত্র সত্যবস্তু। এই সত্যবস্তুই আত্মা, হে শ্বেতকেতু তুমি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরই।

তুমি কখনও নিজেকে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ বলিয়া মনে করিও না। অল্পজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ সর্ব্বশক্তিমান্ এ সবই ঔপাধিক। তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ-চেতন। তোমার কোন বিশেষ নাই। তুমি নির্বিশেষ শুদ্ধ চিৎস্বরূপ, কেবল আনন্দ, অমৃতস্বরূপ। তুমি তোমার উপাধিকে সত্তা দিয়া প্রকাশ করিতে যাইয়া উপাধির সহিত অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইতেছ। এই উপাধিসমূহ তোমাকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে যেন আবরণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তোমাতে আরোপিত, কল্পিত হইতেছে মাত্র। কল্পিত বস্তুর দোষগুণদ্বারা নিত্য, অকল্পিত সচ্চিদানন্দ তোমার কোন

হানি নাই। বৎস, অস্পষ্ট আলোকে যখন রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয় তখন সেই সর্প যেমন রজ্জু হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, উহা যেমন শুধু প্রাতীতিক সেইরূপ শুদ্ধচেতন তুমি তোমাতে জীবভাব, জগৎভাব, ঈশ্বরভাব শুধু প্রাতীতিক মাত্র। রজ্জুসর্প কখনও দংশন করে না। মরীচিকায় যে জল দৃষ্ট হয় সেই জলে মরুভূমিকে কখন সিক্ত হইতে দেখিয়াছ কি? সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে কি তাহার পিপাসা নিবারণ করিতে দেখিয়াছ? তাই বলি বৎস তুমি জীবভাব পরিত্যাগ কর। তুমি স্বরূপতঃ যখন সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, অমৃত স্বরূপ, তখন অবিরত নিজের ব্রহ্মভাব মনন করিতে থাক। ইহা নিশ্চয় জানিও বৎস তোমারই মনঃকল্পনা স্থূলরূপ ধারণ করিয়া জগৎরূপে যেন তোমার বাহিরে প্রতিভাত হইতেছে। যেমন স্বপ্নে তোমার মনঃকল্পনা স্থূলরূপ ধারণ করিয়া তোমার বাহিরে দৃষ্ট হয় সেইরূপ বৎস তোমারই চিত্ত যখন যেরূপ আকার গ্রহণ করিতেছে তখন সেই সেই আকারে আকারিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তোমাকেও প্রলোভিত করিতেছে এবং তুমিও চিত্তকে প্রকাশ করিতে যাইয়া সেই সেই আকারের সহিত নিজেকে মিলাইয়া ফেলিতেছ। তুমি, সাক্ষী-সাক্ষ্য, সবিশেষ-নির্বিশেষ, দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি আপেক্ষিক ভাবসমূহ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ হও। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর।

শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ শ্রবন করিয়া মনন করিতে করিতে স্ব-স্বরূপ অবগত হইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

সমাপ্ত

নচিকেতা

বৈদিকযুগে মুনি-ঋষিগণ যে স্থানে বাস করিতেন তাহাকে তপোবন বলিত। মুনি-ঋষিরা ছিলেন আদর্শ গৃহী। তাঁহাদের স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল, কন্যা ছিল, ধন-ঐশ্বর্য্য সবই ছিল। তাঁহারা সব ভোগ করিয়াও ছিলেন অভোক্তা, বড় বড় কর্ম্ম করিয়াও তাঁহারা ছিলেন অকর্ত্তা। তখন মোক্ষের জন্য, ভগবানকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, ধন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গিরিগুহায় আত্মগোপন করিতে হইত না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াও কালপ্রভাবে যে সব সদ্‌গুণগুলি অর্জ্জন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, সেই সময় আদর্শ গৃহী প্রত্যেক মুনি-ঋষিতে সেই সব সদ্‌গুণগুলি বিরাজমান থাকিত। তাঁহাদের জীবনে জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় দৃষ্ট হইত। তখন সমাজ ছিল জীবন্ত এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণের প্রাণ পুঁটীমাছের প্রাণের মত ছিল না। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া তাঁহারা যেরূপ অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন, সেইরূপ কর্ম্মেতেও ছিলেন তাঁহারা অসাধারণ কর্ম্মী। সমাজের মঙ্গল, মানব জাতির কল্যাণ, সমগ্র বিশ্বের হিতের জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতেন। তাঁহাদের বাসস্থান মনোরম, শান্তরসাস্পদ তপোবন সমূহে রাজা রাজকার্য্যপরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিতেন; জিজ্ঞাসু তাঁহার হৃদয়ের সংশয়সমূহ নিরসন করিবার জন্য সেই কুটীরবাসী মুনি-ঋষিদের শরণাপন্ন

হইতেন। শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু মুমুক্ষুগণ স্বাতন্ত্র্যলাভের পন্থার অনুসন্ধানে সাগ্রহে আশ্রয় করিতেন সেই কুটীরবাসী মুনিঋষিদের চরণ। সেই সময়ে একদিন ঐরূপ একটি তপোবনে ঋষিগণ সমবেত হইয়াছেন। সেই সমবেত ঋষিগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল—মৃত্যু কি এবং কি করিয়াই বা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যাইতে পারে। মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জন্ম হয়, না মৃত্যুর সহিতই সব শেষ হইয়া যায়। সমবেত ঋষিগণ ঐসব প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য তাঁহাদের মধ্যে একজন তত্ত্বজ্ঞ, সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে উক্ত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ, সত্যদ্রষ্টা ঋষি সমবেত মুনিসংঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আপনারা যে বিষয়ের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন তাহার মীমাংসা করা অতীব দুরূহ। কিন্তু গুরুপরম্পরাক্রমে আমি উক্ত বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাই আমি অন্য এক প্রাচীন কথা অবলম্বন করিয়া আপনাদের নিকট বিবৃতি করিব আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সমবেত ঋষিগণ বলিলেন—

ওঁ সহ নৌ অবতু, সহ নৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনৌ ত্বাধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁম্ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ॥

সকল ঋষিগণ সমস্বরে উক্ত শান্তি পাঠ করিয়া একাগ্রচিত্তে আচার্য্যস্থানীয় সেই তত্ত্বজ্ঞ ঋষির উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উক্ত শান্তি পাঠটী কৃষ্ণ যজুর্বেদের। প্রত্যেক বেদের এক একটী বিশেষ শান্তিপাঠ আছে। সমবেত ঋষিগণ যজুর্বেদীয় বলিয়া উক্ত শান্তি পাঠ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—হে পরমেশ্বর আমাদিগকে এবং আমাদের আচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। যিনি ‘প্রণতপালক’, সেই পরমেশ্বর আমাদিগের জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন করুন। আমাদের আচার্য্য এবং আমরা যেন

আত্মবলে বলীয়ান্ হই, ব্রহ্মতেজে যেন আমাদের আচার্য্যের ও আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয় উদ্ভাসিত হয়, আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা যেন নিষ্প্রভা না হয়। আমাদের আচার্য্য এবং আমাদের মধ্যে যেন কোন বিদ্বেষ ভাব না থাকে। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক বাধাবিঘ্নসমূহ উপশান্ত হউক। শান্তিপাঠ শেষ হইলে তত্ত্বজ্ঞ, সত্যদ্রষ্টা, সেই ঋষি বলিলেন—

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস।
তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা আবিবেশ,
সঃ অমন্যত।

বাজশ্রবার পুত্র আরুণি বাজশ্রবসঃ ফল কামনা করিয়া সর্ব্বস্বদান মূলক বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। সেই যজ্ঞে সমবেত সদস্যদিগকে দান করিবার জন্য গাভী-গণকে যখন যজ্ঞস্থানে আনয়ন করা হইতেছিল, তখন সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় হইল। বৈদিকযুগে নিরতিশয় আনন্দলাভই ছিল সমাজের লক্ষ্য। এই নিত্য, নির্ম্মল, নিরতিশয় আনন্দ কখনও অমৃত, কখনও স্বর্গনামে অভিহিত হইত। এই স্বর্গ বা অমৃতলাভের উপায় ছিল যজ্ঞ। মানুষ স্বভাবতঃ বহির্মুখ। মানুষের এই স্বাভাবিক বহির্মুখ-প্রবৃত্তি তাহার মন ও ইন্দ্রিয়গণকে অবিরত নানা বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া বিক্ষিপ্ত করিতেছে। মানবমনের এই বহির্মুখ প্রবৃত্তিরও উদ্দেশ্য হইতেছে শাশ্বত আনন্দলাভ। কিন্তু এই প্রবৃত্তির বিষয় বহু বলিয়া মানবমন ক্ষণে ক্ষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া নিত্য, নির্ম্মল আনন্দলাভ করিতে পারিতেছে না। বিষয়ভোগ-জনিত যে আনন্দ তাহা খণ্ড, উৎপত্তি-বিনাশশীল। সুতরাং তাহা শোক, মোহ, দুঃখাদিদ্বারা অনুবিদ্ধ। সেইজন্য বৈদিক সমাজের মহাপুরুষগণ বিষয়ভোগকে কতকগুলি বিধান-

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সেই প্রবৃত্তির গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন দিব্য অমৃতময় জীবনের দিকে। ঐহিক কিংবা পারলৌকিক অভ্যুদয় বৈদিক-সমাজ পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু সেই ঐহিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়কে এমন কতকগুলি বিধিনিষেধ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যাহাতে সেই ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়ভোগ নিত্য, শাশ্বত আনন্দলাভের পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে। তাঁহারা ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে মানবসমাজকে নিঃশ্রেয়সের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপায়ে মানব সমাজের এই প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই উপায় হইতেছে যজ্ঞ। বৈদিক-সমাজে বহুবিধ যজ্ঞ ছিল। এক এক যজ্ঞদ্বারা মানুষ তাহার বিশেষ বিশেষ অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ হইত। গণিতশাস্ত্রে যেমন শ্রেঢ়ীর অঙ্ক আছে যথা, ক$_{১}$ + ক$_{৩}$ + ক$_{৫}$ + ক$_{৭}$··· ···অনন্ত। এই যে একটী শ্রেণী অনন্ত পর্য্যন্ত চলিয়াছে, এই শ্রেণীর যেমন কোন বিশেষ সংখ্যার পরিমাণ বাহির করিতে পারা যায় অর্থাৎ—ক$_{১}$ + ক$_{৩}$ + ক$_{৫}$ + ···অনন্ত এই অনন্তশ্রেণীর যেমন ক$_{১০০}$ কত? ক$_{১০০০}$ কত? ইহা বলা যাইতে পারে, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই যে অনাদি অনন্ত বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহারও বিশেষ বিশেষ প্রকাশ সাক্ষাৎকার করিয়া সেই সেই শক্তি লাভ করা যাইতে পারে। যে প্রণালী দ্বারা ভগবৎশক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকাশের মূল উৎসের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় সেই প্রণালী হইতেছে যজ্ঞসমূহ। প্রত্যেক যজ্ঞের একজন ঋষি, একজন দেবতা এবং বিশেষ ছন্দ আছে। যেমন অণু, আলোক, বাতাস, বিদ্যুৎ, তাপ প্রভৃতি বিষয়সমূহের তত্ত্ব যে সব ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন এবং সেই সেই বিশেষ আবিষ্কারের সহিত সেই সেই বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিকের নাম ও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা সন্নিবেশিত আছে, সেইরূপ

যাঁহারা যে যে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্ত বিশ্বরূপে বিভাত ভগবৎশক্তির বিশেষ বিশেষ শক্তিকেন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন, তাঁহাদিগকে বৈদিক-সমাজে ঋষি ও মুনি বলিত এবং তাঁহাদিগের সেই বিশেষ বিশেষ উপায়সমূহকে মন্ত্র এবং সেই বিশেষ বিশেষ শক্তিকেন্দ্রকে দেবতা নামে অভিহিত করা হইত। সাধারণভাবে যে সব অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করা হইত সেই অনুষ্ঠানগুলিকে যজ্ঞ বলিত। কোন্ যজ্ঞে কোন্ মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহাও বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ন্যায়, মন্ত্রশাস্ত্র বা বেদে নিবদ্ধ থাকিত। যদি কোন মানুষ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, পুত্র, স্ত্রী, পশু, রাজ্য, দীর্ঘায়ু প্রভৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেই সেই বিশেষ বিশেষ বস্তু যে যে উপায়দ্বারা যে যে ঋষি লাভ করেছিলেন, তাঁহাকে সেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে যেমন রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ, কারিরিযজ্ঞ, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, সর্ব্বদক্ষিণ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, সোমযাগ ইত্যাদি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ বিশেষ বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ সত্যে উপনীত হইয়াছেন সেইরূপ ঋষিগণও যজ্ঞদ্বারা বিশেষ বিশেষ কাম্য-পদার্থ লাভ করিতেন। কাম্যযজ্ঞগুলি কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে যজমান স্বর্গ বা নিরতিশয় আনন্দ বা নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইতেন। বেদ-বিহিত কর্ম্ম মানুষকে প্রকৃত কল্যাণের পথে লইয়া যাইত। সেইজন্য ঋষি ঔদ্দালক আরুণি সর্ব্বদক্ষিণ নামক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে যজমান তাঁহার সর্ব্বস্ব দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক ও দানের উপযুক্ত পাত্রদিগকে প্রদান করিতেন।

পুত্র কুমার নচিকেতা দক্ষিণা দিবার জন্য যজ্ঞস্থলে গাভীগণকে আনীত

হইতে দেখিয়া পিতার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রদ্ধা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি মনে করিলেন—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নামতে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তাদদৎ ॥

ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দিবার জন্য এই যে গো সকল আনীত হইয়াছে, ইহারা সম্পূর্ণ জীর্ণ শীর্ণ, মনে হইতেছে এই গোসকল ইহাদের জীবনের শেষ-জল পান করিয়াছে, আর ইহাদের জল পান করিবার সামর্থ্য নাই। জীবনের অন্তিম খাদ্য ইহারা ভক্ষণ করিয়াছে; পুনরায় ভক্ষণ করিবার সামর্থ্যও বুঝি ইহাদের নাই। বোধ হইতেছে যতটুকু দুগ্ধ প্রদান করিবার ইহাদের সামর্থ্য ছিল সেইসব দুগ্ধটুকু ইহাদিগের হইতে দোহন করা হইয়াছে; পুনরায় আর ইহারা দুগ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না। আরও আমার বিশ্বাস হইতেছে যে এই গোসকল এতদূর শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে পুনরায় ইহারা কখনই গোবৎস প্রসব করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং যে যজমান এইরূপ নিষ্ফল জীর্ণ শীর্ণ গোসমূহকে দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে সে নিশ্চয়ই সেইসব লোকে গমন করে যেখানে আনন্দ নাই, সুখ নাই। তাই মনে হইতেছে আমার পিতা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও এই যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবেন না।

নচিকেতা পিতার ভাবী কল্যাণের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নচিকেতা এখনও কুমার; তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে সর্ব্বস্ব দক্ষিণযজ্ঞে কেবল যে হৃষ্টপুষ্ট গাভী ও বৃষ দান করিতে হয় তাহা নহে; যজমানের যাহা কিছু থাকে সবই দান করিতে হয়। বৃদ্ধ, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, গাভী-সকলও দিতে হয়। নচিকেতা ইহা না জানায় মনে মনে ভাবিলেন যে পিতার কল্যাণসাধন করাই পুত্রের কর্ত্তব্য, সুতরাং তাঁহার শরীরের

বিনিময়েও যদি পিতার কল্যাণ হয় তাহাও তাঁহার করা উচিত সেইজন্য পিতাকে সম্বোধন করিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ, মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥

নচিকেতা স্বীয় পিতাকে তিনবার বলিলেন, "পিতঃ, আমাকে আপনি কাহাকে প্রদান করিবেন ?" পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আরুণি বলিলেন— "তোমাকে আমি যমকে প্রদান করিব।"

পিতার ঐরূপ উক্তি শ্রবণে নচিকেতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পিতা ত আমাকে স্নেহ করেন, তাঁহার নিকট যে সব ব্রহ্মচারী অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের মধ্যে আমি প্রথম স্থান কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। আমি কখনই তাঁহার নিকৃষ্ট শিষ্য নই ; তবে পিতা আজ কেন আমাকে বলিলেন তোমাকে যমকে প্রদান করিব ! এমন কি কর্ত্তব্য আছে যাহা তিনি আমাকে যমকে প্রদান করিয়া আমাদ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছুক। নচিকেতা মনে মনে বার বার বলিতে লাগিলেন—

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিৎ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥

মহর্ষি বাজশ্রবসঃ সত্যবাদী ও সত্যসংকল্প। তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত বাণী মিথ্যা হইবার নহে। তিনি যখন একবার নচিকেতাকে বলিয়াছেন, "তোমাকে মৃত্যুকে প্রদান করিব" তখন নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট যাইতেই হইবে। কিন্তু পুত্রের প্রতি ক্রোধবশে যাহা বলিয়াছেন সেইজন্য তিনি শোকার্ত্ত হইলেন। পিতাকে শোকাকুল দেখিয়া নচিকেতা পুনরায় পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্য মিবাজায়তে পুনঃ ।।

আমাদের পিতৃপিতামহগণ যেরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখুন। তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপর ছিলেন। তাঁহারা কখনও জীবনে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আরও দেখুন বর্ত্তমান সময়ে সাধু সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণ কিভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী এবং সত্যনিষ্ঠা। যাঁহারা অসাধু তাঁহাদেরই কথার ঠিক থাকে না। সেই অসত্যবাদী অসাধু ব্যক্তিগণ ব্রীহিযবাদি শস্যের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্বীয় কুকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং স্বল্পকালস্থায়ী মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া মিথ্যাচার সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই করুন।

মহর্ষি আর কি করিবেন, নচিকেতাকে যমের বাড়ী যাইতেই দিতে হইল। এই যমের বাড়ী কোথায়? আমাদের পুরাণে পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে সাতটি লোক বা জগৎ এবং পৃথিবীর নীচে সাতটি লোক বা জগৎ কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পৃথিবীর নীচে সাতটি লোক এবং ভূঃ ও ভুবঃলোক পর্য্যন্ত যমের অধিকার। চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে নয়টি ভুবনের প্রাণিগণকে যমালয়ে যাইতেই হইবে। অবশিষ্ট স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্ এই পাঁচটী ভুবন যমরাজের অধিকারের বাহিরে। সুতরাং যমের বাড়ী এই নয়টী ভুবনের মধ্যে কোথাও হইবে। পুরাণে যমের পুরীর বর্ণনা আছে। তাঁহার পুরীতে পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্মকারীদিগের আবাসস্থান আছে। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্ম করেন তাঁহাদের জন্য যমপুরীর উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে নানাবিধ সুখকর ভোগ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ বাসস্থান নির্ম্মিত আছে। তাঁহারা সেই সব স্থানে গমন করিয়া নিজ নিজ

পুণ্যোচিত ভোগদ্রব্য সম্ভোগ করিয়া সুখে অবস্থান করেন। কিন্তু যাঁহারা পাপী তাঁহাদের জন্য যমপুরীর দক্ষিণভাগে অতি ভয়াবহ, যন্ত্রণাদায়ক রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকসমূহ নির্ম্মিত রহিয়াছে। পাপীরা সেই সব নরকসমূহে অবস্থান করিয়া নিজ নিজ পাপকর্ম্মের জন্য দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। যমরাজ পুণ্যাত্মা, আমাদের তুলনায় তিনি অমর। কিন্তু তাঁহার এই যমপদেরও পরিবর্ত্তন হয়। অন্য কেহ সুকৃতিশালী ব্যক্তি নিজ পুণ্যবলে যখন যমপদ পাইবার উপযুক্ত হন তখন পূর্ব্ব যমরাজ অন্যলোকে গমন করেন এবং তাঁহার স্থানে নূতন যমরাজ নিযুক্ত হন। মৃত্যুরহস্য যমরাজ বিশেষরূপে অবগত আছেন কারন সুতল, বিতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল হইতে ভূ, ভুবলোক পর্য্যন্ত নয়টী জগতের প্রাণিগণের শারীরিক, মানসিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মের হিসাব তাঁহাকে রাখিতে হয়। সুতরাং যমরাজই মৃত্যুরহস্যের উপযুক্ত বক্তা। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে নচিকেতা সশরীরে যমরাজের বাড়ী গিয়াছিলেন কিংবা স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়া যমরাজের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন। নচিকেতার জীবনী আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে নচিকেতা স্থূলশরীর পরিত্যাগ না করিয়াই যমপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নচিকেতার যমপুরী গমন হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে নচিকেতার বাসস্থান হইতে যমপুরী বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না। তাহা হইলে এই যমপুরী আমাদের এই পৃথিবীতেই অবস্থিত ছিল। অথবা ইহাও হইতে পারে যে নচিকেতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সূক্ষ্মশরীরে যমপুরী গমন করিয়া যমের নিকট হইতে মৃত্যুরহস্য অবগত হইয়া পুনরায় তাঁহার মৃতদেহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সম্ভবপর নহে; কারন তাহা হইলে নচিকেতার মৃতদেহ নিশ্চয়ই দাহ করা হইত, কিন্তু তাহাত হয় নাই। তবে আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকা মাত্র। আখ্যায়িকার সব খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করিতে গেলে সে আর

আখ্যায়িকা থাকে না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ঋষি যাহা বলিতেছেন তাহার মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা যে নিছক কল্পনা তাহাই বা কি করিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য আখ্যায়িকার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। আখ্যায়িকার দ্বারা কোন দুরূহ সূক্ষ্মতত্ত্ব শ্রোতাদিগের মনে সহজে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারা যায়। সুতরাং আখ্যায়িকা সত্যের একটা প্রতীক। সত্যকে ব্যাখ্যা করিবার একটা শৈলী, একটা প্রণালী, একটা উপায় হইতেছে আখ্যায়িকা। নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয়, পিতাকর্তৃক যমালয়ে গমনের আদেশ, নচিকেতার যমালয়ে গমন এই সব ঘটনার মধ্যে কোন্ সত্য লুকাইয়া আছে? এই সব ঘটনা যে সত্যের প্রতীক তাহা জানিতে হইলে প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনার আবশ্যক। বর্তমান শিক্ষা মানুষের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতেই সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের পরীক্ষা ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় সেই জ্ঞানসমূহ চিত্তে সঞ্চিত করা হয়। বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানদ্বারা মানবের মনকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা পরীক্ষিত বাহিরের কতকগুলি সংবাদ শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব বর্তমান শিক্ষার বাহিরে। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি অন্যরূপ ছিল। শিক্ষার্থী অষ্টম হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে গুরুকুলে প্রেরিত হইত। সেখানে শিক্ষার্থীর হইত উপনয়ন। 'উপ' মানে সমীপে এবং 'নয়ন' মানে লইয়া যাওয়া। যে অনুষ্ঠান, যে পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার্থীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্যের সমীপে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইত তাহাকে উপনয়ন বলিত। গুরুকুলে শিক্ষার্থীকে প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত। 'ব্রহ্ম' মানে বেদ, ব্রহ্ম মানে বেদ-প্রতিপাদ্য সত্য। বৈদিকযুগে অগ্নিকেও ব্রহ্ম বলা হইত। এই অগ্নি ছিল 'অঙ্গানাং রসঃ' শরীরের সার বস্তু। 'অগ্নি র্জ্যোতিঃ, 'জ্যোতিরগ্নিঃ' অগ্নি ছিল জ্যোতিঃ। গুরু বা আচার্য্য শিক্ষার্থীর অন্তঃ-

শরীরে এই অগ্নি বা জ্যোতির উদ্বোধন করিয়া দিতেন। এই অগ্নি বা জ্যোতি মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া মস্তক ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইত এবং ঊর্দ্ধ হইতে পুনরায় অন্তঃশরীর উদ্ভাসিত করিয়া মূলাধার ভেদপূর্ব্বক নিম্নদিকে গমন করিয়া উপবিষ্ট শিক্ষার্থীর নিম্নভাগ বহুদূর পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিত। এই জ্যোতি অন্তঃশরীরে সূর্য্যরূপে, চন্দ্ররূপে এবং বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ পাইত। ইহা ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিক্ষার্থীর অধঃ, ঊর্দ্ধ, সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে বহুদূর বিস্তৃত এক আকাশের অভিব্যক্তি করিয়া সেই অন্তঃ আকাশকে দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত। শিক্ষার্থী অন্তঃশরীরের এই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জ্যোতিতে হোম বা আত্মনিবেদন করিত; দৈবী শক্তি অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত এই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জ্যোতি বা ব্রহ্মের নিকট এবং ইহার বিভিন্ন বিকাশ অন্তঃশরীরে সূর্য্য, চন্দ্র বা সোম এবং বিদ্যুৎ বা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রার্থনা করিত। কোন্ মন্ত্রদ্বারা কোন্ দৈবী শক্তি লাভ করিতে হয় গুরু বা আচার্য্য তাহা শিক্ষার্থীকে উপদেশ করিতেন। শিক্ষার্থীও দেখিত যে তাহার অন্তঃশরীরের দিব্য শুভ্রজ্যোতি যে শুধু নিজেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছে তাহা নহে, তাহার ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের, স্থূল শরীরের, মনের পরিচ্ছিন্নতা, সীমাবদ্ধতা দূর করিয়া তাহাতে জ্ঞান, আনন্দ, শক্তির অধিকতর বিকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা তরেকেই শিক্ষার্থীর দিব্যজ্ঞান হইত, দিব্যশক্তিসমূহ তাহাতে আসিয়া প্রবেশ করিত এবং জাগতিক পদার্থসমূহের তত্ত্ব সে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হইত। "বৃহত্বাৎ, বৃংহনত্বাৎ আত্মা ব্রহ্মেতি গীয়তে"। সেইজন্য অন্তঃশরীরের এই দিব্য বৃহৎ শুভ্রজ্যোতিকে ব্রহ্মনামে অভিহিত করা হইত। শিক্ষার্থীর মন সর্ব্বদা এই ব্রহ্মে বিচরণ করিত। তাহার ফলে শিক্ষার্থীর মন, ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও প্রাণের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া যাইত এবং শিক্ষার্থীর বিশুদ্ধমনে সত্যের সম্যক্ বিকাশ হইত। শিক্ষার্থী এইরূপে মেধাবী, ওজস্বী, শক্তিশালী

হইয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া ধন্য হইত। কিন্তু এখন বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষকে যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাতে মানুষ অর্দ্ধমনুষ্যে, সিকি মনুষ্যে, এবং পশুতে পরিণত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতে মানবীয় মনস্তত্ব উপেক্ষিত। কেবল বাহিরের কতকগুলি সংবাদের বোঝা শিক্ষার্থীর মনে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। মনকে শক্তিশালী করিতে হইলে মনের বিশুদ্ধির প্রয়োজন এবং মনের এই বিশুদ্ধি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অষ্টম বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীকে যম, নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুর নিকট বাস করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্য পালনদ্বারা শক্তিসঞ্চয় করিয়া সামাজিক জীবনে মানুষ সেই শক্তিকে নিজের সমাজের ও বিশ্বের কল্যাণে নিযুক্ত করিত। মানুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর শক্তির আধার। কেবলমাত্র অন্নকে, তমঃকে শক্তির মূল বলিয়া মনে করিলে তাহা সম্যক-দর্শন হইবে না। এইজন্য বৈদিকসমাজে, অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞানকে শক্তির ক্রমিক অভিব্যক্তিরূপে বর্ণনা করিয়া আনন্দে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র অন্নকেই শক্তির আধার ও মূল উৎসরূপে দেখিতে শিক্ষার্থীগণকে উপদেশ করা হয়, সেইজন্য শিক্ষার্থীরা একটা গোটা মানুষ, একটা পূর্ণ মানুষ হইতে পারে না। সেইজন্য বর্তমান মানবসমাজে শিক্ষার্থীগণ উচ্ছৃঙ্খল, মৌলিক-চিন্তা-বিহীন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের ও সমাজের প্রভূত অকল্যাণ করিতেছে। পূর্ব্বে যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিয়া শিক্ষার্থীর তমঃপ্রধান শক্তিকে দিব্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হইত সেই প্রণালী হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য। রেতঃ বা শুক্রের মধ্যেই দিব্যশক্তি বর্তমান। শুক্র ধারণ করিয়া পূর্ব্বে এই দিব্যশক্তি বা তেজ বা ব্রহ্মবর্চ্চসকে বর্দ্ধিত করা হইত। এই ব্রহ্মবর্চ্চসই হইতেছে অগ্নি বা জ্যোতি। এই তেজ বা জ্যোতি বা অগ্নি বা পার্থিব শক্তি ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎ, ওজ বা ইন্দ্র

শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া শিক্ষার্থীর মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের মলিনতা দূর করিয়া শিক্ষার্থীকে আত্মবলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিত। শিক্ষার্থী এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বীর্য্যলাভ করিত। বাহির হইতে জ্ঞান লাভ করিতে হইত না; কারণ সমুদয় জ্ঞানই চিত্তে সঞ্চিত রহিয়াছে, শিক্ষাদ্বারা চিত্তের মল বা রজস্তমঃ দূরীভূত করিয়া দিলে সত্ত্ব-প্রধান চিত্তে সম্যক্ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হইত। প্রাচীন সময়ে ব্রহ্মচারীদিগকে নিয়ম পূর্ব্বক 'যম' শিক্ষা করিতে হইত। নিয়ম পূর্ব্বক যমের অনুশীলনে চিত্ত বিশুদ্ধ হইত এবং সেই বিশুদ্ধচিত্তে আপনা হইতেই জগতের যাবতীয় রহস্যের সম্যক্ জ্ঞান প্রতিভাত হইত। নিয়মপূর্ব্বক যমের অনুশীলন না করিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। সকল তত্ত্বজিজ্ঞাসুকেই যমের দ্বারস্থ হইতে হয়। মহর্ষি বোধ হয় সেইজন্য নচিকেতাকে নিয়ম পূর্ব্বক যমের অনুশীলন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং নচিকেতা পিতৃ আদেশ পালন করিয়া যজ্ঞের ও জীবনের রহস্য অবগত হইয়াছিলেন। এই সত্য ক্রমে ক্রমে আখ্যায়িকায় আসিয়া অন্যরূপ ধারণ করিতে পারে। যাঁহারা আত্মবিদ্, স্বীয় নির্ম্মল বিশুদ্ধচিত্তে যাহারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাকে যাহা বলেন তাহা তৎক্ষণাৎ সফল হইয়া থাকে। তাঁহাদের সংকল্প অমোঘ, কোন বাধা কোন প্রতিবন্ধ তাঁহাদের সংকল্পকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন—

> যে ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্
> তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।
> স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাৎ এব অস্য
> পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো

মহীয়তে * * * * * * * যং কামং কাময়তে
সঃ অস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি। ছাঃ উপ

যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, কেবল বুদ্ধি দ্বারা নয়, কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের উপর আধিপত্য করিতে পারেন। তিনি যদি পিতৃলোকে যাইতে অভিলাষী হন তাহা হইলে পিতৃলোকের সঙ্কল্প করিবামাত্রই পিতৃলোক সহিত পিতৃগণ তাঁহার সমীপে আসিয়া আবির্ভূত হন। তিনি যে কামনারই সঙ্কল্প করুন না কেন তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই সেই সেই কাম্যজগৎ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়। কুমার নচিকেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; তাঁহার চিত্তও বিশুদ্ধ। ওজস্বী, তেজস্বী, বীর্য্যবান্ নচিকেতা সত্য-সংকল্প। সুতরাং তিনি যখনই সংকল্প করিলেন যে তিনি যমলোকে যাইবেন তখনই তিনি যমলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। স্থূল জগতের কোন বাধাই, স্থূল জগতের দেশ কাল সম্বন্ধীয় কোন নিয়মই সত্য-সংকল্প যোগী পুরুষের সংকল্পকে বাধা দিতে পারে না।

"পৃথ্ব্যাপ্ তেজোঽনিল খে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো, ন জরা, ন মৃত্যুঃ,
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥ [শ্বেত-উপ]

যখন পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের তত্ত্ব যোগীর আয়ত্তাধীন হয়, তখন স্থূল সূক্ষ্ম উভয় জগতের উপরই যোগীর প্রভুত্ব জন্মে। তমঃ আর তখন জীবন ও চেতনাকে কবলিত করিতে পারে না, তখন যোগরূপ অগ্নি দ্বারা যোগীশরীরের তমঃ রূপ মল দগ্ধ হইয়া যায়; যোগী তখন রোগ, জরা ও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই এই অবস্থা লাভ করা

যায়। সুতরাং মেধাবী, ওজস্বী, বীর্য্যবান্, তেজস্বী ব্রহ্মচারী নচিকেতা সংকল্প মাত্রই যমপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে প্রাকৃত লোকের মত স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া যমপুরীতে যাইতে হইল না।

সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী নচিকেতাকে আগমন করিতে দেখিয়া যমরাজের অমাত্যবর্গ সসম্ভ্রমে নচিকেতাকে অভ্যর্থনা করিলেন। নচিকেতা আসনোপরি উপবিষ্ট হইলে যমরাজের মন্ত্রী পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া নচিকেতাকে পূজা করিবার জন্য উপস্থিত হইলে নচিকেতা বলিলেন "আমি যমরাজের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। যমরাজের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার পর আমি পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিব।" নচিকেতার বাক্য শ্রবণ করিয়া যমরাজের অমাত্যগণ বলিলেন—"ব্রহ্মন্, আমাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া আসিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে যমরাজ গৃহে নাই। তিনি গৃহে থাকিলে পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা তিনিই আপনার সৎকার করিতেন। কয়েকদিন হইল তিনি অন্যত্র গমন করিয়াছেন, পুরীতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া নচিকেতা বলিলেন— "যতদিন যমরাজ এই পুরীতে প্রত্যাগমন না করেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয়, ততদিন আমি এই আসনেই উপবিষ্ট থাকিব। আপনারা পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া প্রস্থান করুন।" যমরাজের স্ত্রী ও অমাত্যগণ নচিকেতার এইরূপ সংকল্প শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী নচিকেতা সেই যমপুরী মধ্যে ধীর স্থির হইয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। সমস্ত যমপুরী মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব প্রকাশ পাইল। যমরাজের আত্মীয় স্বজন অতিশয় চিন্তিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৈদিকসমাজে অতিথি-সেবা গৃহীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অতিথিকে সকলের হইতে পূজ্যতম বলিয়া জ্ঞান করা

হইত। "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ" যিনি অতিথি তিনি গুরুরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। গৃহের বা পরিবার মধ্যে যিনি কর্ত্তা, তিনি সস্ত্রীক অতিথিকে প্রতিদিন সৎকার এবং প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তদনন্তর স্বয়ং আহার করিতেন। দানের মধ্যে অন্নদান ও বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন গৃহস্থই অতিথিকে বিমুখ করিতেন না। অতি-সমাদরের সহিত অতিথিকে পূজা করা হইত। প্রত্যেক গৃহস্থই অতিথির তৃপ্তিসাধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। এইরূপই ছিল বৈদিকসমাজের শিক্ষা। বৈদিকসমাজে যে সব আচার প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটীই মানবের কল্যাণ সাধন করে। সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতে পিতা ও মাতার সুপুত্রলাভের জন্য শুভ সংকল্প হইতেছে সন্তানের প্রথম সংস্কার। সন্তান মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে জননীকে অভিলষিত বস্তু প্রদান এবং তাঁহার সন্তোষ বিধান হইতেছে সন্তানের দ্বিতীয় সংস্কার, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার মস্তকে পরমেশ্বরের নাম জপ, দেবতাদিগের নিকট সন্তানের কল্যাণ প্রার্থনা, স্বর্ণশলাকা দিয়া সন্তানের জিহ্বায় মধুর সহিত মন্ত্র লেখা, তৎপরে ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, হাতে খঁড়ি, গুরুগৃহে প্রেরণ, উপনয়ন ; ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সৎশিক্ষা প্রদান, বিবাহ, তর্পণ, সন্ধ্যা, আহ্নিক, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আচারগুলিদ্বারা সন্তানের চিত্তশুদ্ধিকরণ। মানবের মন এইরূপে সংস্কৃত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অবধারণ করিতে সমর্থ হইত। মানব জীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বনপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারিভাগকে চারিটী আশ্রম বলিত। আশ্রম মানে যেখানে সর্ব্বতোভাবে শ্রম করিয়া সেই সেই বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যসমূহকে আয়ত্ত করা যায়। প্রত্যেক আশ্রমের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বা বিধিনিষেধ বা আইন কানুন, বা আচার ব্যবহার আছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্ম বা আচারগুলির মধ্যে অতিথি সেবা একটী প্রধান ধর্ম্ম। অতিথি যদি তৃপ্ত হইয়া গৃহস্থের বাটী হইতে গমন

করে তাহা হইলে গৃহস্থ অতিথির পুণ্যের অংশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় সেই বাটীর কর্ত্তা অতিথির পাপের অংশপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য যমরাজের স্ত্রী ও অমাত্যবর্গ তাঁহাদের অতিথি মেধাবী, তেজস্বী ব্রহ্মচারী নচিকেতার সেবা করিতে না পারায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। নচিকেতা এক আসনেই উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মন একাগ্র, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে তাঁহার চিত্ত এখন আর ধাবিত হয় না। একমাত্র যমরাজের সাক্ষাৎ-কাররূপ বৃত্তিই তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা নচিকেতার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এইরূপে অন্নজল পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিয়া নচিকেতা তিনদিন তিনরাত্রি যমরাজের গৃহে অনশনে অতিবাহিত করিলেন। চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে যমরাজ আসিয়া স্বগৃহে উপনীত হইলেন। যমরাজকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিলেন—অগ্নিতুল্য তেজস্বী এক ব্রাহ্মণকুমার আমাদের গৃহে আজ তিনদিন তিনরাত্রি হইল অবস্থান করিতেছেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে তিনি পাদ্য অর্ঘ্য এবং অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিবেন না। তিনদিন তিনরাত্রি তিনি অনশনে আছেন; সুতরাং আপনি অগ্রে যাইয়া তাঁহাকে পাদ্যঅর্ঘ্যদ্বারা সৎকার করুন। অতিথি যদি গৃহে উপবাসী থাকেন তাহা হইলে সে গৃহের কোন মঙ্গল হয় না। যমরাজের স্ত্রীও বলিলেন—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্!

আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাং চেষ্টাপূর্ত্তেপুত্র-পশুংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥

অগ্নির ন্যায় তেজস্বা একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। অগ্নিকে উপশান্ত না করিলে সেই অগ্নি যেমন গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ যে মূঢ়ব্যক্তির গৃহে অতিথি আদৃত না হইয়া উপবাস করিয়া অবস্থান করেন তাঁহার অজ্ঞাতবস্তুবিষয়ক কামনারূপ আশা এবং জ্ঞাতবস্তু বিষয়লাভের কামনারূপ প্রতীজ্ঞা, সব নষ্ট হয়। গৃহে অতিথির অনশনে অবস্থান মানুষের সৎসঙ্গ-জনিত শুভফল, ইষ্টা-পূর্ত্তের অনুষ্ঠানহেতু পুণ্য, এমন কি সন্তানসন্ততি গো অশ্বাদি সবই নষ্ট করিয়া দেয়। সেই জন্য হে সূর্য্যপুত্র যমরাজ, তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অতিথি ব্রাহ্মণকুমারকে পাদ্য অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা কর। যমরাজ অমাত্য ও স্ত্রীর নিকট অতিথির আগমন এবং তাঁহার তিনরাত্রি অনশনে অবস্থান জ্ঞাত হইয়া আর বিলম্ব করিলেন না। পাদ্য অর্ঘ্যাদি লইয়া সত্বর নচিকেতা সমীপে উপনীত হইলেন।

মানবের মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সবই অনন্ত। এক অনাদি অনন্ত ভগবৎ-শক্তির বিভিন্ন বিকাশ হইতেছে জগৎ ও জীব। সত্ত্বরজস্তমোময়ী এই শক্তির পরিণামই আকাশ, বায়ু প্রভৃতি রূপে সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, বাহিরের দৃশ্যজগৎ এবং আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়। এই জন্য এক ব্যক্তির মনের সহিত অপর ব্যক্তির মনের সংযোগ রহিয়াছে। একব্যক্তি যদি তাহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে অপর ব্যক্তির প্রতি আশীর্ব্বাদ কিংবা অভিশাপ প্রদান করে তাহা হইলে সেই আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপ অপর ব্যক্তিতে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সেইজন্য অতিথি যদি অন্ন জল না খাইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অতিথির হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে যে বিরক্তি যে বেদনা উত্থিত হয় তাহা গৃহস্থের জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, তাহার হৃদয়ে বাজিয়া উঠে এবং তাহার অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। অতিথি যে আশা লইয়া গৃহস্থের বাটীতে আগমন করিয়াছিল, তাহার সে আশা ভঙ্গ হওয়ায় গৃহস্থেরও আশা

পূর্ণ হয় না। অতিথিকে বিমুখ করা হেতু গৃহস্থের হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে এবং সে সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারে না। সৎসঙ্গের অভাব হেতু তাহার চিত্ত তমঃপ্রধান হয় এবং সেই তমঃপ্রধান চিত্তে সম্যক্‌জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না। মন বিবেকও বিচারক্ষম না হওয়া হেতু তাহার গৃহ অশান্তিতে ভরিয়া উঠে। গৃহে বিশৃঙ্খলা হেতু ক্রমে ক্রমে তাহার ইষ্টবিয়োগ ও ঐশ্বর্য্য হানি হইতে থাকে সেইজন্য যমরাজ গৃহে আগমন করিবামাত্রই তাঁহার স্ত্রী প্রথমেই নচিকেতাকে পাদ্য অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিতে যমরাজকে অনুরোধ করিলেন। যমরাজ পাদ্যঅর্ঘ্য লইয়া নচিকেতা যেখানে উপবিষ্ট আছেন সেইস্থানে গমন করিয়া সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ব্রহ্মচারী নচিকেতাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন। নচিকেতাও যমরাজকে দর্শন করিয়া অতীব পুলকিত হইলেন। অনন্তর নচিকেতা যমপুরীতে তাঁহার আগমনের কারণ যমরাজকে নিবেদন করিলে যমরাজ প্রীত হইয়া নচিকেতার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নচিকেতা স্নানাহার শেষ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলে, যমরাজ পুনরায় নচিকেতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

তিস্রো রাত্রি র্যদবাৎসী র্গৃহে মে
অনশ্নন্ ব্রহ্মন্ অতিথি র্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মে অস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥

হে ব্রহ্মন্, তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে আমার মঙ্গল হোক্। পূজনীয় অতিথিরূপে তুমি যে আমার গৃহে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া অবস্থান করিয়াছ, সেইহেতু প্রত্যেক রাত্রির জন্য এক্ একটী করিয়া তিনটী বর আমার নিকট প্রার্থনা কর।

কুমার নচিকেতা তাঁহার প্রতি যমরাজের সদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট

হইয়া যমরাজকে বলিলেন, "আপনি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন তখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার আদেশ অনুসারে আপনার নিকট আমি তিনটী বর প্রার্থনা করিতেছি। তিনটী বরের মধ্যে প্রথম বরটী এই—

শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ
বীতমন্যু র্গৌতমো মাভিমৃত্যো।
ত্বৎ প্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ
এতৎ ত্রয়ানাং প্রথমং বরং বৃণে॥

আমি গৃহত্যাগ করিয়া যে এখানে আসিয়াছি তাহাতে আমার পিতা গৌতম নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন; তিনি নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন "আমার পুত্র যমপুরীতে যাইয়া না জানি কি করিতেছে!" সেইজন্য আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা—আমার সম্বন্ধে আমার পিতার যাবতীয় উৎকণ্ঠা যেন দূরীভূত হয়, তিনি যেন শান্তসংকল্প হন, তাঁহার মন যেন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, তিনি পূর্ব্বে যেমন আমার প্রতি প্রসন্ন-চিত্ত ছিলেন, আমার প্রতি যেন সেইরূপ প্রসন্ন থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে, তাঁহার সেই ক্রোধ যেন উপশান্ত হয়। যখন আপনি আমাকে স্বগৃহে প্রেরণ করিবেন তখন আপনার নিকট হইতে আমি পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন যে আমি তাঁহার পুত্র যমালয় হইতে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমার তিনটী বরের মধ্যে এইটীই আমার প্রথম বর।

যমরাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পর নচিকেতা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতা যখন সর্ব্বদক্ষিণ যজ্ঞ করিতেছিলেন তখন যজ্ঞতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া তাঁহার কার্য্যে ত্রুটিদর্শন করা

তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু নচিকেতা যাহাতে পিতার কল্যাণ হয় নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিলেও তাঁহার চিত্ত হইতে ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই; শোক ও মোহও অল্প-পরিমাণে তাঁহার চিত্তে বর্ত্তমান আছে, তখন পিতার কল্যাণকামী নচিকেতা প্রথমেই যমরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহার পিতার মন শান্ত হয়; চিত্ত শান্ত না হইলে কখনই চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। শান্তমনা পুরুষই স্ব-স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়। তখনই তাহার চিত্ত হইতে রজস্তমোমল দূরীভূত হইয়া যায়। তখন তাহার মন দিব্য হয়, প্রাণ দিব্য হয়, শরীরও দিব্যভাব ধারণ করে। সেইজন্য নচিকেতা প্রথমেই যমরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার পিতা যেন সুমনা ও শান্তসংকল্প হন; পুত্রবিয়োগ জনিত শোকমোহ যেন তাঁহাকে বিচলিত করিতে না পারে। ক্রোধ যেন তাঁহার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় এবং সুমনা, শান্তসংকল্প বীতমন্যু তাঁহার পিতা যেন যমপুরী হইতে প্রত্যাগত তাঁহার পুত্র নচিকেতাকে আশীর্ব্বাদ প্রদানে কৃতার্থ করেন। নচিকেতার প্রার্থনায় যমরাজ প্রীত হইয়া বলিলেন—

যথা পুরস্তাৎ ভবিতা প্রতীতঃ
ঔদ্দালকিরারুণি র্ম‍ৎ প্রসৃষ্টঃ।
সুখংরাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুঃ
ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥

যমরাজ বলিলেন—তোমার পিতা পূর্ব্বে যেরূপ তোমার প্রতি প্রসন্ন ও স্নেহপূর্ণ ছিলেন আমার বরে উদ্দালকের ঔরসে অরুণার গর্ভজাত তোমার পিতা ঔদ্দালক আরুণি তোমার প্রতি সেইরূপ স্নেহপূর্ণ হইবেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার চিত্ত ক্রোধশূন্য হইবে এবং তিনিও প্রসন্নচিত্তে

আগামী রজনীসমূহে সুখে নিদ্রা যাইবেন। তুমি যখন যমপুরী হইতে আমার আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে তখন তোমার পিতা তোমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবেন এবং প্রসন্ন মনে তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন।

নচিকেতা যমরাজের উক্তি শ্রবণে সফল মনোরথ হইয়া দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তি,
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা্শনয়া পিপাসে,
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥
স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে
এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥

স্বর্গে কোন ভয় নাই; সেখানে আপনি (মৃত্যু) নাই; স্বর্গবাসী জরা হইতে ভীত হন না। ক্ষুধা পিপাসা এবং শোককে অতিক্রম করিয়া তিনি স্বর্গলোকে আনন্দে অবস্থান করেন। হে মৃত্যো, হে যমরাজ, আপনি এই স্বর্গ-প্রাপক অগ্নিতত্ত্ব সম্যক অবগত আছেন; সুতরাং শ্রদ্ধাশীল আমাকে স্বর্গ-সাধন সেই অগ্নিতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। যাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করেন তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আমি দ্বিতীয় বর দ্বারা আপনার নিকট ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

মানুষ যখন হইতে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই তাহার

জ্ঞান-প্রবুদ্ধ মনে জাগিয়া উঠিয়াছে অমরত্বের আকুল আকাঙ্ক্ষা। সে তাহার সত্তাকে নিত্য, চিরস্থায়ী করিতে অভিলাষী হইয়াছে। অমৃতত্বলাভের এই অদম্য স্পৃহা মানবমনে কেন জাগরিত হইল? এই অভিলাষের কারণ হইতেছে সুখভোগ স্পৃহা। মানুষ বিষয়ভোগ করিয়া আনন্দ পায় কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হয় না। স্থূলশরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই সব দিয়া মানুষ তাহার এই বিষয়জনিত ক্ষণিক আনন্দ ভোগ করে। কিন্তু যখন সে দেখে তাহার স্থূল শরীর ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়া বিষয়ভোগে অপটু হইতেছে, ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে তখন তাহার মনে জাগিয়া উঠে অমর জীবনের আস্পৃহা। মানুষ তাহার স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে অল্পজ্ঞান, অল্প আনন্দ, অল্পশক্তি লাভ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। তাই সে অনন্ত জীবন, সর্ব্বজ্ঞতা, অফুরন্ত আনন্দ এবং অব্যাহত শক্তি লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। তাহার ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া সে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছে; রাবণের ন্যায়, হিরণ্যকশিপুর ন্যায়, বলির ন্যায় বহিঃ প্রকৃতির উপর আধিপত্য-বিস্তার করিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া সে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষয়ভোগ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই। মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। তখন তাহার চিত্তে আসিয়া উদিত হইয়াছে মৃত্যুজয়ের অভীপ্সা। মৃত্যুকে জয় করিবার উপায় সমূহ সে একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধান করিয়াছে। এই অনুসন্ধানে সে সফলকাম হইয়া মৃত্যুজয়ের দুইটী পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। সেই দুইটী পন্থার মধ্যে একটী উপায় বা পন্থা হইতেছে অগ্নি। অন্তঃশরীরে অগ্নির উদ্বোধন। নচিকেতা যমের নিকট এই অগ্নিতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। অগ্নি এখানে জড় অগ্নি নয়। অগ্নি হইতেছেন অঙ্গানাং রসঃ, মনুষ্যশরীরের সারবস্তু। চেতন জ্যোতিই অগ্নি। মনুষ্যের অন্তঃশরীরের এই চেতনজ্যোতিরূপ অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়। এই অগ্নি প্রবুদ্ধ

না হইলে কোন দৈবিককার্য্য সম্পন্ন হয় না। আচার্য্য বা গুরু শিষ্যের অন্তঃশরীরে এই অগ্নিকে, এই শুভ্র, দিব্য জ্যোতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া দেন। এই দিব্যজ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত করা বড় কঠিন,কিন্তু ইহা একবার প্রজ্জ্বলিত হইলে কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। এই জ্যোতি অন্তঃশরীরে প্রকাশিত হইয়া সাধকের অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় বিজ্ঞানময় কোষকে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীরে পরিণত করে। তখনই সাধকের জীবন দিব্য আনন্দময় হইয়া উঠে। স্বর্গ বা অমৃত বা নিরতিশয় আনন্দধামের দ্বার সাধকের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়। সাধক তখন দেশ কালের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। জন্ম মৃত্যু, শোক মোহ তাঁহাকে আর অভিভূত করিতে পারে না। তিনি শোকাতিগ হইয়া নিরতিশয় আনন্দধাম স্বর্গে মহানন্দে অবস্থান করেন। সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার হয় অর্থাৎ তিনি সশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিচরণ করিতে সমর্থ হন। নচিকেতা যমরাজকে এই অগ্নিরহস্য বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে যমরাজ তাঁহার অন্তশরীরে এই দিব্য শুভ্র জ্যোতির উদ্বোধন করিয়া দেন তাহাই প্রার্থনা করিলেন। তিনি নিত্য ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন করিতেছেন, তিনি সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ সুতরাং তাঁহাকে এই অগ্নির উদ্বোধন করিতে যমরাজের কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। শ্রুতি বলেন—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ ॥

সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যাঁহারা সংযমী, যাঁহাদের চিত্ত হইতে রজস্তমোরূপ সমুদয় দোষ দূরীভূত হইয়াছে তাঁহারাই অন্তঃশরীরে এই শুভ্র জ্যোতিস্বরূপ

আত্মাকে দর্শন করেন। সাধকের তখন অপূর্ব্ব অনুভূতি হইয়া থাকে। দেশ কাল, সমগ্র বিশ্ব তাঁহারাই অঙ্গীভূত এইরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি তাঁহার হইতে থাকে। সর্ব্বত্র নিজেকে অনুস্যূত অবলোকন করেন। সুতরাং দেশ কাল তাঁহার সংকল্পের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। “যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি। বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্”। বিশুদ্ধসত্ত্ব, সংযমী, সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীর পবিত্র মনে যখনই যে যে সংকল্পের উদয় হয় তখনই তাঁহার সেই সেই সংকল্প সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে অগ্নি মানুষকে নিরতিশয় আনন্দ বা স্বর্গকে প্রাপ্ত করাইয়া দিতে পারে, দ্বিতীয় বর দ্বারা নচিকেতা যমরাজের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিলেন।

যমরাজ নচিকেতার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কিরূপে এই জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্যময় অগ্নিকে অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিতে হয় সেই প্রণালী শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন—

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ,
স্বর্গ্যং অগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্ত লোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাম্,
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥

নচিকেতার মনকে একাগ্র করিবার জন্য যমরাজ এই দিব্য অগ্নি বা জ্যোতির প্রশংসা করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন—নচিকেতা, তুমি স্বর্গ-সাধন যে অগ্নি বা দিব্য শুভ্র জ্যোতিস্তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইয়াছ তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। সেই অগ্নিতত্ত্ব আমি তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি তুমি অতিশয় মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ কর। এই অগ্নিই অনন্ত লোকপ্রাপ্তির উপায়। এই অগ্নিবিদ্যা অবগত হইলে

মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দিব্য অনন্ত জীবন লাভ করে, তখন সর্ব্বজগতে তাহার অব্যাহত গতি হয়। কারণ এই দিব্য অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিকেই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। এই চৈতন্যজ্যোতিকেই অবলম্বন করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এই অগ্নিতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হইলে জগতের রহস্য অবগত হওয়া যায়। জগতের উপর তখন প্রভুত্ব জন্মে; দেশ কাল তখন আর জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জন্মমৃত্যুদ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ তখন দিব্য অনন্তজীবন লাভ করিয়া অমৃত বা নিরতিশয় স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই অগ্নিকে পর্ব্বত গহ্বরে অনুসন্ধান করিতে হইবে না; নীল আকাশে কিংবা সুনীল জলধি জলে ইহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না; মন্দিরে মন্দিরে, আশ্রমে আশ্রমে, গ্রন্থসমূহে এই দিব্য অগ্নিকে অনুসন্ধান করিতে যাইতে হইবে না। কারণ তুমি নিশ্চয় জানিও এই দিব্য অগ্নি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় নিহিত আছে। এখন এই অগ্নিকে, এই দিব্য চৈতন্য-জ্যোতিকে যেন সুপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া এই সুপ্তপ্রায় অগ্নিকে তোমার অন্তঃশরীরে কিরূপে উদ্বোধিত করিতে হয় সেই প্রাণালী তোমাকে উত্তমরূপে প্রদর্শন করিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হও।

এই যে অগ্নি, এই যে তেজ বা জ্যোতিঃ, যে দিব্য চেতন জ্যোতিঃ মানুষকে নিরতিশয় সুখের অধিকারী করিয়া দেয়, সেই অগ্নি, সেই দিব্য চৈতন্যজ্যোতি গুহাতে নিহিত রহিয়াছে। গুহা যেরূপ পর্ব্বতের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত সেইরূপ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় কোষ অতিক্রম করিয়া মানুষের অন্তরতম বিজ্ঞানময় কোষই গুহা। মানুষের এই বিজ্ঞানময় কোষেই এই চৈতন্যজ্যোতিরূপ অগ্নি নিহিত রহিয়াছে। বিজ্ঞানময় কোষ শুদ্ধসত্ত্ব হইলে এই চৈতন্য-

জ্যোতির বিকাশ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা যায়। চৈতন্যজ্যোতিকে জাগরিত করিবার সাধারণতঃ কয়েকটি পন্থা আছে। প্রথম হঠযোগ। হঠযোগদ্বারা প্রথমে আসন, মুদ্রা, নেতি, ধৌতি প্রভৃতির সাহায্যে স্থূলশরীরকে শুদ্ধ করিতে হয়। উক্ত উপায়গুলির যুগপৎ অনুশীলনে ভূতশুদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ পঞ্চভূতনির্ম্মিত এই স্থূলদেহ বিশুদ্ধ হয়। স্থূলদেহকে কোন ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না, জরা বা বার্দ্ধক্যরূপ পরিণাম হয় না; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত শরীরকে অভিভূত করিতে পারে না। দীর্ঘকাল একাসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা যায়। স্থূলদেহকে এইরূপে বিশুদ্ধ করিয়া সাধক প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণময় কোষ শুদ্ধ করেন। প্রাণায়াম-প্রভাবে নাড়ীসমূহ শুদ্ধ হইয়া যায়; শক্তিপ্রবাহ অবাধে নাড়ীসমূহে চলিতে থাকে। এইরূপে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ বিশুদ্ধ হইলে সাধক মনন বা ধ্যানদ্বারা মনোময়কোষ বিশুদ্ধ করেন। এই সময়ে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে জ্যোতিরও বিকাশ হয়। কাহারও প্রথমে শব্দ বা ধ্বনি শ্রুত হয়, কাহারো বা প্রথমে জ্যোতির বিকাশ হয়, পরে ওম্ এই ধ্বনি একতান হইয়া শ্রুত হয়। কেহ এই ধ্বনিতে মনকে লয় করেন। কেহ বা জ্যোতিতে মনকে লয় করেন। মন লীন হইলে বিজ্ঞানময়কোষস্থিত চৈতন্য-জ্যোতি উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই চৈতন্যজ্যোতিতে সমাহিত হইয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে আনন্দময়কোষের বিকাশ হইতে থাকে। অবশেষে বুদ্ধি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হয় এবং সাধককে ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় আনন্দ বা স্বর্গে লইয়া যায়। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে রাজযোগ। রাজযোগেও আসন প্রাণায়ামের প্রয়োজন। কিন্তু এই যোগে আসন ও প্রাণায়ামের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ লইয়াই এই যোগের কার্য্য সুরু হয়। যোগে বিবেক ও বিচারদ্বারা নিজেকে পঞ্চকোষ হইতে পৃথক সচ্চিৎরূপে ভাবিতে হয়। আমি স্থূলশরীর নই। আমি প্রাণ

নই, আমি ইন্দ্রিয় নই, আমি মন কিংবা বুদ্ধিও নই, আমি দিব্য চৈতন্যজ্যোতিঃ ; বুদ্ধি হইতে স্থুলশরীর পর্য্যন্ত সব'ই প্রকৃতি বা শক্তি বা তমঃ বা মায়ার কার্য্য, আমি প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ; সুতরাং সুখ দুঃখ, শোক মোহ, জরা ব্যাধি, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, এগুলি আমার ধর্ম্ম নয়, আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, আমি ইহাদের সাক্ষী, ইহাদের অবভাসক। এইরূপে মনন করিতে করিতে বৈরাগ্য ও নির্লিপ্ততার উদয় হয়। তখন বিজ্ঞানময়কোষ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে এবং 'অহং' এর লক্ষ্য চিৎসুখাত্মক আত্মার প্রকাশ পায়। তখন সাধক স্বীয় আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করিয়া দিব্য নিরতিশয় আনন্দে অবস্থান করেন। তৃতীয় উপায় হইতেছে কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগে 'অহং'এর লক্ষ্যার্থ যে সৎচিৎ সুখ স্বরূপ বস্তু তাহাকে প্রথমে নিজ হইতে স্বতন্ত্ররূপে ভাবিতে হয় ; এবং তাহার সহিত একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। তিনি ঈশ্বর প্রভু ; আমি জীব, সেবক। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কিংবা মধুর এই চারিটীভাবের কোন একটি ভাব লইয়া সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। সাধনার প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে যুগপৎ ঈশ্বরের নাম জপ, তাঁহার কীর্ত্তন, তাঁহার ধ্যানের অভ্যাস করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে ঈশ্বরের হাতে, ভগবৎ-শক্তির যন্ত্রস্বরূপ ভাবিতে হয়। এইরূপ ধ্যান ও আত্মনিবেদন করিতে করিতে শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের দিকে দৃষ্টি থাকেনা, তখন এক মহা পারমেশ্বরী শক্তিই কার্য্য করিতেছে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। দেহাভিমান দূর হইয়া যায়। তখন অন্তরে, বাহিরে অধঃ ঊর্দ্ধে চৈতন্যজ্যোতির বিকাশ হয়, তৎপরে দিব্য নিরতিশয় আনন্দের সমুদ্রে সাধক নিমজ্জিত থাকিয়া মহাশক্তি বা ভগবৎ লীলার নিমিত্তমাত্র হইয়া অবস্থান করে। এই তিনটী উপায় ব্যতীত আরও

উপায় আছে। বৈদিকসমাজে আচার্য্য অষ্টম হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের অন্তঃশরীরে দিব্য চৈতন্যজ্যোতির উদ্বোধন করিয়া দিতেন এবং কি উপায়ে এই স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতির উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি হয় তাহার উপায় উপদেশ করিতেন এবং কৌশল দেখাইয়া দিতেন। এই দিব্য জ্যোতিই সাধকের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় শরীরকে দিব্য আনন্দময় শরীরে রূপান্তরিত করিয়া দিত। সাধক তখন এই জীবনেই শোকমোহ জরাব্যাধি, জন্মমৃত্যু, ক্ষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া নিরতিশয় আনন্দ বা স্বর্গে অবস্থান করিয়া জীবন সফল করিতেন। নচিকেতা দ্বিতীয় বর দ্বারা যমরাজের নিকট এই দিব্য চৈতন্যজ্যোতির উদ্বোধন কিরূপে করিতে হয় তাহারই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

নচিকেতার প্রার্থনা শুনিয়া যমরাজ প্রীত হইয়া নচিকেতাকে যাহা বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন, শুধু উপদেশ নয় তাঁহাকে কি উপায়ে এই দিব্য চৈতন্যজ্যোতির উদ্বোধন করিতে হয় তাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। মুনির তপোবনে সমাগত ঋষিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তত্ত্বজ্ঞ সম্যকদর্শী মুনি বলিলেন—

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎপ্রত্যবদৎ যথোক্তম্।
অথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥

জগতের কারণীভূত সেই অগ্নিবিদ্যা যমরাজ নচিকেতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। শরীরের যে যে স্থানে, যে যে মন্ত্রদ্বারা যে উপায়ে এই দিব্য জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যমরাজ নচিকেতাকে দেখাইয়া দিলেন; নচিকেতাও যমরাজ কর্ত্তৃক

উপদিষ্ট হইয়া ঠিক সেই সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্বীয় অন্তঃশরীরে সেই দিব্য জ্যোতির উদ্বোধন করিলেন। মন্ত্রগুলি এবং উপায়গুলিও ঠিক ঠিক আবৃত্তি করিলেন। তখন যমরাজ নচিকেতার এতাদৃশী মেধা ও ওজঃশক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন—

তমব্রবীৎ প্রীয়মানো মহাত্মা।
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ ॥
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ।
সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥

নচিকেতাকে উত্তম অধিকারী দর্শন করিয়া মহাত্মা যম প্রীত হইয়া বলিলেন, নচিকেতা তোমাকে আমি আর একটী বর প্রদান করিতেছি, সেই বরটী হইতেছে এই যে অগ্নি অদ্য হইতে তোমার নামাঙ্কিত হইয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে অর্থাৎ এই অগ্নি নাচিকেত অগ্নি নামে কথিত হইবে। তুমি বিচিত্র শব্দবতী, রত্নময়ী বহু ফলপ্রদা, অনিন্দিতা, উৎকৃষ্ট গতিপ্রাপিকা। এই অগ্নিবিদ্যরূপমালা গ্রহণ কর।

যমরাজ নচিকেতাকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত সেই "লোকাদিম্ অগ্নিম্" বুঝাইয়া দিলেন। কিরূপে এই অগ্নি বা জ্যোতিঃকে অন্তঃশরীরে প্রজ্জ্বলিত করিতে হয় তাহা অতি আদরের সহিত যমরাজ নচিকেতাকে দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নচিকেতা তাঁহার গৃহে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া যমরাজের অপরাধ হইয়াছিল। কারণ, মনু বলেন—

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥

শিলনেপ্যুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ।
সর্ব্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্চ্চিতো বসন্‌॥

যদি সু-অতিথি অর্থাৎ বেদজ্ঞ উত্তম অতিথি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক সৎকার করিয়া আসন পাদ্যার্ঘ্য এবং যথাশক্তি অন্নদান করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ না করে সে শিলোঞ্ছ-বৃত্তিই হউক কিংবা পঞ্চাগ্নিহোমেরই প্রতিদিন অনুষ্ঠান করুক, যদি ব্রাহ্মণ অতিথি পূজিত না হইয়া তাহার গৃহে অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সমুদায় পুণ্য সেই অনাদৃত অতিথি গ্রহণ করেন। সেইজন্য যমরাজ অতিথি নচিকেতাকে প্রার্থণার অতিরিক্ত বরও প্রদান করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন।

যমরাজ নচিকেতাকে যে অগ্নিবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, নচিকেতার অন্তঃশরীরে যে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া কি প্রকারে সেই অগ্নির সাহায্যে জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতলাভ করিতে পারা যায় তাহা উত্তমরূপে নচিকেতাকে অনুভব করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অগ্নিকে ঋষি কয়েকটী বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন সেই অগ্নি "স্বর্গ" অর্থাৎ সাধককের মৃত্যুর অধিকার বহির্ভূত স্বর্গলোকে লইয়া যাইতে সমর্থ। সেই অগ্নি সমস্ত ব্যক্তজগতের 'প্রতিষ্ঠা' বা আশ্রয় অর্থাৎ সমস্ত স্থূলজগৎ এবং সেই সেই জগতের অধিবাসীগণ এই অগ্নির অঙ্গীভূত। এই অগ্নি 'গুহাতে নিহিত'। গুহা মানে—গুং অজ্ঞানান্ধকারং হন্তি, দূরীকরোতি ইতি গুহা অর্থাৎ নির্ম্মল বিশুদ্ধ বুদ্ধি অর্থাৎ যে বুদ্ধি অখণ্ডৈকরস পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ করিতে সমর্থ, সেই বুদ্ধিতে এই অগ্নি নিহিত আছে। এই অগ্নি 'লোকাদি" অর্থাৎ সমস্ত ব্যক্তজগতের কারণ। এই অগ্নি 'সুক্কা' অর্থাৎ শব্দময়, রত্নময়, অনিন্দিত; এই অগ্নি 'অনেকরূপ'

অর্থাৎ বিচিত্ররূপ, বহুফলপ্রদ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও প্রতিজীবে সুপ্ত এই অগ্নির বহুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

স যদগ্নিঃ প্র বানিব দহতি তদস্য বায়ব্যং রূপম্।

অগ্নি যখন পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, অগ্নির সেই রূপকে বায়ু বলে।

অথ যদ্ দ্বৈধমিব কৃত্বা দহতি, দ্বৌ বা ইন্দ্রবায়ু,
তদস্য ঐন্দ্রবায়ব্যং রূপম্।

যখন অগ্নি দুই সমানভাগে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পায় তখন অগ্নির সেই রূপকে ইন্দ্রবায়ু নামে অভিহিত করা হয়।

অথ যদ্ উচ্চ হৃষ্যতি নি চ হৃষ্যতি, তদস্য
মৈত্রাবরুণং রূপম্।

এই অগ্নি যখন উচ্চে উত্থিত হয় এবং নিম্নভাগে গমন করিতে থাকে, তখন অগ্নির সেই রূপকে মিত্র ও বরুণ বলে।

অথ যদেনং দ্বাভ্যাং বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামরণীভ্যাম্
মন্থতি তদস্য আশ্বিনং রূপম্।

অগ্নি যখন বাহুদ্বয় বা অবণিদ্বয় কর্তৃক মথিত হইয়া প্রকাশোন্মুখ হয়, অগ্নির সেইরূপকে অশ্বিনীযুগল বলে।

যদুচ্চৈর্ঘোষঃ স্তনয়ন্ ববৰা কুর্ব্বন্ ইব দহতি
তদস্য ঐন্দ্রং রূপম্।

অগ্নি যখন উচ্চ শব্দের সহিত বিদ্যুতের স্ফুরণ করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন অগ্নির সেই রূপকে ইন্দ্র বলা হয়।

অথ যদনেকং সন্তম্ বহুধা বিহরন্তি তদস্য
বৈশ্বদেবং রূপম্।

এই অগ্নি যখন এক হইয়াও বহুরূপে বহুপ্রকারে বিরাজ করিতে থাকে, তখন অগ্নির সেই রূপকে বিশ্বদেবা নামে অভিহিত করা হয়।

অথ যদ্ স্ফূর্জয়ন্ বাচমিব বদন্ দহতি তদস্য
স্বারস্বতং রূপম্।

অগ্নি যখন শব্দ করিয়া যেন বাক্য উচ্চারণ করিতেছে এইরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন অগ্নির সেই রূপকে সরস্বতী বলে।

ঋগ্বেদেও এই অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বলিতেছেন—

ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্ত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
তে বিশ্বে সহস্পুত্র দেবা ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্ত্যায়।
ঋ ৩।২৯।৫

হে অগ্নি, তুমি যখন জাত হও, তখন তুমি বরুণ; যখন প্রজ্বলিত হও তখন তুমি মিত্র; সকল দেবতা তোমারই অঙ্গীভূত; তোমার উপাসক সত্যপরায়ণ মনুষ্যের নিকট তুমি ইন্দ্র।

এই অগ্নি বা অন্তঃজ্যোতি যখন মূলাধারে প্রকাশোন্মুখ হয়, তখন ইহাকে বরুণ নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রকাশোন্মুখ দিব্যজ্যোতিকে অগ্নির মুখ বলিয়াও বিশেষিত করা হইয়াছে (ঋ ৭।৮৭-৬;৮৮-২) সূর্য্য হইতেছে বরুণের চক্ষু (ঋ, ১।৫০, ৬।৫১,, ৭।৬৬,৩৪,৬১,৬৩)। বরুণ

আবার সর্ব্বদ্রষ্টা এবং মিত্রের সহিত স্বর্গে বাস করেন (ঋ ১।২৫ ; ১০।১৪, ১।১৩৬, ৫।৬৩)। ইনি দিবা ও রাত্রির অধিপতি এবং মিত্র, শুধু দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্গীয় জ্যোতির অধিপতি। পার্থিব এবং নৈতিক শৃঙ্খলা, সমুদয় প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টা হইতেছেন বরুণ। সমুদয় জগৎ এবং জগৎবাসী বরুণের নিয়মসমূহের অনুগামী হইয়া থাকে।* (ঋ ১।২৪; ৮।৪০ ; ৭।৬৬ ; ৭।৮৭ ;)। ঋগ্বেদে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই ঋষি বলিতেছেন—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিং আহুঃ
অথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্।
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ঋ, ১।১৬৪-৪৬ ॥

একই সৎবস্তুকে ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি অগ্নিরই বিভিন্ন নাম মাত্র।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আমরা দেখিতে পাই, অশ্বমেধযজ্ঞের উপযোগী অগ্নিকে অন্তঃজ্যোতিরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং বায়ু ও সূর্য্যকে অগ্নিরই বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অন্তঃ-শরীরে এই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার উপায় সম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন—"তন্মনোঽকুরুত আত্মন্বী স্যামিতি"। তিনি সেই মন করিয়াছিলেন আমি আত্মন্বী হইব। এই উপাসককে প্রথমে সেই মন করিতে হইবে। কোন্ মন ? যে মন পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইতে ব্যগ্র। যে মনে স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, যশ, মান, স্বর্গসুখ-ভোগের কামনা উদিত হইবে না ; যে মনের একমাত্র কামনা হইবে "আত্মন্বী স্যাম্" আমি আত্মার সহিত, আমার স্বরূপের সহিত মিলিত হইব। এইরূপ ভগবন্মুখী মন করিয়া একাগ্রচিত্তে সাধককে জপ করিতে হইবে—

"অসতো মা সদ্ গময়,
তমসো মা জ্যোতি র্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

হে আমার অন্তরাত্মন্, এতদিন ধরিয়া যে সব বস্তুকে আমি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছি, যাহাদের প্রীতি উৎপাদনের জন্য এবং যাহাকে লাভ করিবার আশায় আমি প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছি, এখন দেখিতেছি তাহারা ত সত্য পদার্থ নয়; তাহারা অবিরত পরিণাম প্রাপ্ত হইতে হইতে চলিয়াছে। যাহারা স্বয়ং অস্থায়ী তাহারা কি প্রকারে আমায় স্থায়ী আনন্দ প্রদান করিতে পারে? স্ত্রী পুত্র, ধন দৌলত, যশঃ মান, কিছুতেই আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে না; আমি যদিও বুঝিতে পারিতেছি ইহারা অতি তুচ্ছ জিনিষ, ইহারা অসৎ, ইহাদের নিত্য, অপরিণামী সত্তা নাই, আছে শুধু একটা মোহকরী প্রাতীতিক সত্তা, কিন্তু তবুও বার বার চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগের উপর আসক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নিত্য সদ্বস্তু যে তুমি, তোমার নিকট যাইতে পারিতেছি না, সেই জন্য আমি কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। আমার নিজের চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম। আমি আর কর্ত্তা সাজিব না, এখন তুমি এসে আমার হাত ধর এবং এই সব অসৎ বস্তু হইতে একমাত্র সৎস্বরূপ যে তুমি, সেই তোমার কাছে লইয়া যাও। বিদ্যার অভিমান আমার বড় ছিল। আমি প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে আমার পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করিয়া কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ আবিষ্কার করিয়াছি, জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে আমার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু এত করিয়াও আমি স্থায়ী, নিরাবিল আনন্দ পাই নাই, আমার মনঃপ্রাণ ভরিয়া উঠিল না। আমি দেখিলাম এতদিন পরিশ্রম করিয়া প্রাকৃতিক পদার্থের সাহায্য লইয়া আমি শুধু বর্দ্ধিত

করিয়া তুলিয়াছি আমার পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা। অসংযত রহিয়া গিয়াছে আমার মনঃপ্রাণ, অশুদ্ধ এবং অ-বশ্য রহিয়া গিয়াছে আমার ইন্দ্রিয়গণ। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছি বলিয়া মনে যে গর্ব্ব অনুভব করিতাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, রাগ, দ্বেষ আমার চিত্তকে মথিত করায় এখন দেখিতেছি, আমারই আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ আমাকে এবং আমার সহিত সমগ্র জগৎকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে; সুতরাং আমার পাণ্ডিত্যের অভিমান, বিদ্যার গৌরব দূর হইয়া গিয়াছে। এখন দেখিতেছি যাহাকে বিদ্যা বলিয়া মনে করিতাম তাহা বিদ্যা নয়, তাহা অবিদ্যা, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান। তাই আমি পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি এস, একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, একমাত্র জ্যোতিঃ-স্বরূপ তুমি, তুমি এস, তোমার দিব্যজ্যোতিতে আমার মন, প্রাণ, বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করিয়া আমার চিত্তকে নির্ম্মল কর, তোমার করুণা ব্যতীত কে তোমার কাছে যাইতে পারে? তুমি যাহাকে বরণ কর, কেবল সেই ব্যক্তিই তোমাকে লাভ করিতে পারে, তাহারই নিকটে তোমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাক; তাই বলি হে জ্যোতিঃস্বরূপ! তুমি আমার সমুদয় ভ্রান্তজ্ঞান, আমার অসম্যক্ দৃষ্টি দূর করিয়া চিৎস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ তুমি, তোমার কাছে লইয়া যাও। সর্প যেমন ভেককে একটু একটু করিয়া গ্রাস করিতে থাকে, সেইরূপ মৃত্যু ক্ষণ, ঘণ্টা, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসরের রূপ ধরিয়া আমাকে গ্রাস করিতে করিতে চলিয়াছে। আমি কত ঔষধ সেবন করিয়াছি, কত আয়ুর্ব্বেদ, কত রসায়নশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, কত পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই এই কালরূপী মৃত্যুর কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না; সেইজন্য এখন অমৃত-স্বরূপ তুমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি এই মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপ তোমার কাছে লইয়া যাও। এইরূপে মনে মনে

পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া মনকে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। তারপর মস্তকের উপরিভাগে কিংবা আজ্ঞাচক্রে, কিংবা হৃদয়াকাশে মনকে নিবদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হইবে, ধ্যানের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অন্য কোন চিন্তা বা সংকল্প মনোমধ্যে উদিত না হয়। দীর্ঘকাল এইরূপ অভ্যাস করিতে থাকিলে সাধক স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন—"তস্য শ্রান্তস্য, তপ্তস্য, তেজোরসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ" (বৃঃ উপ)। ঈশ্বরের একাগ্র উপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত সেই সাধকের তপঃক্লিষ্ট অন্তঃশরীরে সমস্ত শরীরের সারভূত তেজরূপী অগ্নি বা আত্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। এই জ্যোতি বা অগ্নি সাধকের মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া মস্তক ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। এই জ্যোতিতে তখন হোম বা আত্মনিবেদন করিতে হইবে। এই জ্যোতিই সাধকের রজস্তমঃরূপ মলিনতা দূর করিয়া চিত্তকে, ইন্দ্রিয়কে, প্রাণকে, শরীরকে সত্ত্বপ্রধান করিয়া তুলিবে। এই জ্যোতিই বা অগ্নি বায়ুরূপে, আদিত্যরূপে সাধকের জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির অল্পতা, পরিচ্ছিন্নতা, খণ্ডত্ব, সীমাবদ্ধতা দূর করিয়া সাধককে সম্যকদর্শন, নিরাবিল আনন্দ, অব্যাহত শক্তি ও সর্ব্বাত্মভাব প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের স্বরূপানন্দ প্রদান করিবে। চণ্ডীতে এইজন্য প্রথমেই এই অগ্নি বা জ্যোতির উদ্বোধন বর্ণিত হইয়াছে। এই জ্যোতির উদ্বোধন হইলে বিষ্ণু বা সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ জাগরিত হইবে। চণ্ডীর প্রথম চরিত এইজন্য মহাকালী। এই মহাকালী দেবতার তত্ত্ব বা স্বরূপ হইতেছে অগ্নি। দ্বিতীয় চরিত হইতেছে মহালক্ষ্মী এবং তত্ত্ব হইতেছে বায়ু। উত্তম চরিত হইতেছে মহাসরস্বতী এবং তত্ত্ব হইতেছে আদিত্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও অগ্নির এই তিনরূপ বর্ণিত হইয়াছে—স ত্রেধা আত্মানম্ ব্যকুরুত, আদিত্যং তৃতীয়ং, বায়ুং তৃতীয়ং, স এবঃ প্রাণ স্ত্রেধা বিহিতঃ। সেই প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর নিজেকে অগ্নি, বায়ু ও

আদিত্য এই তিনরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার শরণাগত সাধক অনায়াসে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

নচিকেতার অন্তঃশরীরে যমরাজ এই অগ্নি বা আত্মজ্যোতিরই উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন যে, এই জ্যোতি বা অগ্নি শব্দময়, নাদময়। এই দিব্যজ্যোতিতে মন একাগ্র হইলে অন্তঃশরীরে নাদ উত্থিত হয়। এই নাদকে অনাহত ধ্বনি, প্রণব বা ওঙ্কার নামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হয়। সেইজন্য যমরাজ এই অগ্নিকে শব্দময় বলিলেন এবং নচিকেতার উপর প্রীত হইয়া এই অগ্নির নাম নচিকেতা রাখিলেন। যমরাজ নচিকেতাকে পুনরায় বলিলেন—

ত্রিণাচিকেত স্ত্রিভিরেত্য সন্ধিম্‌।
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু॥
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা।
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

যিনি তিনের সহিত সন্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিণাচিকেত হইয়াছেন, যিনি ত্রিকর্ম্মকৃৎ, তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। এবং পূজ্য ব্রহ্মজজ্ঞদেবকে জানিয়া এবং অপরোক্ষ করিয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করেন।

'ত্রিভিঃ' মানে তিনের দ্বারা? কোন তিনের দ্বারা মাতা, পিতা এবং আচার্য্য কিংবা ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়দ্বারা, অথবা বেদ, স্মৃতি, এবং শিষ্টজন কিংবা প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, কায়, মন, বাক্য, অথবা অগ্নিতত্ত্বের বিজ্ঞান, অধ্যয়ন এবং অনুষ্ঠান। 'এত্য' মানে পাইয়া, সঙ্গত হইয়া। 'সন্ধিং' মানে সম্বন্ধঃ, সন্ধান উপদেশ। 'ত্রিণাচিকেতঃ' মানে যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন বা উপাসনা করেন। 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' মানে যিনি যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন এবং দান এই তিন কর্ম্ম করেন কিংবা তিনবার যিনি কর্ম্ম করেন। সুতরাং সমগ্র মন্ত্রের প্রথম দুই পংক্তির অর্থ

হইল—যিনি মাতৃমান্, পিতৃমান এবং আচার্য্যবান্ অর্থাৎ মাতা, পিতা এবং আচার্য্যের সহিত সন্ধি অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ যিনি মাতা, পিতা এবং আচার্য্য কর্তৃক যথাযথরূপে উপদিষ্ট হইয়া তিনবার অর্থাৎ অগ্নিতত্ত্বের অধ্যয়ন, অনুষ্ঠান এবং অগ্নিবিজ্ঞান দ্বারা নাচিকেত অগ্নির উপাসনা করেন কিংবা বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজনের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, অথবা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া তিনবার অগ্নিতত্ত্বের অধ্যয়ন, অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞান দ্বারা নাচিকেত অগ্নির উপাসনা করেন, এবং যাগ, বেদাধ্যয়ন ও দান করেন, তিনি জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। এবং ব্রহ্মজজ্ঞ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত, জ্ঞান প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, স্তবনীয় বিরাট পুরুষকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করেন। যে ব্যক্তি মাতৃমান্, পিতৃমান, আচার্য্যবান্ হইয়া নাচিকেত অগ্নিকে প্রজ্জলিত করেন, তিনি জীবনে কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারেন।

বেদের সংহিতাভাগে কিংবা উপনিষদে বিশেষরূপে যুক্তিবাদ আসে নাই। ঋষি যাহা অপরোক্ষ করিতেছেন কিংবা যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, যাহা তিনি স্পষ্ট অন্তরে বাহিরে অনুভব করিতেছেন, দেখিতেছেন তাহাই তিনি বলিতেছেন। স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীর স্রোত যেমন আনন্দে, কল কল শব্দে, সাবলীল স্বচ্ছন্দগতিতে নীলাম্বুর অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ পবিত্রহৃদয় ঋষির মুখ হইতে মন্ত্রসমূহ সপ্তচ্ছন্দে নির্গত হইয়া সত্যের সন্ধান দিয়া চলিয়াছে। ঋষি যাহা দেখিতেছেন তাহাই মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে; এইজন্য ঋষিকে শাস্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা বলে। বৈদিকসমাজে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে অন্তঃশরীরে আত্মজ্যোতি-দর্শন-পদ্ধতিই অবলম্বিত হইত। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় কি না, কর্ম্ম বড়, না জ্ঞান বড়, না ভক্তি বড় এইরূপ সংশয় ঋষির মনে উদিত হয় নাই। 'আমি আছি কি নাই' এরূপ সংশয় লোকের মনে উদিত

হয় না, কারণ আমি যে আছি ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আমার অস্তিত্ব কাহারো যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে না। সেইরূপ ঋষি যে সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন, যাহা তিনি স্পষ্ট অন্তঃশরীরে এবং তাঁহার বাহিরে দেখিতেছেন, তাহার সত্যতা কোন যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করে না। বৈদিক সাধনায় জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি কোনটাই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৈদিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই দুইটি কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া সেই দুই কাষ্ঠ-মধ্যে সুপ্ত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করা একান্ত আবশ্যক। অগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে, বৈদিক সাধনার আরম্ভই হয় না। যে দুই কাষ্ঠখণ্ডকে মথিত করিয়া সুপ্ত অগ্নিকে জাগাইতে হয়, সেই কাষ্ঠ-খণ্ড দুটি প্রতীক (symbol) মাত্র। শ্রুতি বলেন—

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবোঞ্চত্তরারণিম্।
ধ্যান-নির্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ॥

নিজের দেহই হইতেছে একখণ্ড কাষ্ঠ এবং প্রণব বা নাদ হইতেছে আর একটি কাষ্ঠখণ্ড এবং ধ্যান হইতেছে মন্থন ক্রিয়া। ঐ মন্থনক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে সর্ব্বানুস্যূত দর্শন করিবে। ঋষিরা দেখিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক শরীরে এই আত্মজ্যোতিঃ সুপ্ত আছে। এই সুপ্ত আত্মজ্যোতিকে ঋষি শিষ্য-হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেন। এই আত্মজ্যোতি বা অগ্নি শিষ্যের অন্তঃশরীরে উদ্বুদ্ধ হইলে, শ্রবন মনন নিদিধ্যাসন ব্যতীতও শিষ্য অমৃতস্বরূপ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে [illegible]রিত। এই আত্মজ্যোতি বা অগ্নিসম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন—

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতুরজসো বিমানোজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম॥

[ঋ ৩।২।২৬।৭।৮]

সায়নাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বস্বরূপঃ অগ্নিঃ। সর্ব্বাত্মকত্বানুভবং আবিষ্করোতি। জন্মনা এব জাতবেদা অস্মি। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাননাদি সাধননিরপেক্ষেণ স্বভাবত এব সাক্ষাৎকৃত-পরতত্ত্ব স্বরূপোঽস্মি। ঘৃতং মে চক্ষুঃ—যৎ এতৎ বিশ্বস্য বিভাসকং মম স্বভাবভূতপ্রকাশাত্মকং চক্ষুঃ তৎ ঘৃতং। ত্রিধাতুঃ—প্রাণাপানব্যানাঃ, অগ্নিঃ অর্কঃ বায়ুঃ, স্বর্গঃ মর্ত্ত্যঃ দ্যৌঃ। সর্ব্বাত্মকঃ অগ্নিঃ অন্তঃকরণবৃত্ত্যা মতিং মননীয়ং জ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশরূপং পরব্রহ্মাখ্যং তেজঃ অনুপ্রজানন্ শ্রবণমননাদিক্রমেণ প্রকর্ষেণ সংশয়বিপর্য্যাসভাবনাবুদ্ধিনিরাসেন স্বাত্মরূপতয়া জানানঃ সন্ পবিত্রৈঃ পাবনৈঃ ত্রিভিঃ অগ্নিবায়ুসূর্য্যৈঃ অর্কং অর্চ্চনীয়ং নিরতিশয়ং আনন্দলক্ষণং অপুপোদ্ধি তেভ্যোঽপি নির্ম্মলতয়া পাবনং পরিচিচ্ছেদ। যথা দশাপবিত্রেণ সোমং পাবয়তি তদ্বৎ।

অন্তঃশরীরে এই আত্মজ্যোতি জাগরিত হইলে সাধক শ্রবণ-মননাদি-সাধন-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বাত্মকত্বভাব অনুভব করিয়া থাকেন, কারণ এই জ্যোতি নিত্য, স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রকাশক, এই জ্যোতি অগ্নি, অর্ক ও বায়ুরূপে মহাকালী, মহাসরস্বতীরূপে সাধকের অন্তঃশরীরে নিজেকে প্রকাশ করিয়া সাধকের চিত্তের সর্ব্ববিধ মলিনতা দূরীভূত করিয়া সাধককে তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। সাধক তখন জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অমৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। যমরাজ নচিকেতার অন্তঃশরীরে এই দিব্য জ্যোতির উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, কায়মনোবাক্যে মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্য্যবান্ হইয়া যে ব্যক্তি প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে এই অগ্নির উপাসনা করেন, এইরূপ যে ত্রিকর্ম্মকৃৎ সেই ব্যক্তি জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে। কারণ অগ্নি বা আত্মজ্যোতিই তাহাকে সর্ব্বাত্মভাব উপলব্ধি করাইয়া দেয়; সেই ব্যক্তি তখন সর্ব্বভূত আপনাতে এবং নিজেকে সর্ব্বভূতে অনুস্যূত অবলোকন করেন। সাধকের এই অবস্থা বিরাট ও

হিরণ্যগর্ভ অবস্থা। 'ব্রহ্মজ' মানে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে জাত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। শ্রুতিও বলেন—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে"। হিরণ্যগর্ভ প্রথমে আবির্ভূত হইলেন। এই হিরণ্যগর্ভে সমস্ত জীবজগৎ ঘনীভূত হইয়া,অঙ্গীভূত হইয়া বিদ্যমান। দেশকালও হিরণ্যগর্ভের অঙ্গীভূত। হিরণ্যগর্ভই হইতেছেন 'জ্ঞ' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্ অর্থাৎ সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে জগৎ ও জীবকে জানেন কারণ জগৎ ও জীব তাঁহারই অঙ্গীভূত। সেইজন্য এই হিরণ্যগর্ভ-অবস্থায় উন্নীত হইলে সাধক দেশ কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, কালরূপী মৃত্যু তখন আর তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। তখন তিনি নিরতিশয় শান্তিলাভ করেন। কিন্তু এই অবস্থায় উন্নীত হইবার পূর্ব্বে বৈরাজপদ-লাভ একান্ত আবশ্যক।

যমরাজ এই অগ্নিবিদ্যার ফল কি তাহা পুনরায় নচিকেতাকে বলিলেন—

ত্রিণাচিকেত স্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বান্ চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং সায়ংকালে নাচিকেত অগ্নির উপাসনাকারী ব্যক্তি অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য তত্ত্ব অবগত হইয়া, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া শোক মোহ অতিক্রম পূর্ব্বক নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন। নাচিকেত অগ্নির বিজ্ঞান এবং সেই অগ্নিকে অন্তঃশরীরে উদ্বোধন করিবার প্রণালী সম্যকরূপে জানিয়া যিনি এই জ্যোতিকে আত্মস্বরূপে ধ্যান করেন, তিনি এই জন্মেই মৃত্যুপাশ ছিন্ন করিয়া শোকরহিত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করেন।

নচিকেতা দ্বিতীয় বরে যমরাজের নিকট অগ্নিবিদ্যা জানিতে চাহিয়াছিলেন। যমরাজও নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অগ্নিবিদ্যা হইতেছে জ্যোতিস্তত্ত্ব; এই জ্যোতিঃকে তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীশক্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'কুণ্ডলিনী' মানে যে শক্তি কুণ্ডলাকারে অবস্থিত। মানুষের মূলাধারে এই কুণ্ডলিনীশক্তি বা অগ্নি, বা জ্যোতিঃ সুপ্ত রহিয়াছে; এই সুপ্ত-শক্তিকে, এই অগ্নি বা জ্যোতিঃকে শিষ্য-শরীরে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই হইতেছে দীক্ষা বা দীক্ষনীয় যাগ বা উপনয়ন। অন্তঃশরীরে এই অগ্নি বা জ্যোতিঃ উদ্বোধিত না হইলে মানুষ কোনও বৈদিক কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যমরাজ বিশদরূপে এই অগ্নিতত্ত্ব সম্বন্ধে নচিকেতাকে উপদেশ প্রদান করিয়া "যা ইষ্টকা, যাবতীর্বা যথা বা" এই মন্ত্রে কত সংখ্যক ইষ্টকদ্বারা বেদী প্রস্তুত করিয়া সেই বেদীতে কি কৌশলে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে নচিকেতাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বাহিরের যজ্ঞশালায় যেমন ইষ্টকদ্বারা বেদী প্রস্তুত করিয়া সেই বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয় সেইরূপ অন্তঃশরীরেও ইষ্টকদ্বারা বেদী প্রস্তুত করিয়া অগ্নি বা জ্যোতিকে প্রজ্বলিত করিতে হয়। অন্তঃশরীরে বেদীর ইষ্টকসম্বন্ধে আনন্দগিরি বলেন—৭২০খানি ইষ্টক দিয়া বেদী প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক মাসে ৬০টী দিবারাত্র, সুতরাং এক বৎসরে ৭২০টী অহোরাত্র হইয়া থাকে। দিবারাত্র 'আমি জ্যোতিঃস্বরূপ' এই ভাবনাদ্বারা ভাবিত হইয়া অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত জ্যোতিঃকে "আত্মভাবেন ধ্যায়েত" আত্মভাবে অর্থাৎ আমিই জ্যোতিঃস্বরূপ এইভাবে ভাবিত হইয়া ধ্যান করিবে। ফল নির্ভর করে ধ্যানের গভীরতা ও নিবিড়তার উপর। ব্রহ্মচারী, গৃহী ও বাণপ্রস্থীকে অন্ততঃ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এই জ্যোতির ধ্যান করিতে হইত। কেহ কেহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে এই জ্যোতির ধ্যান

করিতেন। কেহ কেহ বা স্বর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে স্বর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত এই জ্যোতিঃ বা অগ্নির ধ্যান করিতেন এবং মধ্যাহ্নের এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মধ্যাহ্নের এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত এবং স্বর্য্যাস্তের এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত এবং মধ্যরাত্রির এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে তিন ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত এই জ্যোতির ধ্যান করিতেন। অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে তিন ঘণ্টা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ব্যয় করিতেন। অহোরাত্র এই জ্যোতিঃতেই মন নিবিষ্ট থাকিত। এক বৎসর এইরূপে ধ্যান করিতে করিতে অন্তঃশরীরের এই অগ্নি বা জ্যোতি পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সাধকের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষের পরিচ্ছিন্নতা দূর করিয়া সাধককে ক্রমে ক্রমে বৈরাজপদ ও হিরণ্যগর্ভপদ বা ব্রহ্মলোকে উন্নীত করিয়া দিত। সাধক তখন জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি, শোক মোহকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে দিব্যআনন্দ অব্যাহত শক্তি, অমরজীবন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতেন। যমরাজ নচিকেতাকে এই অগ্নিবিদ্যা প্রদান করিয়া পুনরায় বলিলেন—

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥১৯॥

হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয়-বরে স্বর্গ-সাধন যে অগ্নিবিদ্যা জানিতে চাহিয়াছিলে সেই অগ্নিবিদ্যা তোমাকে প্রদান করিলাম। আরও আমি তোমার যোগ্যতায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে আরও একটি বর দিয়াছি যে এই অগ্নিকে লোকে নাচিকেত অগ্নি বলিয়া অভিহিত করিবে। এখন তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

যমরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া নচিকেতা বলিলেন—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং।
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে লোকে যে সংশয় দেখা যায়, কেহ বলেন মৃত ব্যক্তির আত্মা পরলোকে গমন করে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সব শেষ হইয়া যায়, আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে মৃত ব্যক্তির আত্মা পরলোকে গমন করে; আত্মার সম্বন্ধে এই যে সংশয় ইহারই তত্ত্ব আমি আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জানিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার তৃতীয় বর।

মানব যুগ যুগ ধরিয়া এই মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুরহস্য অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। কেহ বলেন এই স্থূলদেহই আত্মা, কেহ বলেন ইন্দ্রিয়ই আত্মা, কেহ বলেন মনই আত্মা, কেহ বলেন বুদ্ধিই আত্মা, কেহ বলেন আত্মা ভোক্তা কিন্তু কর্ত্তা নহে, কেহ বলেন আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা, কেহ কেহ বলেন দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত 'আত্মা' বলিয়া একটী বস্তু আছে। এইরূপে আত্মা সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের মধ্যে বহুপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে যতক্ষণ মানুষের মনে সংশয় বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। অস্পষ্ট আলোকে একগাছি রজ্জু দেখিয়া মানুষের মনে যখন 'ইহা সাপ কি না' এই সংশয় উদিত হয়, তখন সে প্রদীপ লইয়া আসিয়া দেখে যে উহা সাপ নয়, উহা একগাছি রজ্জু মাত্র। রজ্জু নির্ণীত হইয়া গেলে

তাহার সংশয় দূর হয়, এবং তাহার বুদ্ধিও শান্ত হইয়া যায়। সেইরূপ আত্মবিষয়ক সংশয় যতক্ষণ না দূর হয়, যতক্ষণ না আত্মা নির্ণীত হয়, ততক্ষণ মানুষ শান্তি পায় না। বাহ্যবস্তুবিষয়ক সংশয় যেমন সে প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে নিরসন করে, আত্মবিষয়ক সংশয়ও সে সেইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা দূরীভূত করিতে প্রথমে প্রযত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় বলিয়া আত্ম-সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যায়। আত্মাকে বাহ্যবস্তুর ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া আমরা তাহাকে জানিতে বা দেখিতে পারি না। না পারি তাহাকে স্পর্শ করিতে, না পারি ঘ্রাণ করিতে। কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই তাহাকে জ্ঞেয়বস্তুর ন্যায় আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে বলিয়া অনুমানের দ্বারাও পরলোক-সম্বন্ধী আত্মার অস্তিত্ব আমরা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিনা। অথচ এই আত্মা বা 'আমি' কে, ইহার স্বরূপ কি ইহা যতক্ষণ না আমরা নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমাদের শান্তি নাই। যাহা আমার তাহা কিন্তু আমি নই। বাড়ী আমার, কিন্তু আমি বাড়ী নই। রাজ্য, দেশ আমার কিন্তু আমি রাজ্য ও দেশ নই। ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, ভাই বোন আত্মীয়স্বজন সব আমার কিন্তু আমি ইহাদের কোনটাই নই। আমার দেহ, কিন্তু আমি দেহ নই। আমার ইন্দ্রিয়, আমার প্রাণ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, কিন্তু ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইহাদের কোনটাই আমি নই। জাগ্রৎ অবস্থা আমার, কিন্তু আমি জাগ্রৎ অবস্থা নই, স্বপ্নাবস্থা আমার, কিন্তু আমি স্বপ্নাবস্থা নই। সুষুপ্তি অবস্থা আমার কিন্তু আমি সুষুপ্তি অবস্থা নই। তবে আমি কে? আমি চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি সুতরাং আমি দ্রষ্টা, আমি কর্ণ দ্বারা শুনিতেছি সুতরাং আমি শ্রোতা, আমি নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ করিতেছি সুতরাং আমি ঘ্রাতা, আমি মন দ্বারা মনন করিতেছি সুতরাং আমি মন্তা,

বুদ্ধিদ্বারা জানিতেছি সুতরাং আমি জ্ঞাতা। এ দিকেও দেখি আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা। যাহা দৃশ্য, যাহা জ্ঞেয় তাহা কখনও দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। যাহা ক্রিয়া, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ তাহা কখন কর্ত্তা হইতে পারে না সুতরাং আমি ক্রিয়া কর্ম্ম, করণাদি হইতে, দৃশ্য, জ্ঞেয় প্রভৃতি হইতে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি হইতে, অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক, সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, তাহা হইলে আমি বা আত্মা কোন্ বস্তু? ইহার স্বরূপই বা কি? ইহাকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারি না, ছুই ছুই করিয়াও ছুইতে পারি না। অথচ এই আমি বা আত্মাকে সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই শৈশবের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা, জরার পর মৃত্যু আসিয়া এই আমি বা আত্মাকে যেন জগৎ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দিতেছে। আমার কৃত-কর্ম্মের ফলভোগ করিতে না করিতেই, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের কত অতৃপ্ত বাসনা লইয়া আমাকে এই জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। আর যদি মৃত্যুর পর আত্মা বা আমি থাকিয়া যাই, যদি স্বর্গলোকে যাই, বিরাট্‌পদ প্রাপ্ত হই কিংবা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মলোকেই বাস করি তাহা হইলেও 'আমি' বা আত্মা কে, আমার স্বরূপই বা কি তাহা সম্যক্‌রূপে নাও জানিতে পারি। নচিকেতা মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইবার জন্য যমরাজকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন।

ব্রহ্মলোক হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সংসার-চক্র। প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে ঘটীযন্ত্রের মত এই সংসারচক্রে কখন ঊর্দ্ধগতি কখন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সংসার-চক্র হইতে অব্যাহতি লাভের দুইটী পন্থা বিদ্যমান। একটী হইতেছে ক্রম-মুক্তি এবং অপরটী হইতেছে সদ্যো-মুক্তি, জগতের অধিকাংশ প্রাণীই ক্রম-মুক্তি-পন্থা অবলম্বন করিয়া সংসার-চক্র হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভের প্রযত্ন করিয়া থাকে। স্বাতন্ত্র্য-লাভের এই ৫

প্রযত্ন, ইহাও কামনা-মূলক, ইহা কামেরই একটী রূপ। তবে এই কামনা শুভ কামনা। এই প্রযত্ন বা প্রবৃত্তিকে ঋষিগণ নিবৃত্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ মলিন বা অশুভ-কামনা হইতে উদ্ভূত যে প্রবৃত্তি তাহা নানার দিকে, বহুর দিকে, খণ্ড খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন ভাবের দিকে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের দিকে, মলিন-বাসনা-সঞ্জাত শত শত বিষয়ের অভিমুখে প্রাণিগণকে আকর্ষণ করিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লইয়া যায়। সেইজন্য মানুষ স্থায়ী সুখ অনুভব করিতে পারে না। মানুষ শরীর পাইয়াছে কিন্তু সে এই শরীর দিয়া সুখভোগ করিতে না করিতে এই শরীর পরিণাম প্রাপ্ত হইতে হইতে চলিয়াছে, বাল্যের শরীর দিয়া বিষয়ভোগ পূর্ণ হইতে না হইতে যৌবন-শরীর আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, আবার যৌবন-শরীর দ্বারা বিষয়ভোগের পরিতৃপ্তি না হইতে বার্দ্ধক্য-শরীর আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, শরীর যদি বেশ সুস্থ, সবল, ব্যাধিহীনও থাকে তাহা হইলেও সেই শরীর দ্বারা বিষয়ভোগে তৃপ্তিলাভ করিতে না করিতেই মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে। শরীরের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মন বিষয়ভোগে অতৃপ্ত রহিয়া পরিশেষে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে। মানুষ শক্তিতে, জ্ঞানে, আনন্দে, কর্ম্মে, জীবনে অবিরত পদে পদে বাধা পাইতেছে। তার শক্তি সীমাবদ্ধ, জ্ঞান সসীম, আনন্দ ক্ষণিক, জীবনও জন্ম এবং মৃত্যুদ্বারা সীমাবদ্ধ। সেইজন্য মানুষের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ এবং জীবনের বাধাসমূহ দূর করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। মানুষের এই আনন্দের বাধা, শক্তির বাধা, জ্ঞানের বাধা, জীবনের বাধা দূর করিবার, শোক, মোহ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, জরাব্যাধি, জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিবার উপায় মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে। এই উপায় যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহারা মানবজাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন —"মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ। সংসারসিন্ধো স্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ। যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং। তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি"। হে

বিদ্বন্, তুমি ভীত হইও না, তোমার নাশ নাই। সংসার-সমুদ্র পার হইবার উপায় আছে। সংযত-চিত্ত ব্যক্তিগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন আমি সেই পথ তোমাকে প্রদর্শন করিতেছি।

মুনি, ঋষি, মহাপুরুষগণ মানুষকে জন্মমৃত্যু, শোকমোহকে অতিক্রম করিবার পন্থা তিন প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম পন্থাটী হইতেছে শ্রুতি বা বেদ এবং অনুভূতি। দ্বিতীয় পন্থাটী হইতেছে—শ্রুতি, অনুভূতি, যুক্তি। তৃতীয় পন্থাটী হইতেছে যুক্তি, অনুভূতি, শ্রুতি। পূর্ব্বে ঋষিগণ মানুষের আয়ুকে গড়পড়তা একশত বৎসর ধরিয়া, সেই আয়ুকে সমান চারি ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, ২৫ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত গার্হস্থ্যাশ্রম, ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাণপ্রস্থাশ্রম, ৭৫ হইতে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত অত্যাশ্রম। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে যাহাতে সু-সন্তান হয় সেইজন্য মাতা ও পিতা শুভসংকল্প করিতেন। সন্তান যখন গর্ভে জন্মগ্রহণ করিত তখন মাতা পিতা গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ শুভসংকল্পপূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শুভসংস্কার করা হইত। সন্তান মাতা ও পিতা কর্ত্তৃক ৮ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হইত। তৎপরে অষ্টম বৎসর বয়সে, তাহাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করা হইত। গুরু মাতৃমান্ পিতৃমান্ সেই অষ্টমবর্ষ বালককে উপনয়ন দিয়া তাহার অন্তঃশরীরে আত্মজ্যোতির উদ্বোধন করিতেন এবং এই আত্মজ্যোতিঃ বা অগ্নিকে অভেদে উপাসনা করিতে শিক্ষা দিতেন। গুরু স্বয়ং এই আত্মজ্যোতি বা অগ্নিসম্বন্ধে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে মন্ত্র সমূহ উচ্চারণ করিতেন; ব্রহ্মচারিগণ গুরুর সমীপে উপবেশন করিয়া গুরুর মুখ হইতে শ্রুত সেই মন্ত্রসমূহ গুরুর ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। আত্মজ্যোতিঃ বা অগ্নি অন্তঃশরীরে

উদ্বুদ্ধ হওয়ায়, ব্রহ্মচারিগণ স্পষ্ট সেই অগ্নি বা আত্মজ্যোতিকে অন্তঃশরীরে দর্শন করিয়া, এবং গুরুমুখ হইতে সেই জ্যোতির স্বরূপ কি, তাহার কার্য্যই বা কি তাহা শ্রবণ করিয়া সেই জ্যোতির মনন ও নিদিধ্যাসন করিতেন। এই অগ্নি বা জ্যোতি সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়াকে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ বলিত। মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্য্যবান্, ব্রহ্মচারী এই অগ্নি বা আত্মজ্যোতিতে হোম বা আত্মনিবেদন-দ্বারা তাহার অন্নময় কোষ (Physical body) (স্থূলশরীর), প্রাণময় কোষ (Nerveous system), মনোময় কোষ (Desire body), বিজ্ঞানময় কোষ (Reason-body), আনন্দময় কোষ (Ego) এই সমুদয়কে বিশুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান করিত। স্থূল অন্ন (matter) হইতে শব্দ হইতেছে সূক্ষ্মতম; সুতরাং চৈতন্যের বিকাশ শব্দময় শরীরে বিশদরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বিশেষ বিশেষ ছন্দে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণদেহে বিশেষ বিশেষ স্পন্দন উত্থিত হয় এবং তখন ব্রহ্মচারীর দেহের ছন্দের সহিত বিশ্বের ছন্দের সংযোগ সাধিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী স্বয়ং মন্ত্রময় হইয়া যায় এবং এই জন্যেই তাহার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অহঙ্কার এমন কি স্থূল দেহের পরিচ্ছিন্নত্ব দূর করিয়া দেবত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেবত্ব হইতেছে মানবীয় জীবন হইতে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও সুখময় জীবন। স্বর্গ মানে হইতেছে স্বঃ লোক, যে লোকে বার্দ্ধক্য নাই, মৃত্যু নাই প্রচুর আনন্দ বিদ্যমান। এই স্বর্লোক ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেইজন্য মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্য্যবান্, ব্রহ্মচারী অন্তঃশরীরে অগ্নি বা আত্ম-জ্যোতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মলোকের জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, এই মনুষ্য-লোকে স্বীয় বিশুদ্ধচিত্তে উপলব্ধি করিয়া জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। পরে ব্রহ্মলোক হইতে তপস্যাদ্বারা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার আর

সংসারচক্রে পুনরায় আবর্ত্তিত হইতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা আত্মজ্যোতি বা অগ্নিতে আত্মনিবেদন দ্বারা নিষ্কামভাবে অভেদে উপাসনা না করিয়া পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্লোকে গমন করেন তাঁহাদিগকে পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে সংসারচক্রে পুনরায় আবর্ত্তিত হইতে হয়। ইহাই ক্রম-মুক্তির পন্থা। এই পন্থা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে জীবনের আনন্দভোগ করিতে করিতে পরিশেষে স্বাতন্ত্র্যলাভ করা যায়; কিন্তু যদি কেহ দিব্য ঐশ্বর্য্য, দিব্য শক্তি, দিব্য জ্ঞানে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জীবনের সেই স্তর হইতে উন্নত, উন্নততর, উন্নততম স্তরে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন এবং তথাকার সুখভোগে নিস্পৃহতালাভ দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হয় সুতরাং এই ক্রমমুক্তিরূপ পন্থায় পতনের ভয় আছে এবং স্বরূপে স্থিতির বিলম্ব ঘটিতে পারে। সেইজন্য নচিকেতা যমরাজকে সদ্যোমুক্তিরূপ দ্বিতীয় পন্থাবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ করিতে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উপদেশ গ্রহণের অধিকারী না হইলে তাহাকে উপদেশ করা হইত না। জিজ্ঞাসুকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাকে উপদেশ করা হইত এবং তাহা হইলেই জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে উপদেশ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া ফলপ্রসূ হইত। যমরাজ নচিকেতার তৃতীয় বরপ্রার্থনা শ্রবণ করিয়া নচিকেতাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥২১॥

হে নচিকেতা, তুমি যে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছ সেই আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম; দেবতাদিগেরও এই আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে সংশয় আছে। সুতরাং তুমি এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিও

না। এই আত্মতত্ত্ববিষয়ক তৃতীয় বর আমার নিকট প্রার্থনা করিও না। আরও ত অনেক প্রার্থনীয় বস্তু আছে তুমি তাহাই কেন প্রার্থনা কর না। দেবগণের বুদ্ধিও যে সূক্ষ্মতত্ত্বে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না তুমি মনুষ্যবালক হইয়া সেই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবে?

যমরাজ যখন নচিকেতাকে বলিলেন যে আত্মতত্ত্ব এতই সূক্ষ্ম, এতই দুর্বিজ্ঞেয় যে অলৌকিক-জ্ঞান-সম্পন্ন দেবগণও ইহা সম্যকরূপে জানিতে পারেন নাই, সুতরাং নচিকেতা যেন তাঁহাকে সেই দুর্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ করিতে অনুরোধ না করেন, তখন নচিকেতা স্থির অথচ বিনীতভাবে যমরাজকে বলিলেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥

হে যমরাজ, আপনিই বলিতেছেন যে এই আত্মতত্ত্ব সহজে বিদিত হওয়া যায় না, ইহা এতই দুর্বিজ্ঞেয় যে, আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে দেবগণেরও সংশয় রহিয়াছে; সুতরাং আপনিই ভাবিয়া দেখুন আমি কোন্ বিদ্বান মনুষ্যের নিকট হইতে আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে পারি? আপনি ব্যতীত আমি ত এমন কোন বক্তা দেখিতে পাই না যিনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। আমাকে আপনি অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন কিন্তু আমি এই আত্মতত্ত্বরূপ বরের সদৃশ অন্য কোন বর দেখিতে পাইতেছি না।

যমরাজ নচিকেতার এতাদৃশ স্থির-সংকল্প দর্শনে যদিও প্রীত হইলেন তথাপি স্বর্গলোকেও তাঁহার তুচ্ছ-বুদ্ধি হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পুনরায় নচিকেতাকে বলিতে লাগিলেন—

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্ ।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব,
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং,
বৃণীষ্ব বিত্তং চির-জীবিকাঞ্চ ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি,
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে,
সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥

নচিকেতা, কাকের দন্ত আছে কিনা এবিষয়ে কেহ জানিতে ইচ্ছা করে না কারণ তাহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, আর যদি বল যে এই আত্মা কাকের দন্তের ন্যায় কোন অপ্রসিদ্ধ বস্তু ত নয়, এই আত্মা অতিশয় প্রসিদ্ধ, ইহা 'আমি', 'আমি' এই অহংজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা হইলে তোমাকে বলি কোন ব্যক্তিই যেমন দ্বিপ্রহরে, সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে অবস্থিত ঘট সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না কারণ সূর্য্যের আলোক-মধ্যবর্ত্তী ঘটকে সে প্রত্যক্ষ করিতেছে, সেইরূপ এই আত্মা যদি 'আমি' 'আমি' এই অহংজ্ঞানের প্রত্যক্ষই হয়, তাহলে এই আত্মাসম্বন্ধে, প্রশ্ন করা

সম্পূর্ণ নিরর্থক। সেইজন্য তোমাকে বলি এই নিষ্প্রয়োজন আত্মতত্ত্বের উপদেশরূপ বর প্রার্থনা না করিয়া তুমি বরং শতবর্ষজীবী পুত্র পৌত্রগণ, গাভী, বৃষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুসমূহ, মণি, মানিক্য, সুবর্ণ প্রভৃতি ধনরত্ন, এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সাম্রাজ্য আমার নিকট প্রার্থনা কর। এই সব বস্তু তোমার প্রয়োজনে লাগিবে, তোমার বাসনার পরিতৃপ্তি-সাধন করিবে। তুমি নিজেও যত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে তত বৎসর পরমায়ুই প্রদান করিব, সুতরাং তুমি সুস্থ সবলদেহে উক্ত ভোগ্য-বিষয় সমূহ যতকাল ইচ্ছা ভোগ করিতে পারিবে।

হে নচিকেত, তুমি যদি এই বরের সদৃশ অন্য কোন প্রার্থনীয় আছে মনে কর তাহাও তুমি প্রার্থনা করিতে পার, তুমি দীর্ঘজীবন ও অতুল ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা কর ; শোন নচিকেত, তুমি সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হও, আর তুমি জান যে আমি সত্য-সংকল্প, সুতরাং আমি তোমাকে দেবতা ও মনুষ্যের যত কিছু কাম্যবস্তু আছে তৎসমস্তই আমি তোমাকে প্রদান করিতে পারি।

মনুষ্যলোকে যে সমুদয় কাম্যবস্তু দুর্লভ তুমি বিনাসঙ্কোচে, স্বেচ্ছায় সেই সব দুর্লভ বস্তু আমার নিকট প্রার্থনা কর। দেখ নচিকেত, ঐ যে অনুপম রূপ-লাবণ্যময়ী অপ্সরাগণ নানাবিধ সুমধুর বাদ্যযন্ত্র লইয়া বিমানোপরি বিহার করিতেছে, ঐ সব লাবণ্যময়ী দেবললনাগণকে মনুষ্যগণ কিছুতেই লাভ করিতে পারে না, কিন্তু আমি এই সব দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যশালিনী দেববধূগণকে তোমাকে প্রদান করিব, তুমি উহাদিগকে তোমার সেবা কার্যে নিযুক্ত কর। মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি থাকে না মরণ বিষয়ক এই নিরর্থক প্রশ্ন আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না।

যমরাজের সহস্র প্রলোভনেও প্রশান্ত হ্রদতুল্য নচিকেতার চিত্ত আদৌ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইল না। তিনি স্থির নিশ্চয়, তাঁহার নির্ম্মল পবিত্র মন কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হইবার নহে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন— "কঃ

ইপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ?" অভিলষিত বস্তুতে স্থিরনিশ্চয় মন এবং নিম্নাভিমুখে ধাবিত জলরাশিকে কে বিপরীত দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয় ? নচিকেতার মনে পরবৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। ঐহিক ও পারলৌকিক সমুদয় ভোগ্যবস্তুতে তাঁহার তুচ্ছবুদ্ধি জন্মিয়াছে। সেইজন্য নচিকেতা যমরাজকে বলিলেন—

শ্বো ভাবা মর্ত্তস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃ স্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণ-রতি-প্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥

হে যমরাজ, আপনি যে আমাকে পুত্র পৌত্র, ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দেবদুর্লভ

ভোগ্যবস্তু সমুদয় প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সমুদয় ভোগ্যবস্তুর স্থায়িত্ব ত আমি দেখিতে পাইতেছি না। আজ যাহা দেখিতেছি কল্য আর তাহাকে ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাই না। কি এক বিশাল শক্তি জগতের প্রত্যেক পদার্থকে ক্ষণে ক্ষণে বিকৃত করিয়া, পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক প্রাণীর তা সে মানুষই হউক, আর দেবতাই হউক, প্রত্যেকের মন, ইন্দ্রিয়, স্থূলদেহ প্রতি মুহূর্ত্তেই বিষয়ভোগ করিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। অনন্ত কালের তুলনায়, মানবের আয়ু, দেবগণের আয়ু এমন কি ব্রহ্মার আয়ু পর্য্যন্তও অল্পই; কারণ তাহা নিয়মিত। যাহা একটা নিয়মের অধীন তাহার নিত্যতা কি প্রকারে হইতে পারে? যাহা অনিত্য, যাহা সতত বিকারশীল তাহা কি প্রকারে নিত্য, স্থায়ী আনন্দ আমাকে প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? সুতরাং অপ্সরা-শোভিত আপনার দিব্য বিমান সমূহ এবং নৃত্যগীত আপনারই থাকুক উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

আরও দেখুন বিত্ত কখনও মনুষ্যকে তৃপ্তিপ্রদান করিতে পারে না। যাহার অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, বিত্ত নষ্ট হইলেও দুঃখ, উহার ব্যয়েও দুঃখ, সুতরাং এই দুঃখজনক বিত্ত কি প্রকারে মনুষ্যকে তৃপ্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? বিত্ত-তৃষ্ণার শেষ ত আমি দেখিতে পাই না। যে নিঃস্ব, যাহার কোন অর্থ নাই সে ভাবে যদি আমার একশত মুদ্রা হইত তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম, যাহার একশত মুদ্রা আছে সে ভাবে এক হাজার মুদ্রার অধিকারী হইলে সে সুখী হইত, যাহার সহস্র মুদ্রা আছে, তাহার চিত্ত লক্ষ মুদ্রা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, লক্ষপতি রাজা হইতে বাঞ্ছা করে, রাজা সম্রাট্ হইতে অভিলাষী হয়, সম্রাট্ আবার দেবলোকের অধিপতি ইন্দ্র হইতে ইচ্ছা করে, ইন্দ্র ব্রহ্মা হইতে, ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে এবং বিষ্ণুও শিবপদ লাভ করিতে অভিলাষী হন, সুতরাং বিত্ততৃষ্ণার শেষ ত আমি দেখিতে পাই না।

আপনি দেবতা, আপনার দর্শনলাভ হইলেই ত বিত্তলাভ হইবে, আর আপনি যখন আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তখন আপনার নিকট বিত্ত-প্রার্থনা না করিলেও বিত্ত-লাভ আমার হইবে। আর আপনি যে দীর্ঘ জীবনের কথা বলিয়াছেন, সেই দীর্ঘজীবন কতটুকু? যে পর্য্যন্ত আপনি যামা-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন সেই পর্য্যন্ত আপনার প্রদত্ত বিত্ত ও আয়ু আমার থাকিবে, কিন্তু তারপর? ব্রহ্মলোকের ঐশ্চর্য্যও আমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে, সুতরাং আমি যে আপনার নিকট আত্ম-বিজ্ঞানরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছি সেই আত্মবিজ্ঞানই আমার প্রার্থনীয় বর জানিবেন।

আমার সৌভাগ্যহেতু আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি; আপনিই বলুন মর্ত্যলোকবাসী মরণশীল কোন্ মনুষ্য সৌভাগ্যবশে জরামরণবর্জিত আপনার ন্যায় অমরগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া, এবং ভোগ্যবস্তুর অসারতা উপলব্ধি করিয়া, অবিবেকী পুরুষগণের আকাঙ্ক্ষিত শারীরিক-সৌন্দর্য্য, পুত্র-বিত্ত-ধন-ঐশ্বর্য্য-অপ্সরাদি অসার, তুচ্ছ বিষয়-ভোগ প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হয়? বিষয়ের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করিয়া কোন বিবেকী পুরুষ অতি দীর্ঘজীবনে আনন্দ অনুভব করিতে পারে? আপনার নিকট আসিয়া ঐ সমুদয় তুচ্ছ বিষয় হইতে উৎকৃষ্টতর বস্তু পাইবারই আশা করি। সুতরাং আমি আপনার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, অর্থাৎ আত্মাসম্বন্ধে যে সংশয় দেখা যায় কেহ বলে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ বলে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে না এই সংশয় আমার দূর করুন। এই আত্ম-বিজ্ঞানলাভ করিতে পারিলে পরলোক-সম্বন্ধে সমুদয় সংশয় দূরীভূত হইবে। সুতরাং পরলোকবিষয়ে মহা প্রয়োজন সাধনের উপযোগী এই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানই আমাকে উপদেশ করুন। যাহারা অবিবেকী, যাহাদের চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবিরত ধাবিত হইতেছে, শত শত বিষয়ভোগ করিয়াও যাহাদের ভোগবাসনা নিবৃত্তি

হয় না বরং প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় যাহাদের ভোগবাসনারূপ অগ্নি বিষয়-ভোগে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেই বিষয়াসক্ত অবিবেকী পুরুষের ইপ্সিত স্ত্রী-পুত্র-ধন-ঐশ্বর্য্য-দীর্ঘজীবনাদি তুচ্ছ বিষয় নচিকেতা—আপনার নিকট কখনই প্রার্থনা করে না। নচিকেতার চিত্তে জাগতিক সমুদয় বিষয়ের প্রতি নির্বেদ জন্মিয়াছে।

শ্রুতি বলেন—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু সে সমস্তই আমরা কর্ম্মদ্বারা লাভ করিয়া থাকি। শাস্ত্রবিহিত বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা—মনুষ্য, হয় পিতৃলোক, না হয় দেবলোক প্রাপ্ত হয়। আবার যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লংঘন করিয়া শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মনীতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে ফল লাভ হয়। কিন্তু যাহারা কেবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে পশুপক্ষীর ন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের তির্য্যক্ প্রভৃতি নীচ যোনিতে গমন করিতে হয়। সুখদুঃখময় এই সব উচ্চ নীচ লোক বা জগৎ হইতেছে সাধ্য অর্থাৎ যাহা সাধন বা কর্ম্মদ্বারা লাভ করা হয়, এবং কর্ম্ম হইতেছে সাধন বা উপায়। এই সংসার সাধ্য-সাধনাত্মক। সাধন বা কর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু লাভ করা যায় সে সমস্তই অনিত্য। কারণ কর্ম্ম সাধারণতঃ চারি প্রকার যথা:—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য এবং সংস্কার্য্য। যাহার অভাব হয় তাহা কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন করা যাইতে পারে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু আমরা কর্ম্মদ্বারা পাইতে পারি। কোন পদার্থকে কর্ম্মদ্বারা অন্য পদার্থে

পরিণত করিতে পারা যায়, এবং কর্ম্মদ্বারা কোন পদার্থ হইতে দোষ দূর করিয়া গুণের আধান করিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা জানিতে পারি যে, কর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু কৃত হয় সে সমস্তই স্থায়ী হয় না। কর্ম্মের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে যথা—অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ প্রভৃতি, সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরায় সংসারচক্রে পতন হইতে পারে,সুতরাং সকাম কর্ম্মদ্বারা লভ্য ব্রহ্মলোকেও পতনের ভয় আছে। সেইজন্য যিনি পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে অনাত্মচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিকে কেবল আত্মবিষয়িনী, নিত্যবস্তুবিষয়িনী করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত সমুদয় লোক পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন, যে, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তই স্বপ্ন-জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণ-ভঙ্গুর। তখন ঐহিক পারলৌকিক বিষয়ভোগে তিনি বিতৃষ্ণ হন; এমন কি ব্রহ্মলোকেও তাঁহার তুচ্ছবুদ্ধি হইয়া থাকে। তিনি সম্যক্‌রূপ বুঝিতে পারেন, যে, কর্ম্মদ্বারা অকৃত অর্থাৎ অভয়, অমৃত শিবস্বরূপ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারা যায় না। তখন শান্ত, দান্ত, উপরত, মুমুক্ষু, পরবৈরাগ্য-সম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণ নিত্য বস্তুকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য, শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বিধিবৎ গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করতঃ সেই অভয়, অমৃত শিবস্বরূপ অকৃত নিত্যবস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে হইলে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিতে হয়। গুরুশুশ্রূষা, গুরুর সন্তোষ-বিধান করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিলে সেই উপদেশ বীর্য্যবান্ হয়, সেই উপদেশ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। নিজে নিজে গ্রন্থপাঠ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হয়, এবং প্রকৃত

গুরুর শরণাপন্ন হইতে হয়; সেইজন্য শ্রুতি বলেন "আচার্য্যবান পুরুষো বেদ।" আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তি বেদার্থ জানিতে সমর্থ হন। উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতার নিকট হইতে যিনি সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উপনয়নের পর পিতা ও আচার্য্য কর্ত্তৃক যিনি উপদিষ্ট হইয়াছেন; প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগমদ্বারা যিনি পদার্থ-নির্ণয় পূর্ব্বক নিত্য এবং অনিত্য বস্তুসমূহের বিবেক নির্দ্ধারণ করিয়া, স্বীয় ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত এবং অনিত্যবস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধিকে সর্ব্বতোভাবে নিত্যবস্তু-বিষয়িনী করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী। ত্রিভুবনের আধিপত্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, ইচ্ছানুযায়ী পরমায়ু লাভ, সুস্থ সবল দেহ এবং দেবদুর্লভ রমণীগণের সেবা এই সব দিব্য ঐশ্বর্য্য ওজস্বী ব্রহ্মচারী নচিকেতাকে বিন্দুমাত্রও প্রলোভিত করিতে পারিল না। নচিকেতার মন স্থির, সঙ্কল্প অবিচলিত। একমাত্র আত্মবিজ্ঞান তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বপ্রকারে অধিকার করিয়াছে। "আমি কে?" আমার এই বর্ত্তমান জীবন আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ-জীবনের সহিত সম্বন্ধ, না আমার এই বর্ত্তমান জীবনই আমার প্রথম ও শেষ জীবন, এই সব প্রশ্ন যতক্ষণ না নিঃসন্দেহরূপে সুমীমাংসিত হয়, ততক্ষণ নচিকেতার শান্তি নাই। যমরাজ নচিকেতাকে আত্মবিজ্ঞানের সুযোগ্য অধিকারী অবলোকন করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে নচিকেতাকে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি,
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ,
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

এই জগতে সাধারণতঃ দুইটী পথ দৃষ্ট হয়; একটী শ্রেয় অপরটী প্রেয়; একটী পরম কল্যাণের পথ, অপরটী অতুল ঐশ্বর্য্যের পথ; একটী বিদ্যার পথ, অপরটী অবিদ্যার পথ; একটী মানুষের ভ্রান্ত-জ্ঞান দূর করিয়া, তাহার ইন্দ্রিয়ের, মনের পরিচ্ছিন্নত্ব, সসীমতা ঘুচাইয়া তাহাতে সম্যক্‌দৃষ্টি, ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ প্রদান করে। অপরটী মানুষের অহংতা ও ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করিয়া তাহাকে অপর সমুদয় বস্তু হইতে পৃথক করিয়া দেয়, এবং তাহার চিত্তে খণ্ডজ্ঞান খণ্ড ভাব জাগাইয়া তাহার মনের ও ইন্দ্রিয়ের পরিচ্ছিন্নত্ব ও সীমাবদ্ধত্ব অধিকতর দৃঢ় করিয়া তোলে। শ্রেয় হইতেছে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও নিঃশ্রেয়সের পথ এবং প্রেয় হইতেছে ভোগ, বিষয়াশক্তি ও অভ্যুদয়ের পথ। মনুষ্যগণ এই দুই পথকে অবলম্বন করিয়া জীবনে অগ্রসর হয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রয়োজন-সাধক এই শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া থাকে। যাহারা ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য্যভোগ করিবার অভিলাষ করে, তাহারা প্রেয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে। এই দুইটী পথের লক্ষ্য যখন বিভিন্ন তখন একটীকে পরিত্যাগ করিয়াই অপরটীকে অবলম্বন করিতে হয়। যে ব্যক্তি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁহার পরম কল্যাণ হয়, কিন্তু যিনি মোহ-মুগ্ধ হইয়া শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি মানব জীবনের লক্ষ্য যে পরম কল্যাণ, সেই নিঃশ্রেয়স্ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক মনুষ্যেই জল মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় এই শ্রেয় ও প্রেয় মিলিত হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু যিনি ধীর, বিবেকবৈরাগ্যবান্—তিনি শ্রেয়

ও প্রেয়ের ফল উত্তমরূপে বিচার করিয়া, প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন। যিনি অল্পবুদ্ধি, বিষয়াসক্ত তিনি শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর পুত্র, বিত্ত, যশ, মান প্রভৃতি প্রেয় বস্তুসমূহ পাইতেই অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু হে নচিকেত তুমি—

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥
দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্তঃ ॥

পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি প্রিয়বস্তু সকল, মন ও প্রাণের আনন্দদায়ক দিব্যাঙ্গনাগণ, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু-সমূহের অসারতা ও অনিত্যতা* সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমার বুদ্ধি একমাত্র নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানপরা হইয়াছে দেখিয়া, আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি অসার ও তুচ্ছবোধে যে সমুদয় ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিলে সেই সমস্ত অনিত্য, আপাতসুখকর কাম্যবস্তুসমূহে বহু অবিবেকী মনুষ্যগণ নিমগ্ন হইয়া থাকে।

এই যে শ্রেয় ও প্রেয়, এই বিদ্যা ও অবিদ্যা, ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া জানিবে। এই দুইটীর ফলও ভিন্ন। শ্রেয়ের পথ আলোকময়, প্রেয়ের পথ অন্ধকারাবৃত; যাঁহারা বিবেকী তাঁহারাই শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিয়া মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হইয়া

থাকেন, আর যাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্ত; তুচ্ছ, অনিত্য বিত্তাদিকেই যাঁহারা সার সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অন্ধকারাবৃত ঐ প্রেয়ের পথ গ্রহণ করিয়া সংসার-চক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকেন। তুমি একমাত্র বিদ্যার পথ, শ্রেয়ের পথই অবলম্বন করিয়াছ, তোমাকে দেবদুর্লভ কাম্যবস্তুসমূহও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। আত্মবিজ্ঞানই তোমার একমাত্র কাম্য বলিয়া আমার মনে হইতেছে। এই সব অদূরদর্শী মোহান্ধ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্‌
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্‌।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥

এই সব বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ পুত্র, বিত্ত, যশ, মান প্রভৃতি অসার বস্তু-বিষয়ক শত শত কামনাদ্বারা বদ্ধ হইয়া, ঘনীভূত অন্ধকারের ন্যায় অবিদ্যার মধ্যে ভ্রান্তজ্ঞানমধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করে। ভ্রান্তজ্ঞানদ্বারা অন্ধীভূত তাহাদের দৃষ্টি ত্রিকাল-প্রসারিণী হয় না। ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমান তাহাদের চিত্তে দৃঢ়মূল হইয়া উৎপন্ন হয়। তাহারা ভাবে যে তাহাদের মত শাস্ত্রকুশল পণ্ডিত আর নাই। এইরূপ বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ শোক-মোহ-জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখজালে জড়িত

হইয়া পড়ে এবং বন্ধুর পথে অন্ধকর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় অনর্থই প্রাপ্ত হইয়া, জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই সব ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি, অসংস্কৃতচিত্ত, মোহাভিভূত বলিয়া তাহাদের মলিনচিত্তে দেহপতনের পর পরলোক-সম্বন্ধী আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। এই সব প্রমাদী, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, মূঢ় ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে পরলোক নাই, মৃত্যুর পর কেহ ফিরিয়া আসিয়া পরলোকের সংবাদ প্রদান করে নাই; সুতরাং যাহা কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার বিদ্যমানতা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহলোকই আছে, এই লোক ব্যতীত মৃতব্যক্তির জন্য কোন পরলোক নাই। এই লোকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায়। এই সব অদূরদর্শী মূঢ়ব্যক্তিগণ কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে।

কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন—

এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতং।
রেতশ্চেতত্তি হস্ত-মস্তক-পদ-প্রোদ্ভূত-নানাঙ্কুরং॥
পর্য্যায়েন শিশুত্ব-যৌবন-জরা-বেশৈরনেকৈর্বৃতং।
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথাগচ্ছত্যথাগচ্ছতি॥

গর্ভে অবস্থিত এক বিন্দু রেত চেতনাযুক্ত হয় এবং বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় সেই একবিন্দু চেতনাযুক্ত রেততে হস্ত, মস্তক পদ প্রভৃতি নানাবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে, পরে সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত, একবিন্দু চেতন রেত শিশুরূপে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় এবং ক্রমে ক্রমে শৈশব, যৌবন, জরারূপ বহুবিধ বেশে ভূষিত হয় এবং দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, ভোজন ও গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহা হইতে আর অন্য ইন্দ্রজাল কি থাকিতে পারে?

এই জগৎরহস্যের মধ্যে মানুষ নিজেই এক দুর্ভেদ্য রহস্য। এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম হইতেছে "আত্মানং বিদ্ধি"। আত্মাকে জান। এই আত্মা কোন্ বস্তু? ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ আত্মাসম্বন্ধে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন এই স্থূল দেহই আত্মা, কেহ বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা, কেহ বা মনকেই আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাকে কেহ বলিয়াছেন চেতন, কেহ বলিয়াছেন জোনাকি পোকার ন্যায় আত্মা চেতনাচেতন। কাহারও মতে আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা, কাহারও মতে আত্মা ভোক্তা কিন্তু কর্ত্তা নহে। কেহ আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, অপরিণামী, নিত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ চৈতন্যকে একটি উৎপন্ন গুণবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ বহুবিধ মতবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ বলেন কোন এক যষ্টির অগ্রভাগ প্রজ্বলিত করিয়া উহাকে ঘুরাইলে যেমন একটি অখণ্ড বৃত্ত দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ ঐ বৃত্তটি যেমন অখণ্ড নহে, সেইরূপ 'অহং' বা আমি বলিয়া, আত্মা বলিয়া কোন নিত্য বস্তু নাই। 'অহং' বা আমি বা আত্মার নিত্যত্ব সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে উৎপন্ন একটা ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। প্রতিক্ষণে জাত ও নষ্ট অহংজ্ঞানের সাদৃশ্যবুদ্ধি হইতে মানুষ ভ্রমবশতঃ আত্মার নিত্যত্ব মানিয়া লইতেছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা বলিয়া যে ভ্রমজ্ঞান তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং আত্মা বলিয়া কোন বস্তু মৃত্যুর পর পরলোকে গমন করে না। মৃত্যুর পর থাকিয়া যায়—শুধু সেই মৃতব্যক্তির নাম। যদি মৃত্যুর পর কোন আত্মা পরলোকে গমন করিত, তাহা হইলে পরলোকগত সেই আত্মা নিশ্চয়ই তাহার ইহলোকের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিত "আমি এখন অমুক স্থানে

আছি”, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন আত্মাকেই ইহা করিতে দেখা যায় নাই, সুতরাং মৃত্যুর পর পরলোকগামী আত্মা কিছুতেই থাকিতে পারে না; এই জগতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব শেষ হইয়া যায়। মনুষ্যহৃদয়ে আত্মাসম্বন্ধে বহুপ্রকার সংশয় উৎপন্ন হয়। নচিকেতার হৃদয়েও আত্মা-সম্বন্ধে এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় তিনি যমরাজকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন —“মৃত্যুর পর আত্মা বলিয়া কোন বস্তু থাকে কিংবা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায়?” যমরাজ আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে নচিকেতাকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

নচিকেত, তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাহাদের মন তমঃপ্রধান, বৈদিক সংস্কার সমূহদ্বারা যাহাদের চিত্ত সুসংস্কৃত হয় নাই; যাহারা বাল্যকাল হইতেই মাতা কর্ত্তৃক, পিতা ও আচার্য্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত হয় নাই; যাহারা বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান করে নাই; যাহারা অহোরাত্র শুভ্র, দিব্য, আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সারভূত আঙ্গিরস, নাচিকেত অগ্নিকে একাগ্র উপাসনারূপ ইষ্টকদ্বারা স্বীয় চিত্তকে বেদীরূপে (আত্মজ্যোতিরূপ অগ্নির উদ্বোধন-ক্ষেত্ররূপে) গঠিত করিয়া তোলে নাই, তাহাদের সেই অসংস্কৃত, মলিন চিত্তে পরলোকতত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যা ও অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয় মানবগণকে অবিরত বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। যাহারা বিদ্যার পথ, শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করে, তাহাদেরই চিত্ত সুসংস্কৃত

হইয়া সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব-ধারণের যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু যাহারা অবিদ্যার পথে, অজ্ঞানের পথে, তমঃর পথে, প্রেয়ের পথে ভ্রান্তজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ধাবিত হয়, তাহাদের চিত্ত তমসাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, তাহাদের দৃষ্টি, তাহাদের সম্যক্ জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা, তমঃর দ্বারা আবৃত থাকাহেতু, অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায়, তাহারা অনর্থ হইতে অনর্থান্তরে পতিত হইয়া সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব কখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। শোন, নচিকেত, এই যে তমঃ বা অজ্ঞান বা অবিদ্যা ইহার স্বভাবই হইতেছে—আত্মার অনন্ত সত্তা, অনন্তজ্ঞান, অপরিসীম আনন্দকে আবৃত করা, নিজের মধ্যে লুকাইয়া রাখা, কিন্তু সচ্চিৎসুখাত্মক এই আত্মাকে অবিদ্যা বা তমঃ আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। স্বুবর্ণময় হার কি কখন স্বুবর্ণকে আবরণ করিতে পারে? আত্মাকে আবরণ করিতে যাইয়া এই অবিদ্যা নিজেই অখণ্ড ও খণ্ডরূপে, বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃরূপে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তার অখণ্ডরূপটী আত্মচৈতন্যে চৈতন্যময়, সদা প্রকাশময়, জ্যোতির্ময়, তার এই দিব্য অখণ্ডরূপটী শেষে নিজেকে সচ্চিদানন্দ আত্মাতে হারাইয়া ফেলে, নিজের স্বতন্ত্রসত্তা লুপ্ত হইয়া যায়। আর এই তমঃর খণ্ডরূপটী দেশকালে বিভক্ত হইয়া আত্মাকে আবৃত করিতে না পারিয়া আত্মাতে বিক্ষেপের সৃষ্টি করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে সৃষ্টি করিয়া এবং আত্মাতে 'অহং' এই ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া আত্মাকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আকর্ষণ করা মানে হইতেছে আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা। কিন্তু যাহারা বিদ্যার পথ অবলম্বন করে, তাহারা অবিদ্যার অধীনতা হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়। এই ক্রম-মুক্তির পন্থা তোমাকে বিশদরূপে প্রদর্শন করাইয়াছি। এখন তোমাকে সদ্যোমুক্তির পন্থা দেখাইব, কারণ তুমি আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে জানিবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু তোমার ন্যায় এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণেচ্ছু কতজনই বা বিদ্যমান আছে?

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এত প্রবল যে ইহা মানুষের ইন্দ্রিয়গণকে, অন্তঃকরণকে অবিরত—রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে আকর্ষণ করিয়া সেই সেই পদার্থে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে, সেইজন্য অধিকাংশ মানুষই বহির্মুখ; তাই তোমাকে বলিয়াছি এই আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে শুধু শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণও দুর্লভ, আত্মবিজ্ঞান-শ্রবণেচ্ছু মুমুক্ষুগণ শ্রবণ অর্থাৎ বিচারদ্বারা এই আত্মবস্তুকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না; আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে বিচারশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যে বহু ব্যক্তিই চিত্তের অশুদ্ধিতা নিবন্ধন আত্মাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এই আত্মাসম্বন্ধে যিনি উপদেশ করেন তিনি একজন আশ্চর্য্য ব্যক্তি, বিচার এবং অনুভূতিতে যিনি সমর্থ—তিনিই এই আত্মাকে লাভ করিতে পারেন; এবং যিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, এই আত্মাকে অবগত হইয়াছেন তিনিও আশ্চর্য্য। এই আত্মবস্তু এবং সেই আত্মবস্তুর বক্তা এবং এই আত্মবস্তুকে যিনি জানেন তাঁহারা সকলেই আশ্চর্য্য, কেন, বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতেছে সচ্চিৎসুখাত্মক। এই আত্মা সৎ হইয়াও, নিত্য হইয়াও, আত্মা নাই, আত্মা অসৎ, অনিত্য এইরূপে মূঢ় ব্যক্তির নিকট প্রতীত হইতেছে। অবিদ্যাই এই অসম্ভাবনা বুদ্ধি জাগাইয়া তুলিতেছে। আরও দেখ এই আত্মা চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশ হইলেও আত্মা জড়, আত্মা চেতনা-চেতনাত্মক এইরূপ বুদ্ধির বিষয় হইতেছে, আত্মা নির্ব্বিকার, আনন্দস্বরূপ হইলেও ইহাকে বিকারী সুখী দুঃখী বলিয়া বোধ হইতেছে। ... আত্মা জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি-বর্জ্জিত হইলেও ইহাকে জাত, মৃত, ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। শোন নচিকেত, এই আত্মা এক, অদ্বিতীয় হইলেও ইহাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সদ্বিতীয় বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং তুমি দেখিতে পাইতেছ নচিকেত, এই আত্মবস্তু কিরূপ আশ্চর্য্য, কিরূপ দুর্বিজ্ঞেয়। যাহারা শান্ত, দান্ত, উপরত, মুমুক্ষু, তাহারা শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্তৃক সম্যক্ উপদিষ্ট হইয়া বদ্ধের ন্যায় অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি-

মানের ন্যায় প্রতীত এই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মাকে অবগত হইতে পারে।

আরও দেখ, নচিকেত, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ লইয়াই আমাদের শব্দ-জনিত জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার কোন জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ নাই সুতরাং শব্দদ্বারা কি প্রকারে শব্দের অবিষয় সেই আত্মবস্তু-সম্বন্ধে উপদেশ করা যাইতে পারে? অথচ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ভাগ্যবান্ বহুব্যক্তি স্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে একটী বিস্ময়ের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার যখন এই আত্মজ্ঞান হয়, তখন নানাত্ব চলিয়া যায়, একমাত্র আত্মবস্তুই বিদ্যমান থাকে, ইহাই কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ, নচিকেত! এই আত্মবিজ্ঞান কত দুর্বিজ্ঞেয়! নচিকেত, তুমি ইহা নিশ্চিতরূপে জানিও—

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি,
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥৩৭

এই আত্মবিজ্ঞান অবিবেকী, অসম্যক্‌দর্শী ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে কখনই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আত্মাসম্বন্ধে অস্তি, নাস্তি, কর্ত্তা, ভোক্তা প্রভৃতি বহুবিধ সংশয়ের নিরসন হয় না। যিনি ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি বেদবিৎ, বিচার-কুশল, সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে অবগত আছেন, সেই অভেদ-দর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে, সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি, অস্তি, নাস্তি ইত্যাদি আত্মাবিষয়ক সমস্ত বিকল্প, সমস্ত সংশয়

বিদূরিত হইয়া যায়, তখন একমাত্র আত্মবস্তুই বিদ্যমান থাকে বলিয়া, আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকেনা। সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব-অনুভবকারীর সংসারচক্রে আর গতাগতি করিতে হয় না। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্তৃক আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে, শিষ্যেরও সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভূতি হইয়া থাকে। কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা এবং স্বীয় প্রতিভাবলে তর্কদ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না; কারণ তর্কের বিরাম নাই; একজন যাহা তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা আবার সেই ব্যক্তি হইতে অধিকতর তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বাধিত হইতে পারে। তাই বলি, নচিকেত, এই আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে জানিতে হইলে স্বয়ং শান্ত, দান্ত, উপরত ও মুমুক্ষু হইতে হইবে, যম নিয়মাদি অবলম্বন করিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করিয়া, সেই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট হইতে এই আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি যোগ্য অধিকারী কারণ—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি,
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৮॥

আত্মবিষয়ে তোমার যে অবিচলিত বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শুধু তর্ক-প্রসূতা নয়, এই বুদ্ধি ব্রহ্মাত্মৈকদর্শী আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে শিষ্যহৃদয়ে যে অব্যভিচারিণী আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ইহা সেই বুদ্ধি। তর্কের দ্বারা, প্রলোভনের দ্বারা আত্মবিষয়িণী তোমার এই মতিকে বিচলিত করিতে পারা যায় না। তুমি সত্য-সংকল্প, তুমি আমার অতি

প্রিয়তম, তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসুই যেন আমাদের নিকট আগমন করে, এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন হয়—এই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অভাববোধ। তারপর অসাধারণ ধৈর্য্য, সংকল্পের দৃঢ়তা; চিত্তের শান্তভাব, লক্ষ্য বিষয়ে চিত্তের ঐকান্তিক আগ্রহ। এই সদ্‌গুণগুলির সকলই তোমাতে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তুমি এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। শোন নচিকেত—

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যম্,
নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥৩৯॥

সুখময় ভোগৈশ্বর্য্যরূপ শেবধি যে অনিত্য তাহা আমি জানি, এবং ইহাও আমি অবগত আছি যে, অনিত্য অধ্রুব বস্তুদ্বারা নিত্য ধ্রুব পরমাত্মবস্তু লাভ করা যায় না। সেইজন্য আমি নাচিকেত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছি এবং অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নিত্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি।

যমরাজ নচিকেতাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—শোন নচিকেত, এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক প্রয়োজন। আমিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধক অবস্থায় এই নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক করিয়াছি। এই নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে 'শেবধি' অনিত্য। 'শেবধি' মানে কি তাহা তুমি জান। 'শেবং', সুখং ধীয়তে অস্মিন্ ইতি শেবধিঃ। যাহাতে সুখ আছে তাহাই শেবধি। স্ত্রী, পুত্র, ধনদৌলত, আত্মীয়স্বজন, যশ, মান, প্রভুত্ব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি হইতে মানুষ সুখপ্রাপ্ত হয়, সেইজন্য

মানুষ মনে করে ঐ সব বস্তুই সুখদায়ক। এবং সেই সেই বস্তুলাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। কিন্তু নচিকেত, তুমি যদি উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে ঐ সমুদয় ভোগ্যবস্তু সুখ স্বরূপ নহে। ঐ যে বস্তুসমুদয় আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, উহাদের অস্তিত্ব কতটুকুকাল স্থায়ী? ঐ সব ভোগ্য বস্তু উৎপন্ন হইয়াই বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই বৃদ্ধি মানে হইতেছে পরিণাম, পরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। জগতের প্রত্যেক বস্তুই অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে এবং নশ্যতি—এই ছয়টী বিকারযুক্ত। যাহা বিকারী, যাহা পরিণামী তাহা কখন নিত্য হইতে পারে না, কখন 'সৎ' হইতে পারে না, কখন 'স্ব-প্রকাশ' হইতে পারে না। আর এই যে, বিকার, এই যে পরিণাম ইহা 'ক্রম' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? একটী ক্ষণের পর আর একটী ক্ষণ, তারপর আর একটী ক্ষণ এইরূপে ক্ষণ-রূপী ক্রমপ্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। এই ক্ষণ হইতেছে 'কাল'। অনাদি, অনন্ত এক মহাশক্তি অবিরত দেশ ও কালরূপে, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, বিপল, পল, দণ্ড, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প প্রভৃতি রূপ ধরিয়া নিজের ভিতর লুক্কায়িত এক নিত্য, অপরিণামী, সচ্চিৎ আনন্দঘন বস্তুকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য কোটি কোটি জগৎ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই মহাশক্তি জড় নয়, ইহা চিন্ময়ী। এই মহাশক্তিকে কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ রাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ হিরণ্যগর্ভ, কেহ প্রাণ, কেহ ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন; সৃষ্টির দুই রূপ একটী ব্যক্ত, অপরটী অব্যক্ত। ব্যক্ত সৃষ্টি আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম-রূপে বিভক্ত। আর সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থা হইতেছে স্বয়ং এই চিন্ময়ী মহাশক্তি। জগতের যাবতীয় পদার্থই এই চিন্ময়ী মহাশক্তির ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিকাশ মাত্র। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে এই জগৎরূপ আড়ম্বরের বিকাশ হইয়াছে শুধু সেই এক, নিত্য, অপরিণামী, স্বপ্রকাশ,

আনন্দস্বরূপ সৎ বস্তুকে উপলব্ধি করিবার জন্য। এই আনন্দই হইতেছে জগতের স্বরূপ, এই স্বরূপ লাভের জন্যই প্রাণিগণ জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ কার্য্য করিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রাণিগণ যখনই আনন্দ উপলব্ধি করে, তখনই তাহারা এই আনন্দকে নাম ও রূপের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া অনুভব করে এবং অজ্ঞানবশতঃ নাম ও রূপকেই আনন্দের নিলয় বলিয়া মনে করে এবং নাম ও রূপে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই নাম ও রূপ অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে চলিয়াছে, সেইজন্য জীবগণ নাম ও রূপ লইয়া নিত্য আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে না, তাই তাহারা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবিরত ধাবিত হইয়া অশান্তিই ভোগ করিয়া থাকে। নাম ও রূপাত্মক সমুদয় জগৎ অনিত্য অধ্রুব। এই অনিত্য অধ্রুব বস্তুকেই যাহারা আনন্দ বলিয়া মনে করে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বস্তু লাভই যাহারা একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করে, তাহারা কখনই এই অনিত্য অধ্রুব বস্তু দ্বারা নিত্য, ধ্রুব সচ্চিৎ আনন্দঘন বস্তুকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সেইজন্য, নচিকেত, আমি অগ্নিকে আমার অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিয়াছিলাম। এই অগ্নি আমার অন্তঃশরীরে প্রকাশিত হইয়া আমার মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ এবং স্থূলদেহের পরিচ্ছিন্নতা, সসীমতা, মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া সর্ব্বাত্মপদ প্রদান করিয়াছে। লোকে যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক দূর করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অনিত্য বস্তুর সাহায্যে আমার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহকে পবিত্র করিয়া, বিশুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মী তনু অর্থাৎ এই নিত্য সচ্চিৎ আনন্দঘন বস্তুর উপলব্ধি করিবার উপযোগী করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমি সেই অনিত্য বস্তুর সাহায্যে নিত্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যমলোক নষ্ট হইলে, সমস্ত জগৎ প্রলীন হইলেও আমার নাশ নাই, জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের

অতীত হইয়া আমি এক্ষণে স্বস্থ হইয়াছি। তোমরা যাহাকে জগৎ জগৎ বলিয়া অভিহিত কর, নাম ও রূপ দিয়া বিশেষিত কর, যাহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিয়া থাক আমার দৃষ্টিতে তাহা ঐরূপে ভাসে না। আমি দেখিতেছি "আনন্দরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি"। যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা একমাত্র আনন্দ, অমৃত।

নচিকেত, তোমার উপর আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এই আত্মতত্ত্বোপদেশের যোগ্য ব্যক্তি বলিয়াই তোমাকে বোধ হইতেছে। কারণ তুমি প্রকৃত বিবেকী।

কামস্যাপ্তিং, জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥

ব্রহ্মলোকেও তুমি তুচ্ছধী হইয়াছ। এই ব্রহ্মলোক বা হিরণ্যগর্ভ লোকই হইতেছে পুণ্যকর্মের চরম ফল। যাহারা ব্রহ্মলোকের অনন্তজীবনের দিব্য আনন্দভোগ করিবার কামনা করিয়া তপস্যাদি করিয়া থাকে তাহারা স্বীয় তপস্যা বলে ব্রহ্মলোকে গমন করে কিন্তু পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় সংসারচক্রে পতিত হয়; কিন্তু যাহাদের ব্রহ্মলোকের দিব্য ঐশ্বর্য্য ভোগের কামনা থাকে না তাহারা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত স্বীয় তপস্যাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মলোকে অবস্থান করে, তাহাদের আর পতনের ভয় থাকেনা, ব্রহ্মলোক হইতেই তাহারা মুক্তিরূপ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া স্বরূপে স্থিত হয়। কিন্তু তুমি অণিমাদি দিব্য ঐশ্বর্য্য-যুক্ত আনন্দময় ব্রহ্মলোকের ভোগও অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়াছ; সুতরাং তুমি আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রকৃত

অধিকারী। বিবেকজ বৈরাগ্য দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে, চিত্তশুদ্ধ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধ না হইলে এই আত্ম-তত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, কারণ—

> তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
> গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
> অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং
> মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি॥

সেই জ্যোতিঃস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, সৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, স্বপ্রকাশ আত্মা দুর্দশ, অতিসূক্ষ্ম, সেইজন্য তপস্যা এবং উপাসনারূপ একতান অভিধ্যান দ্বারা বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, নির্ম্মল করিতে হইবে, বিবেকজ বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তকে সুসংস্কৃত করিতে হইবে, তাহা না হইলে আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, আকাশেরও অন্তর্বহিঃ ব্যাপিয়া যিনি স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান, আকাশেরও যিনি কারণ সেই সচ্চিৎ-আনন্দঘন আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তুমি দেহ হইতে বিলক্ষণ যে আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ সেই আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলে সংসার-চক্র নিবর্ত্তিত হয়, এবং নিত্য, অক্ষয় পরমানন্দ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই আত্মা অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে, সেইজন্য যাহারা বহির্মুখ, যাহাদের চিত্ত স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্যে আসক্ত, যাহারা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকেই সত্য বলিয়া মনে করে, যাহারা ঐহিক পারলৌকিক ভোগকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছে সেই বিষয়াসক্ত, আত্মবিমুখ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মা প্রচ্ছন্ন। তাহারা আত্মাকে দেখিতে পায় না। এই আত্মা বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত কারণ নির্ম্মল, সুসংস্কৃত বুদ্ধিতে এই আত্মাকে উপলব্ধি

করিয়া মানুষ কৃতকৃত্য হয়। নচিকেত, তুমি সমুদ্র দেখিয়াছ? সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গের ভয়ঙ্করী, মনোমুগ্ধকরী ক্রীড়া দেখিয়াছ? কিন্তু এই শত সহস্র তরঙ্গ-সমাকুল ভয়ঙ্কর, বিশাল সমুদ্রকেই লোকে রত্নাকর বলিয়া অভিহিত করে, কারণ সমুদ্রের অতল তলে লুক্কায়িত রহিয়াছে, মুক্তা, মণি, মাণিক্য। সেইরূপ এই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য্য, ঈর্ষা দ্বেষ, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধিরূপ সহস্র সহস্র অনর্থ-সমাকুল, বিশাল নামরূপাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চে গূঢ় রহিয়াছে, লুক্কায়িত রহিয়াছে, প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে অজর, অমর, অভয়, অশোক অমৃতস্বরূপ সচ্চিৎ-আনন্দঘন আত্মা। রত্নাভিলাষী নাবিক যেমন অতি কষ্টে অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রে গমন করে এবং সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় এবং অতিকষ্টে রত্ন লাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকে, সেইরূপ নির্ম্মল-বুদ্ধি-সম্পন্ন, সুসংস্কৃত-চিত্ত ব্যক্তি নামরূপকে তুচ্ছ করিয়া নামরূপে প্রচ্ছন্ন আত্মতত্ত্বকে সম্যকরূপে অবগত হইয়া, কৃতকৃত্যতা লাভ করে। কণ্টক-সমাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে যেমন মণি লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ দুঃখ সমাকীর্ণ এই জগৎপ্রপঞ্চে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আনন্দঘন আত্মা। সেইজন্যই তোমাকে বলিয়াছি এই আত্মা দুর্দশ। কিন্তু দুর্দশ হইলেও এই আত্মাকে দেখিতে হইবে; জানিতে হইবে, কারণ এই আত্মদর্শন হইতে, এই আত্মজ্ঞান হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠবস্তু নাই, যেহেতু এই আত্মদর্শন হইলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সর্ব্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই আত্মা চির নূতন, 'পুরা এব নব' যুগ যুগ ধরিয়া এই আত্মা স্ব-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইহা পুরাণ, সনাতন, নিত্য। যিনি ধীর যিনি ধী অর্থাৎ বুদ্ধিকে ঈরয়তি অর্থাৎ পরিচালনা করেন। যাঁহার সত্তায়, যাঁহার চৈতন্যজ্যোতিতে বুদ্ধি চৈতন্যময়ী হইয়া বিষয়সমূহে ধাবিত হয় সেই সচ্চিদানন্দ আত্মাকে যিনি জানেন তিনিই

ধীর, সেই ধীর ব্যক্তি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্বসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বিমল আনন্দে স্থিতিলাভ করেন। এই আত্মাই মরণশীল মনুষ্যের একমাত্র কাম্য, এই আত্মদর্শনই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শোন নচিকেত—

এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেনমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ংহি লব্ধ্বা ;
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥

এই আত্মতত্ত্ব স্বয়ং গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া লাভ করা যায় না। ইহা জানিতে হইলে শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মাসম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপরে দেহ হইতে বিলক্ষণ সকলের আশ্রয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আনন্দস্বরূপ এই আত্মাকে অভেদে স্বীয় আত্মস্বরূপে মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। তৎপরে নিদিধ্যাসন যখন একতানতাপ্রাপ্ত হইয়া নিবিড় ও গভীর হইবে তখনই মনুষ্য পরমসুখদ এই আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া নিরতিশয় আনন্দে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। হে নচিকেত, তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল, তোমার চিত্ত সুসংস্কৃত, তুমি প্রকৃত বৈরাগ্যবান্, সুতরাং আমি মনে করি এই আত্মতত্ত্বরূপ মন্দিরের দ্বার তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে।

নচিকেতা যমরাজের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলিলেন—ভগবন্, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমাকে যদি এই দেহব্যতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব-শ্রবণের যোগ্য অধিকারী বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা—
দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যৎ তং পশ্যসি তদ্ বদ ॥

হে যমরাজ, আপনি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী এবং সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল হইতে পৃথক, সেইরূপ অধর্ম্ম এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক, এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকাল হইতে বিলক্ষণ যে বস্তু আপনি সর্ব্বদা উপলব্ধি করেন তাহাই আমাকে বলুন। দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-বিশিষ্ট, তাহা অনিত্য; যাহা কর্ম্মদ্বারা লভ্য তাহাও বিনাশী। সুতরাং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, কার্য্য কারণ, সাধ্য সাধন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব হইতে বিনির্মুক্ত যে বস্তু যাহা আপনি স্পষ্ট দেখিতেছেন, স্পষ্ট অনুভব করিতেছেন, যাহার সাক্ষাৎকারে আপনি দ্বন্দ্বাতীত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যে বস্তু লাভ করিয়া আপনি সংসার-চক্র হইতে মুক্ত হইয়াছেন সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আমি তৃতীয় বর প্রার্থনা দ্বারা আপনার নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, মৃত্যুর পর 'আত্মা' বলিয়া 'আমি' বলিয়া কোন বস্তু থাকে কিংবা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায়। তাহার উত্তরে আপনি বলিয়াছিলেন যে যাহারা প্রমাদী, যাহারা বিষয়াসক্ত, স্ত্রী, পুত্র, ধনদৌলৎকে, কেবলমাত্র ভোগকেই সত্য বলিয়া মনে করে, সর্ব্বদা অজ্ঞান-অন্ধকারে বর্ত্তমান সেইসব ব্যক্তির নিকট পরলোকতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসার চক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তৎপরে আপনি আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর প্রদান না করিয়া এমন একটী বস্তুসম্বন্ধে ইঙ্গিত করিলেন যাহা নিত্য, অখণ্ড, একরস, সর্ব্বানুস্যূত,

নির্মল বুদ্ধিতে অবস্থিত, যাহাকে অধ্যাত্মযোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহাকে অবগত হইলে মরণশীল মনুষ্য হর্ষশোক প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে। এই নিত্য, অবিকারী, অখণ্ডৈকরস, বস্তুর সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐ বস্তুর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাই বা কি তাহা স্পষ্ট করিয়া আমাকে বলুন।

নচিকেতার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যমরাজ অতিশয় প্রীত হইলেন। যমরাজ এতদিন ধরিয়া জিজ্ঞাসু নচিকেতার মনকে জিজ্ঞাস্যবিষয়ে একাগ্র করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। চিত্ত একাগ্র না হইলে উপদেশ-শ্রবণ কখনই ফলপ্রসূ হয় না। আচার্য্যের নিকট, মহাপুরুষের নিকট বহু শ্রোতা গমন করিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট দীক্ষিতও হন, কিন্তু সেই সব শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বহু ব্যক্তিই বিফল-মনোরথ হইয়া গুরু, আচার্য্য বা মহাপুরুষ কর্তৃক প্রদর্শিত সাধন-পন্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়েন এবং বলিতে থাকেন "আমি এই ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া মন্ত্র জপ করিতেছি, গুরুদেবের পাদুকা, প্রতিমা পূজা করিতেছি, পুষ্পমাল্যদ্বারা তাঁহার বিগ্রহ সজ্জিত করিতেছি, প্রত্যহ গীতা, ভাগবত উপনিষৎ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠ করিতেছি, কিন্তু কৈ শান্তি ত পাইলাম না, ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার ত হইল না, কেবল দুঃখ কষ্টই ভোগ করিতেছি"। সাধকহৃদয়ে এই নৈরাশ্যের কারণ কি? সাধক দীর্ঘকাল ধরিয়া পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যানাদি করিয়াও কেন নিরাশ হইয়া পড়েন? ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে চিত্তের একাগ্রতার অভাব, কায়মনোবাক্যে গুরু বা আচার্য্য বা মহাপুরুষের উপদেশ সমূহ প্রতি-পালন না করা। গুরু হয়ত বলিলেন "পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিবে না"। কিন্তু কয়জন এই উপদেশপালন করিয়া থাকেন? অনেকই শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন শিবলিঙ্গ দ্বিবিধ, স্থাবর ও জঙ্গম —"স্থাবরং লিঙ্গমিত্যাহুস্তরুগুল্মাদিকং তথা। জঙ্গমং লিঙ্গমিত্যাহুঃ

ক্রিমিকীটাদিকং তথা॥ স্থাবরস্য চ শুশ্রূষা জঙ্গমস্য চ তর্পণম্। তত্তৎ-সুখানুরাগেন শিবপূজাং বিদুর্বুধাঃ॥" তরুগুল্মাদি হইতেছে শিবের স্থাবর লিঙ্গ এবং ক্রিমি কীট হইতে মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ হইতেছে শিবের জঙ্গম লিঙ্গ। ইহাদের সন্তোষ বিধানই হইতেছে শিবপূজা। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "যস্মাৎ নোদ্বিজতে লোকো, লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ"। কিন্তু কয়জন গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি ভগবানের এই উপদেশ পালন করেন? এক ঘণ্টা, আধা ঘণ্টা শ্রীগুরুর প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া পুষ্পচন্দনে তাঁহার বিগ্রহ ও পাদুকা সজ্জিত করিয়া শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহার পূজা করিয়া উঠিয়াই যদি কেহ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিতে থাকে, সর্ব্বদেহে স্থিত শ্রীগুরু ও শিবকে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অপমান ও দুঃখ প্রদান করিতে থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পূজা শ্রীগুরুও গ্রহণ করেন না, শিবও গ্রহণ করেন না। শ্রীগুরুর উপদেশ, শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে নিজের চরিত্র গঠন করাই গুরুপূজা। গুরু আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে না চলিলে গীতাপাঠ, উপনিষৎ পাঠ, তীর্থ ও শাস্ত্রী প্রভৃতি উপাধিলাভ নিরর্থক হইয়া থাকে, উহাতে না হয় চিত্তশুদ্ধি, না হয় ইষ্টসাক্ষাৎকার। শাস্ত্র, গুরু বা আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে চলিতে চলিতে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে এবং মনও একাগ্র হয়। মন একাগ্র হইলে যে বিষয়সম্বন্ধে ধ্যান করা যায় সেই বিষয়ের তত্ত্ব সহজে অবগত হইতে পারা যায়। সেইজন্য যমরাজ নচিকেতার মনকে আত্মতত্ত্ববিষয়ে একাগ্র করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়াছিলেন। যমরাজ যখন দেখিলেন নচিকেতা ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগে বীতস্পৃহ, একমাত্র আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার মন সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তখন তিনি বলিলেন—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

সমস্ত বেদ যে পদসম্বন্ধে (প্রাপ্তব্য বস্তুসম্বন্ধে) উপদেশ দেন, যাহাকে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্র তপস্যার বিধান করিয়াছেন, যাহাকে পাইতে অভিলাষী হইয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন করিয়া থাকে সেই প্রাপ্তব্য বস্তুকে সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। এই বস্তুটী হইতেছে 'ওম্'।

'ওম্' এই অক্ষরই হইতেছে অপরব্রহ্ম; যাহা পরব্রহ্ম, তাহাও এই ওঙ্কারই; এই অক্ষরকে অবগত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

পর ও অপর ব্রহ্মলাভের যত কিছু সাধন আছে সেই সমুদয় সাধনের মধ্যে এই ওঙ্কার হইতেছে শ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রেষ্ঠ আলম্বন। ওঙ্কাররূপ এই আলম্বনকে বিদিত হইয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহিমা-মণ্ডিত হইয়া অবস্থান করেন।

নচিকেতাকে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ করিতে গিয়া যমরাজ বলিলেন যে, সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু, সমস্ত তপস্যার লক্ষ্য, যাহা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করা যায় সেই বস্তু হইতেছে কেবল একটী অক্ষর—ওম্। শ্রুতি শতমুখে এই ওঙ্কারের প্রশংসা করিয়াছেন। এই ওঙ্কার হইতেছে

পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যে সমুদয় সাধন আছে, সেই সাধন সমুদয়ের মধ্যে ওঙ্কারই হইতেছে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। গোপথ ব্রাহ্মণে ঋষি বলিয়াছেন যে দেবগণ এই ওঙ্কার দ্বারাই অসুরগণকে পরাভূত করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা চিন্তা করিয়াছিলেন "কোন্ একটী অক্ষর দ্বারা সমুদয় কামনা, সমুদয় লোক, সমস্ত দেবতা, সব বেদ, সব যজ্ঞ, সব শব্দ, সব যজ্ঞফল, স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূত আমি অবগত হইতে পারি"। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুশীলন করিয়া সেই একটী অক্ষরকে দেখিয়াছিলেন। সেই অক্ষরটী হইতেছে ওম্। তিনি দেখিলেন এই ওম্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দ্বিবর্ণ, চতুর্মাত্র, ব্রাহ্মী, ব্যাহৃতি, ব্রহ্মদৈবত। ব্রহ্মা স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে এই ওঙ্কার হইতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত যত কিছু পদার্থ আছে সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। ঐতরেয় প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণেও ওঙ্কারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ওঙ্কারের ছন্দ হইতেছে গায়ত্রী। গায়ত্রীর নগ্নরূপই ওঙ্কার। গায়ত্রী তাঁহার নগ্নরূপ এই ওঙ্কার দ্বারাই তৃতীয় স্বর্গ হইতে অমৃত আহরণ করিয়া দেবগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

> ওঁম্ ইতি এতৎ অক্ষরং ইদং সর্ব্বং।
> ভূতং, ভবৎ, ভবিষ্যৎ ইতি সর্ব্বং ওঙ্কার এব।
> যৎ চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব।

ওঁম্ এই অক্ষরই হইতেছে এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান যাহা কিছু তৎ সমস্তই ওঙ্কারাত্মক। ত্রিকালের অতীত

যাহা কিছু আছে তাহাও ওই ওঙ্কারই। উক্ত মাণ্ডুক্য উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে—

সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্-আত্মা ব্রহ্ম।

এই সব নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ, এই আত্মা ব্রহ্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে ওঁম্ এবং ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নামরূপাত্মক। নাম হইতেছে শব্দ। শব্দ আবার বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কিন্তু সমুদয় শব্দই ওঙ্কারাত্মক, ওঙ্কার হইতে কি প্রকারে এই নামরূপাত্মক জগৎ হইয়াছে তাহার একটী চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

অ								
	অ	আ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
	ই	ঈ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
	ঋ	ৠ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
	ঌ	ৡ	ত	থ	দ	ধ	ন	
উ	উ	ঊ	প	ফ	ব	ভ	ম	ম্

উপরি প্রদর্শিতচিত্রের মধ্যে যে সব স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ প্রদর্শিত হয় নাই তাহারা দন্ত্য, ওষ্ঠ, কণ্ঠ্য ও তালব্য। ইহাদের মধ্যে কোন না কোন একটী হইবে বলিয়া সমুদয় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উক্ত চিত্রের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত চিত্রটী একটী সমকোণক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের বিস্তার হইতেছে অ উ বাহু এবং দৈর্ঘ্য হইতেছে উ ম্ বাহু। সুতরাং এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হইতেছে দৈর্ঘ্য×বিস্তার অর্থাৎ অ উ×উ ম্=অ উ ম্=ওম্। অতএব নামরূপাত্মক সমুদয় জগৎ ওঙ্কারই। কেহ কেহ ওঙ্কারকে ওঁম্ এইরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন; ইহার অর্থ হইতেছে অ, উ, ম, নাদ ও বিন্দু।

বিন্দু হইতেছে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ-বিহীন। বিন্দুর না আছে দৈর্ঘ্য, না আছে প্রস্থ, না আছে বেধ। অথচ বিন্দুকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। বিন্দুকে বুঝাইতে হইলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ তাহাতে আরোপ করিয়া, তাহাতে নাম ও রূপ আরোপ করিয়া বুঝাইতে হয়। বিন্দু যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অঙ্কিত হউক না কেন একটু না একটু পরিমাণ তাহার থাকিয়া যাইবেই। বিন্দু আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না অথচ তাহার সত্তা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, কারণ বিন্দুর সত্তা স্বীকার না করিলে রেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত প্রভৃতির অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিন্দুর চলনই রেখার সৃষ্টি করে আবার ক্ষেত্রগুলি হইতেছে বিভিন্ন রেখাসমূহের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান মাত্র। রেখা, ক্ষেত্র সবই বিন্দুময়; সবই বিন্দুর বিস্তার। কিন্তু বিন্দুর যাহা লক্ষণ, সেই লক্ষণ অনুসারে বিন্দুর চলন ও বিস্তার সম্ভব হয় না। এই চলন ও বিস্তার আমরা বিন্দুতে আরোপ করিয়া বিন্দুর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। সেইরূপ ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া আমরা সেই বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি যাহা বিন্দুর ন্যায়—

নান্তঃ প্রজ্ঞং, ন বহিঃ প্রজ্ঞং, নোভয়তঃ প্রজ্ঞং,
ন প্রজ্ঞানঘনং, ন প্রজ্ঞং, নাপ্রজ্ঞং, অদৃশ্যং,
অব্যবহার্য্যং, অগ্রাহ্যং, অলক্ষণং, অচিন্ত্যং,
অব্যপদেশ্যং, একাত্মপ্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চোপশমং,
শান্তং শিবম্, অদ্বৈতং, চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা,
স বিজ্ঞেয়ঃ।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা মনে করেন ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া যে বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় সেই বস্তুটী হইতেছে আত্মা। এই আত্মা

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হইতে পৃথক্ এবং যদি কিছু বিশেষরূপে জানিবার থাকে তাহা হইলে এই আত্মাই একমাত্র বিজ্ঞেয়, কারণ এই আত্মদর্শন হইলে সর্ব্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।" আমাদের যতকিছু জ্ঞান হয়, আমাদের সমস্ত জগৎ তিনটী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটী অবস্থা হইতেছে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটী প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই উনিশটীদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি বিষয়সমূহ স্থূলরূপে ভোগ করিয়া থাকি, স্বপ্নাবস্থায় ঐ উনিশটীদ্বারা সূক্ষ্মভাবে বিষয়সমূহ ভোগ করি, আবার সুষুপ্তি অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান আমাদের হয় না। কিন্তু আত্মা জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় বিষয়সমূহ স্থূলরূপে ভোগ করেন না বলিয়া তিনি 'বহিঃপ্রজ্ঞ' নহেন, স্বপ্নের ন্যায় বাসনাময় সংস্কারসমূহ অন্তঃকরণে ভোগ করেন না বলিয়া তিনি 'অন্তঃপ্রজ্ঞ'ও নন কিংবা জাগ্রৎ স্বপ্নের অন্তরালবর্ত্তী অবস্থারও জ্ঞাতা নহেন, কিংবা সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন নহেন বলিয়া তিনি "প্রজ্ঞানঘনও" নন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাতাও নন, কিংবা অচেতন জড়ও নহেন। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া 'অদৃশ্য', কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া 'অগ্রাহ্য' এবং সেইজন্য তাঁহাকে কোন ব্যবহারের মধ্যে লইয়া আসা যায় না, সেইহেতু তিনি 'অব্যবহার্য্য।" প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহেন বলিয়া এবং অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে বলিয়া আত্মা অনুমান প্রমাণেরও অবিষয়, সেইহেতু তিনি "অলক্ষণ"। আত্মা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবিষয় বলিয়া "অচিন্ত্য"। "অচিন্ত্য" বলিয়া কোন শব্দদ্বারাও তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, সেইজন্য তিনি 'অব্যপদেশ্য'। আত্মা যদি ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির অবিষয়, কোন শব্দদ্বারা যদি তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন কি প্রকারে হইতে পারে এবং কি প্রকারেই বা

সর্ব্ববিধ দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তি হইবে? সেইজন্য বিবেকীগণ বলিয়া থাকেন—

যদাদত্তে যদাপ্নোতি, যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যদস্য সন্ততভাবস্তস্মাৎ আত্মেতি গীয়তে॥

আত্মা জাগ্রৎ অবস্থার সংস্কারসমূহ লইয়া স্বপ্নে সেই সংস্কারদ্বারা বিষয় সৃষ্টি করিয়া সূক্ষ্মরূপে সেই বিষয়গুলি ভোগ করেন এবং পরে ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার উপসংহৃত করিয়া সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞান ও আনন্দ অনুভব করেন, তদনন্তর আবার জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলরূপে বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। জাগ্রৎ অবস্থার পর স্বপ্নাবস্থা, স্বপ্নাবস্থার পর সুষুপ্তি, সুষুপ্তির পর আবার জাগ্রৎ। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তি থাকেনা, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির অভাব, আবার সুষুপ্তি অবস্থায় না থাকে জাগ্রৎ, না থাকে স্বপ্ন। সুতরাং এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পরস্পর ব্যভিচারী, পরিবর্ত্তনশীল, পরিণামী। কিন্তু এই অবস্থাত্রয়কে প্রকাশিত করিয়া চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা স্বীয় স্বরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। এই নিত্যত্ব, এই ব্যাপিত্ব, এই একরূপত্বের জন্য অবস্থাত্রয়ের অবভাসক স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতিকে পণ্ডিতগণ আত্মা বলিয়া অভিহিত করেন। ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া যে বস্তু লাভ করা যায় তাহা হইতেছে আত্মৈকত্বজ্ঞানের সার বা পরাকাষ্ঠা। এই আত্মজ্ঞান বা আত্মদর্শনে সমস্ত প্রপঞ্চ উপশান্ত হইয়া যায়, সমস্ত দ্বন্দ্বের, সমস্ত বিরোধের অবসান হয়, ইহা অদ্বৈত, পরম মঙ্গলস্বরূপ। এই আত্মা আছে বলিয়াই জগৎ আছে বলিয়া বোধ হয়, এই আত্মা অখণ্ড, একরস, সৎস্বরূপ বলিয়া জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। অণু, পরমাণু হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে এই অখণ্ড, একরস, সৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা ব্যাপিয়া

বিরাজমান। ধূম যেমন গৃহের কক্ষকে ব্যাপিয়া থাকে সেরূপভাবে আত্মা জগৎকে ব্যাপিয়া বিদ্যমান থাকেন না। 'তিলেষু তৈলং দধ্নীব সর্পিঃ' অর্থাৎ তেল যেমন তিলকে, ঘৃত যেমন দধিকে ব্যাপিয়া থাকে সেইরূপ আত্মা এই জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, সুবর্ণ যেমন স্বর্ণহারকে, মৃত্তিকা যেমন মৃণ্ময় কলসীকে ব্যাপিয়া থাকে আত্মা সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চকে ব্যাপিয়া বিদ্যমান।

"হেন কোন কাল আমি নাহি করি দরশন
যথা নাহি হয় এর ভান।
হেন কোন দেশ আমি নয়নে না হেরি কভু
যথা ইহা নহে বিদ্যমান॥
হেন কোন ভাব আমি নাহি হেরি হৃদয়ের
যথা ইহা নহে প্রকাশিত।
হেন কোন কর্ম্ম আমি নাহি করি সমাপন
যথা ইহা নহে বিরাজিত।
'আমি' ও 'আমার' বলি যত কিছু আছে মোর
যত কিছু করিগো চিন্তন।
আমার সবটা মাঝে রয়িয়াছে বিদ্যমান
তৈল রহে তিলেতে যেমন॥"

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ সর্ব্বত্রই ওঙ্কারের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। আনন্দগিরি বলেন—"যস্য শব্দস্য উচ্চারণে যৎ স্ফুরতি তৎ তস্য বাচ্যং প্রসিদ্ধং, সমাহিতচিত্তস্য ওঙ্কারোচ্চারণে বদ্বিষয়ান্তরক্তঃ সংবেদনং স্ফুরতি তৎ ওঙ্কারং অবলম্ব্য তদ্‌বাচ্যং ব্রহ্মাস্মীতি ধ্যায়েৎ, তত্রাপি অসমর্থঃ ওঁ শব্দে এব ব্রহ্মদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ।" সকলেই জানেন যে শব্দের উচ্চারণে যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহাই হইতেছে সেই শব্দের বাচ্য। যেমন 'গো' এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র গলকম্বলাদিবিশিষ্ট একটী

বিশেষ প্রাণী আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়া পড়ে; সেই প্রাণীটী অর্থাৎ 'গরু' গো শব্দের বাচ্য। সেইরূপ যাহার চিত্ত সমাহিত অর্থাৎ যাহার চিত্ত সম্যক্‌রূপে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে একাগ্র হইয়াছে, সেই একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ওঁম্ এই শব্দ উচ্চারণ করিলে যে বস্তু তাহার জ্ঞানে স্ফুরিত হয়, ওঁঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া ওঁঙ্কারের বাচ্য 'ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যান করিবে। 'ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমি ক্ষুদ্র নহি, পাপী নহি, জন্ম-জরা-মৃত্যুশীল নহি, আমি সর্ব্বব্যাপী, আকাশ হইতেও বড়, আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বশক্তিমান, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব এইরূপে মনন বা ধ্যান করিতে অসমর্থ হইলে ওঁঙ্কারে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া ওঁঙ্কারের উপাসনা করিবে। যাঁহার চিত্ত সমাহিত তিনি ওঁ—ওঁ—ওঁ এইরূপে দীর্ঘস্বরে ওঙ্কারের উচ্চারণ করিলে, তাঁহার চিত্তে সাক্ষীচৈতন্যের সম্যক্ প্রকাশ হইয়া থাকে। সাক্ষীচৈতন্য—সেই চৈতন্য, যে চৈতন্য আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণদেহ এবং সেই সেই দেহাভিমানী বিশেষ বিশেষ চৈতন্যাভাসকে এবং সমষ্টি স্থূল, সূক্ষ্ম জগৎ ও তাহার কারণ মূলপ্রকৃতি এবং সেই সেই সমষ্টি জগৎ এবং তাহাদের কারণ মূলপ্রকৃতিতে অভিমানী বিশেষ বিশেষ চৈতন্যাভাসকে প্রকাশ করেন। এই সাক্ষীচৈতন্য নিত্য, অপরিণামী, নির্ব্বিশেষ, অখণ্ডৈকরস, সচ্চিদানন্দ। জীব, জগৎ, ঈশ্বররূপে যাহা বিভাত হইতেছে তাহা অপরব্রহ্ম এবং নিত্য অপরিণামী, নির্ব্বিশেষ, অখণ্ডৈকরস, সচ্চিদানন্দই পরব্রহ্ম। ওঁঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে করিতে অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পরব্রহ্মের আত্মরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য যমরাজ নাচিকেতাকে বলিলেন যে এই ওঁঙ্কার-উপাসনা দ্বারা "যো যৎ ইচ্ছতি তস্য তৎ" যে যাহা ইচ্ছা করে তাহার তাহাই লাভ হইয়া থাকে।

মহর্ষি পতঞ্জলি ও ওঁঙ্কারকে ঈশ্বরের বাচকরূপে অভিহিত করিয়াছেন

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ", প্রণব বা ওঁঙ্কার ঈশ্বরের বাচক। "তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনম্", প্রবণ বা ওঁঙ্কারের জপ এবং তাহার অর্থ চিন্তা। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ওঁঙ্কারের বাচ্য ও লক্ষ্যার্থের ধ্যান। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

স্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥

স্বাধ্যায় মানে প্রণব বা ওঁঙ্কার জপ। যোগ মানে "যুজ্যতে যেন পরমাত্মনা সহ।" যাহা দ্বারা পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিতে পারা যায় তাহাই যোগ। বিষ্ণুপুরাণ বলেন প্রণব বা ওঁঙ্কার জপ করিবার পরেই পরমাত্মার ধ্যান করিবে। এবং ধ্যান করিবার পরেই পুনরায় ওঁঙ্কার-জপ করিবে। এইরূপে জপ ও ধ্যানের অভ্যাস করিতে থাকিলে পরমাত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে পারা যায়। কেহ কেহ ওঁঙ্কারকে "সোঽহং" এই মহাকাব্যের সংক্ষিপ্তরূপ বলিয়া অভিহিত করেন।

সকারং চ হকারং চ লোপয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥
সন্ধিং চ পূর্ব্বরূপাখ্যং ততোঽসৌ প্রণবো ভবেৎ॥

'সোঽহং এই শব্দের 'স' কার ও 'হ' কার এই দুই অক্ষরের লোপ করিয়া ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সন্ধি করিয়া দিবে, তাহা হইলে ওঁম্ এই অক্ষরে সোঽহম্ রূপান্তরিত হইবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে ওঁঙ্কারের লক্ষ্যার্থ হইতেছে জীব-ব্রহ্মের একতা। ওঁঙ্কারের উপাসনা করিতে করিতে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আত্মরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন "মর্ত্ত্যঃ অমৃতো ভবতি" মরণশীল মানুষ অমর হইয়া যায়।

ওঁঙ্কারকে প্রণব বলে। প্রণব মানে ধ্বনি, (প্রণু ঘোষে) যে ধ্বনি রক্ষা করে, পালন করে। এই ওঁঙ্কার বা প্রণব হইতেছে সেই ধ্বনি যে ধ্বনি মনুষ্যকে সমস্ত আপৎ, সমস্ত ভয়, সমস্ত পাপ, সমস্ত দুঃখ হইতে রক্ষা করে। প্রনব হইতেছে সেই ধ্বনি বা নাদ যাহা মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের ক্ষুদ্রত্ব, সীমাবদ্ধত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব দূর করিয়া মানুষকে দেশকালের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। এই ওঁঙ্কার বা প্রণবকে অনাহত ধ্বনিও বলে। ধ্বনি সাধারণতঃ দুটী বস্তুর সংঘর্ষ বা আঘাতে হইয়া থাকে,কিন্তু এই প্রনব বা অনাহত ধ্বনি, চিত্ত একাগ্র হইয়া আত্মাভিমুখী হইলে যখন ইহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে তখন সেই শোধ্যমান চিত্তে আপনা হইতেই বিনা আঘাতে বিনা সংঘর্ষে উত্থিত হয়, সেইজন্য এই ধ্বনিকে অনাহত ধ্বনি বলে। এই ধ্বনি ভিতরে শোনা যায়, প্রথম প্রথম অবিচ্ছেদে ওম্—ওম্—ওম্ এইরূপ শ্রুত হয়, পরে সূক্ষ্মতম হইয়া ম্—ম্—ম্—এইরূপ হইয়া যায়, তখন দিব্যজ্যোতিতে অন্তর বাহির, অধঃ ঊর্দ্ধ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দিব্য, জ্যোতির্ম্ময়, আকাশবৎ একটা বিস্তার অনুভূত হইতে থাকে, দেহ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। আনন্দের অনুভূতিতে সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময়, আকাশবৎ বিস্তার পরিপূরিত হইয়া যায়, তখন আর কোন ধ্বনি শোনা যায় না। কেহ কেহ বলেন—

প্রোহি প্রকৃতিজাতস্য সংসারস্য মহোদধেঃ।
নবং নাবান্তরমিতি প্রণবং বৈ বিদুর্বুধাঃ ॥

পণ্ডিতগণ প্রণবকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সংসাররূপ মহাসাগরের নৌকা বলিয়া অবগত আছেন। কেহ কেহ প্রণব এই শব্দের তিনটী অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করেন—প্র = প্রপঞ্চ, ন = নাস্তি, বঃ = যুষ্মাকম্। অর্থাৎ প্রণবের জপ ও ধ্যান করিলে, তোমাদের পক্ষে প্রপঞ্চ থাকিবে

না, কেবলমাত্র পরমেশ্বরেরই অনুভূতি হইতে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন—"প্রকর্ষেণ নয়েদ্ যস্মাৎ মোক্ষং বা প্রণবং বিদুঃ।" সম্যক রূপে, প্রকৃষ্টরূপে মোক্ষকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয় বলিয়া এই অনাহত ধ্বনি বা নাদ বা ওঁঙ্কারকে প্রণব বলে। ওঁঙ্কারকে ব্যাহৃতি ও বলা হইয়া থাকে। ব্যাহৃতি মানে বিশেষরূপে ভাবরাশি আহরণ করিয়া যে শব্দের মধ্যে রাখা হয়। ওঁঙ্কার এই শব্দে আছে অ, উ, ম্ ঁ ·। 'অ' এই অক্ষরের মধ্যে বহু ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে।

অ=জাগ্রৎ অবস্থা, স্থূলদেহ এবং স্থূলদেহের অভিমানী যে চৈতন্য যাহাকে 'বিশ্ব' বলা হইয়া থাকে। সমষ্টি স্থূলজগৎ এবং এই সমষ্টি স্থূলজগতের অভিমানী চৈতন্য যাহাকে 'বিরাট্' বলা হয়।

উ=স্বপ্নাবস্থা, সূক্ষ্মদেহ এবং সূক্ষ্মদেহে অভিমানী যে চৈতন্য যাহাকে 'তৈজস' বলা হইয়া থাকে। সমষ্টি সূক্ষ্মজগৎ এবং এই সমষ্টি সূক্ষ্মজগতে অভিমানী যে চৈতন্য যাহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়।

ম্=সুষুপ্তি অবস্থা, কারণদেহ এবং এই কারণদেহে অভিমানী যাহাকে 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম জগতের কারণ প্রকৃতি বা মায়া, এবং এই প্রকৃতি বা মায়াতে অভিমানী চৈতন্য যাহাকে ঈশ্বর সংজ্ঞায় বিশেষিত করা হয়।

=নাদ, প্রণব, ওঁঙ্কারের দিব্যরূপ, অনাহত ধ্বনি, শব্দতন্মাত্রের কারণ।

=বিন্দু, সৃষ্ট্যুন্মুখী পারমেশ্বরী শক্তি। যে শক্তি বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী যে শক্তি পরা ও অপরা, বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে দ্বিরূপা। যে শক্তি অদিতি ও দিতি। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী, দেশ, কাল, কার্য্য ও কারণরূপিণী, রাগদ্বেষ, শোকমোহ, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বৈতভাবের, খণ্ড খণ্ড ভাবের, নানাত্বজ্ঞানরূপ দৈত্যের জননী দিতি, আবার অদ্বৈতৈকরসা, সচ্চিদানন্দময়ী, অদ্বৈতজ্ঞানপ্রদায়িনী দেবজননী অদিতি।

// সুতরাং দেখা যাইতেছে এই একটি ওঁকারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ এবং এই জগতের অধিষ্ঠান, জগতের আশ্রয় সমুদয় বিশ্বের প্রকাশক অখণ্ড চৈতন্য। এই অখণ্ড, একরস চৈতন্যই হইতেছে আত্মা। এই আত্মা শক্তির যে অপরারূপ, অবিদ্যারূপ, দেশ-কাল-কার্য্য-কারণরূপ, দ্বৈতজ্ঞানরূপ দৈত্যের জননী দিতিরূপ সেই অপরাশক্তিরূপ উপাধির সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হেতু অন্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হয় তখনি, যখন দুইটী বিভিন্নবস্তু একই বস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়, যেমন রজ্জু-সর্প। অস্পষ্ট আলোকে একগাছি দড়ীকে কেহ কেহ সর্প বলিয়া মনে করে। এখানে দড়ি ও সর্প হইতেছে দুইটী বিভিন্ন বস্তু, কিন্তু সেই দুইটী বস্তু এক সর্পরূপেই প্রতীত হইতেছে। এখানে রজ্জু রজ্জুই আছে, তাহা সর্প হইয়া যায় নাই, অথচ কোন কোন লোক তাহাকে সর্প বলিয়া মনে করিতেছে। শাস্ত্রে এইরূপ প্রতীতিকে "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ" বলিয়াছেন। অতস্মিন্ মানে যাহা বা নয়, তাহাতে সেই বুদ্ধি। রজ্জু কিছু সাপ নয়, কিন্তু সেই রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হয়। এই "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ"কে অধ্যাসও বলা হয়। উপাধি হইতেছে, সেই জিনিষ যাহা বস্তুর স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না কিন্তু উপাধির ধর্ম্মে বস্তুকে রঞ্জিত করিয়া তোলে। স্ফটিকের সমীপে জবাফুল রাখিলে, জবাফুলের লালবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শুভ্র স্ফটিককেও লাল বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ উপাধির সহিত এক হইয়া যাওয়া হেতু আত্মার প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞান আমাদের হয় না। ওঁকারের উপাসনাদ্বারা উপাধি বিদূরিত হইলে মানব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়।

শ্রুতি বলেন "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।" আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল এবং এই আকাশ হইতেই স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আকাশ চিদাকাশ, চিত্তাকাশ এবং জড়াকাশ। স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ জড়াকাশেরই পরিণাম। এই জড়াকাশ আবার চিত্তাকাশেরই রূপভেদ।

আকাশ যেমন সর্ব্বপদার্থের অন্তর বাহির ব্যাপিয়া বিদ্যমান, সেইরূপ চিত্তাকাশও আবার জড়াকাশের উপাদান বলিয়া চিত্তাকাশ জড়াকাশ ও তাহার কার্য্য সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। চিদাকাশ বা অখণ্ডৈকরস, সচ্চিদানন্দ আত্মা হইতেছে চিত্তাকাশের বিবর্ত্তাধিষ্ঠান উপাদান কারণ ; সেইজন্য আত্মা চিত্তাকাশ ও তাহার কার্য্য, জড়াকাশ ও তাহার কার্য্য সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। শব্দতত্ত্বই আকাশ। চিত্ত যত শুদ্ধ হইতে থাকে ততই স্থূলাকাশ এবং তাহার কার্য্য চিত্তাকাশে রূপান্তরিত হয়। চিত্তাকাশে তখন পরাশক্তি বা মুখ্যপ্রাণশক্তি জাগরিত হয়। এই প্রাণশক্তিকে ঋগ্বেদে মরুৎ, তার্ক্ষ্য, সুপর্ণ, গরুড় প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ হইতেছে এমন যে চিত্ত সেই চিত্তে যখন পরাশক্তি, মুখ্যপ্রাণ, বা গরুড় জাগরিত হয়, তখন নানাবিধ শব্দ সাধক শুনিতে পান। পরে এই সব শব্দ রূপান্তরিত হইয়া অবিচ্ছেদ একতান ওঁম্ এই ধ্বনিতে পরিণত হয়। ওঁম্ এই অখণ্ডধ্বনি চিত্তে উত্থিত হইলে চিত্তে সচ্চিদানন্দ আত্মজ্যোতির স্পষ্ট, স্পষ্টতর, স্পষ্টতম অনুভূতি হইতে থাকে, সাধক তখন সমুদয় বিশ্বকে স্বীয় অঙ্গীভূত জ্ঞান করেন নানাত্ব বোধ, ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইতে থাকে। সাধক তখন নিজেকে চিত্তাকাশ পরে চিদাকাশ এবং তৎপরে আত্মজ্যোতি-স্বরূপে অনুভব করিতে থাকেন। পবিত্র ও বিশুদ্ধ চিত্তে বিভাত আত্মজ্যোতি বেদে ইন্দ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মুখ্য প্রাণশক্তি বা বায়ু বা মরুৎকে ইন্দ্রসখা বলিয়া বেদ অভিহিত করিয়াছেন। মরুত্তীয় নিবিদে আমরা দেখিতে পাই ঋষি বলিতেছেন—

শোঁসা বোমিন্দ্রো মরুত্বান্‌ৎসোমস্য পিবতু।
মরুস্তোত্রো মরুদ্গণঃ, মরুৎসখা মরুদ্বৃধঃ।
ঘ্নন্‌বৃত্রা সৃজদপঃ—মরুদ্ভিঃ সখিভিঃ সহ—।

মরুৎ বা প্রাণশক্তি বা ওঁঙ্কারকে মরুদ্গণঃ বলা হয়। বায়ু ঊনপঞ্চাশ। জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড ওঁঙ্কার ধ্বনি পবিত্র চিত্তাকাশে উত্থিত হইলে সাধকের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও বাকের পরিচ্ছন্নতা দূর হইতে থাকে। দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকা, গহ্বর এবং বাক্ এই সাতটি ইন্দ্রিয় সাতগুণ অধিক শক্তিশালী হয়। দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ, দিব্যগন্ধ, এবং দিব্যবাক্ সাধকের করায়ত্ত হয়। তৎপরে এই ওঁঙ্কারধ্বনি বা মুখ্য প্রাণশক্তি বা গরুড় বৃত্তরূপ অজ্ঞান আবরণ দূর করিয়া দিয়া অপ্ বা রস বা আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং দিব্যধাম হইতে অমৃত আহরণ করিয়া সাধককে অমরত্ব প্রদান করেন। সাধক তখন এই জন্মে এই শরীরে পবিত্র চিত্তে ব্রহ্মলোকের দিব্যজ্ঞান; দিব্যশক্তি, দিব্যজীবন, দিব্য-আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হন। তখন তিনি "ব্রহ্মলোকে মহীয়তে" ব্রহ্মলোকেও পূজিত হইয়া থাকেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমেই ওঁঙ্কারের উপাসনা কথিত হইয়াছে। "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত ওম্ ইতি।" ওম্ এই অক্ষর উদ্গীথকে উপাসনা করিবে। পৃথিবী হইতেছে সর্ব্বভূতের রসস্বরূপ। পৃথিবীকেই আশ্রয় করিয়া ভূতগণ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। যদি পৃথিবী না থাকিত তাহা হইলে ভূতগণ পুষ্টিলাভ করিতে পারিত না, এইজন্য পৃথিবী হইতেছে সর্ব্বভূতের রস অর্থাৎ সারবস্তু। পৃথিবীর রস হইতেছে আপঃ বা জল, জলসমূহের রস হইতেছে ওষধী, (ধান্য, যব ইত্যাদি) আবার ওষধীসমূহের রস হইতেছে পুরুষ, পুরুষের রস বাক্, বাকের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস হইতেছে উদ্গীথ বা ওম্। সুতরাং ওঁঙ্কার হইতেছে সমস্ত রসের মধ্যে রসতম। সেইজন্য ওঁঙ্কারের উপাসনা করিবে। ঋষি বলিতেছেন যে "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযতিরে, উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ। তৎ হ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুঃ অনেন এনান্ অভিভবিষ্যাম ইতি।" দেবতা ও অসুরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবতা এবং অসুর

উভয়েই প্রজাপতির পুত্র। দেবতাগণ ভাবিয়াছিলেন যে উদ্গীথ বা ওঁঙ্কারদ্বারা অসুরদিগকে পরাভূত করিবেন। মানুষের মনই হইতেছে প্রজাপতি। এই মনের দুই পুত্র, দেবতা এবং অসুর। রাগদ্বেষ, শোকমোহ, জরাব্যাধি, ধর্ম্মঅধর্ম্ম, পাপপুণ্য, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি যত কিছু দ্বন্দ্বভাব (relativities), যত কিছু নানাত্ববোধ, যত কিছু খণ্ড খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান সব হইতেছে মনের অসুর পুত্র সমূহ ; আর যে সমুদয় ভাব অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি ও জীবনের উদ্বোধক সেই সমুদয় ভাব মনের দেবতা পুত্রগণ। মানুষের মনে অহরহ দেবাসুর সংগ্রাম চলিতেছে। মন ওঁঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া আসুরিক প্রবৃত্তি-সমূহকে পরাভূত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু ওঁঙ্কারের উপাসনায় প্রথমে ভুল হইল নাসিকাতে যে শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু বহিতেছে, রেচক, পূরক ও কুম্ভকদ্বারা সেই প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়াই সাধক ভাবিল সে ওঙ্কারের উপাসনা করিতেছে। অসুরগণ এই নাসিকাস্থ প্রাণবায়ুকে পাপদ্বারা বিদ্ধকরায় সাধক দেখিল যে প্রাণায়াম করিয়াও সে সুগন্ধ দুর্গন্ধরূপ দৈতভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই। তখন সে শাস্ত্রপাঠ এবং নানাবিধ স্তবস্তুতি করিতে লাগিল, কিন্তু এরূপ করিয়াও দেখিতে পাইল যে সে সত্যকথা ও মিথ্যাকথারূপ দ্বৈতভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। তখন সে মূর্ত্তির উপাসনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা করিয়াও দেখিতে পাইল সে সুন্দর ও কুৎসিৎরূপ দ্বৈতভাব হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সাধক তখন নামকীর্ত্তন, শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হইতে পারিল না। সে দেখিল এখনও সে নিন্দা ও প্রশংসারূপ দ্বৈতভাবের বশেই রহিয়া গিয়াছে। সাধক তখন মনের দ্বারা কামক্রোধাদিরূপ আসুরিক ভাবসমূহকে জয় করিতে প্রযত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু এরূপ করিয়াও সে দেখিতে পাইল অসুরগণ বশীভূত হয় নাই, কারণ তখনও তাহার মনে যাহা সঙ্কল্প করা উচিত এবং যাহা চিন্তা

করা উচিত নয় সেই দুই ভাবই তাহার মনে উদিত হইতেছে। তখন সাধক "য এবঃ অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তম্ উদ্গীথম্ উপাসাংচক্রিরে।" যে এই মুখ্যপ্রাণ যাহা উদ্গীথ বা ওঁঙ্কার বা প্রণব, সেই ওঁঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিল এবং এই ওঁঙ্কারের উপাসনা করিয়া "দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্" দেবগণ অমর এবং ভয়শূন্য হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই মুখ্যপ্রাণ বা প্রণব বা ওঙ্কারের উপাসনা করেন তিনিও "যদ্ অমৃতা দেবাঃ তদ্ অমৃতঃ ভবতি," দেবগণ যেরূপ অমর এবং মৃত্যুভয়শূন্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ অমর ও অভয় হইয়া থাকেন।

* বৃহদারণ্যক উপনিষদে ওঁঙ্কারকে গায়ত্রী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ওঁঙ্কার হইতেছে গায়ত্রীর নগ্নরূপ। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে একটী আখ্যায়িকা আছে। একদা দেবগণ অসুরদিগকে পরাভূত করিবার জন্য অমৃতের অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে অমৃত তৃতীয় স্বর্গে রহিয়াছে। সেই তৃতীয় স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া আসিবার জন্য দেবগণের মধ্যে মন্ত্রণা হইতে লাগিল। কিন্তু দেবতাগণ সকলেই তৃতীয় স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া আসিতে নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন; তখন গায়ত্রী বলিলেন "আমি ঐ অমৃত লইয়া আসিতে পারি, তবে আমাকে উলঙ্গ করিয়া দিতে হইবে, কারণ সেই অমৃত গন্ধর্ব্বগণ পাহারা দিতেছে, গন্ধর্ব্বগণ আমার নগ্নরূপ দেখিয়া যখন মোহিত হইবে তখন আমি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া ঐ অমৃত হরণ করিয়া লইয়া আসিব।" দেবগণ গায়ত্রীকে নগ্ন করিয়া দিলেন; তখন গায়ত্রী গন্ধর্ব্বগণকে মোহিত করিয়া তৃতীয় স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া আসিয়া দেবগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ওঁ ভুঃ ভূবঃ, স্বঃ, তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ইত্যাদি হইতেছে গায়ত্রীর ব্যাহৃতি বা বসন।

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

গায়ত্রী ব্যাহৃতিশূন্যা হইলে কেবল ওঁঙ্কার রহিয়া যায়, সেইজন্য ওঁম্ হইতেছে গায়ত্রীর নগ্নরূপ। দেবগণ মানে ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ। শ্রুতি বলিয়াছেন সচ্চিদানন্দ আত্মতত্ত্বরূপ অমৃত "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুম্ শক্যো ন চক্ষুষা" কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় কিংবা মনদ্বারা লাভ করা যায় না। গায়ত্রীর নগ্নরূপ ওঁম্ এই অক্ষরের উপাসনাদ্বারা অমৃতত্ব বা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়।

ওঁঙ্কাররূপ গায়ত্রীর উপাসনাদ্বারা তিন লোক, তিন বেদ, সমষ্টি প্রাণশক্তি এবং নিরতিশয় আনন্দ বা অমৃত করায়ত্ত হয়। অন্নময়, প্রাণ-ময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণশরীরের আবরণ বা পরিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়া যায় এবং সাধক দিব্যজ্ঞান, দিব্য, নিত্য আনন্দ, অব্যাহত শক্তি, দিব্য অনন্ত জীবন লাভ করিয়া এই জন্মেই কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া ধন্য হন, তাঁহার পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সেইজন্য যমরাজ নচিকেতাকে সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য, সমস্ত তপস্যার লক্ষ্য, ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠ ফল আত্মতত্ত্বরূপ ওঁম্ এই শব্দদ্বারা প্রকাশ করিলেন।

যমরাজ নচিকেতাকে সমস্ত বেদের সারবস্তু শুধু 'ওম্' এই একটি শব্দদ্বারা সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করিলেন। ওঙ্কার বা প্রণব হইতেছে পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্মের প্রিয়তম নাম। নাম এবং নামী অভেদ। সুতরাং ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা ওঙ্কারাভিধেয় পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ করা যায়। ঈশ্বরের যতপ্রকার উপাসনা আছে তন্মধ্যে ওঙ্কার অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনাই প্রশস্ত। পূর্ব্ব মন্ত্রে ওঙ্কারের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অকার, উকার, মকার ও নাদ বিন্দু লইয়াই ওঙ্কার। 'অ'কার হইতেছে আমার জাগ্রৎ অবস্থা, স্থূল দেহ এবং এই জাগ্রদবস্থা ও স্থূলদেহের অভিমানী 'আমি'। জাগ্রদবস্থা ও স্থূলদেহের সঙ্গে আমরা সকলেই নিজেকে মিলাইয়া ফেলি, একীভূত করিয়া ফেলি এবং ভাবি

আমি স্থূলদেহ। স্বপ্নাবস্থা হইতেছে 'উ'কার। এই অবস্থায় আমার স্থূল দেহে অভিমান থাকে না। আমি তখন সূক্ষ্মদেহ হই। আবার 'ম'কার হইতেছে সুষুপ্তি অবস্থা। এই সুষুপ্তি অবস্থায় আমি স্থূল কিংবা সূক্ষ্মদেহ নই। না আমি কাহারও পিতা, না মাতা, না আমি ধনী, না নির্ধন। না আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, না আমি ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থী, বা সন্ন্যাসী। এই তিনটে অবস্থা কখন থাকে কখন থাকে না। কিন্তু আমি এই তিন অবস্থায় একরূপে থাকি। তিন অবস্থার প্রকাশক আমি নিত্য। এই নিত্য অনন্ত আমি বা আত্মা অবস্থাত্রয় ও দেহত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। এই আমি সৎচিৎ ও আনন্দ। সচ্চিদানন্দই প্রকৃত আমি বা আত্মা। এই আমি বা আত্মার না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু, ইহা কোন কার্য্যও নয় কারণও নয়। এই আত্মতত্ত্ব দেহত্রয়, অবস্থাত্রয় বর্জ্জিত বলিয়া নিরুপাধিক। যমরাজ এক্ষণে নচিকেতার মনকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের দিকে লইয়া যাইবার জন্য নিরুপাধিক চৈতন্য মাত্র স্বরূপ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। যম বলিলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

শোন নচিকেতা, তুমি যে বস্তু জানিতে চাহিয়াছ, যে বস্তু ধর্ম এবং অধর্ম হইতে পৃথক, কার্য্য ও কারণ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এবং কালত্রয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেই বস্তু হইতেছে আত্মা। 'আত্মা' মানে হইতেছে 'আমি'। প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরে 'অহং' রূপে যে স্ফূর্ত্তি, যে জ্ঞান প্রকাশ পায় তাহাই হইতেছে আত্মা বা আমি। এই আমি বা আত্মার দুইরূপ। একটী

রূপ হইতেছে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহত্রয় বিশিষ্টরূপ, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা বিশিষ্টরূপ অর্থাৎ সোপাধিক, স্বাবয়ব, পরিণামী অনিত্যরূপ। এই 'আমি' জায়তে অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরীর্ণমতে, অপরক্ষীয়তে, নশ্যতি। এই 'আমি' উৎপত্তি বিনাশশীল, জন্মমৃত্যুর অধীন, সর্ব্ব নরকগামী। আমার আর একটি রূপ হইতেছে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহ বর্জ্জিত রূপ, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের অতীত রূপ অখণ্ড একরসরূপ। এই 'আমি' অনন্ত, নিত্য, অবিকারী ; এই 'আমি' আদিহীন, অন্তহীন নিখিল জগতে নিখিল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বা আধার ; এই 'আমি' নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, দেহত্রয় এবং অবস্থাত্রয়ের প্রকাশক ; এই সদ্ঘন, চিদ্ঘন, আনন্দঘন, 'আমি' নিরুপাধিক, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ, নির্ধর্ম্মক। এই চৈতন্যমাত্র স্বরূপ 'আমি' বা আত্মা তরঙ্গে জলের ন্যায়, সুবর্ণ হারে সুবর্ণের ন্যায়, মৃণ্ময় কলসীতে মৃত্তিকার ন্যায় চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আপন মহিমায় আপনি ভাস্বান্। এই সর্ব্বান্তর, সাক্ষাৎ-অপরোক্ষ বস্তু তোমার আমার সকলেরই স্বরূপ, সকলেরই আত্মা। এই আত্মাই প্রকৃত তুমি, প্রকৃত আমি। এই আত্মা 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' অর্থাৎ এই আত্মা কখনও উৎপন্ন হন না, কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, এই আত্মা বিপরিণামী নহেন, ক্ষয়প্রাপ্ত হন না এবং মৃত্যুমুখেও পতিত হন না ; কারণ ইনি বিপশ্চিৎ, অর্থাৎ অবিপরিলুপ্ত-চৈতন্যস্বরূপ। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহত্রয় ব্যভিচারী, ইহারা কখন থাকে কখনও থাকে না ; কিন্তু এই চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, স্বপ্রকাশ আত্মা কখনও তাঁহার স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না ; সেইজন্যই এই 'আত্মা' জন্মমৃত্যু রহিত। এই চৈতন্যস্বরূপই সৎস্বরূপ আত্মার সত্তায় ও প্রকাশে জগৎ সত্যবৎ প্রতীত হয়। আত্মাতিরিক্ত জগতের কোন স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা বা প্রকাশ নাই। এই 'আত্মার' কোন কারণ নাই, কেননা ইহা নিত্য, সদ্বস্তু ও স্বপ্রকাশ।

এই 'আত্মা' নির্দ্ধর্ম্মক বলিয়া নির্ব্বিশেষ বলিয়া নিরবয়ব হেতু ইহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। অতএব দেহত্রয় বা অবস্থাত্রয়রূপ কার্য্য বা জগৎরূপ কার্য্যের নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না; এই 'আত্মা' অজর অর্থাৎ নিত্য; নিত্য বলিয়া ইহা অপক্ষয় রহিত, ইহা শাশ্বত এবং শাশ্বত বলিয়াই ইহা পুরাণ অর্থাৎ বৃদ্ধি রহিত। অতএব জন্মমৃত্যু রহিত, হ্রাসবৃদ্ধি বর্জ্জিত এই নিত্য 'আত্মা' শরীরত্রয়রূপ উপাধির নাশে নষ্ট হয় না। এই আত্মতত্ত্ব অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমাকে আবার বলি—

হন্তা চেন্মন্যতেং হন্তু হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যদি একটা বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে, আর তখনি যদি কেহ বলে—হায় হায় বাড়ীর মধ্যস্থিত আকাশ ভাঙ্গিয়া গেল সেই ব্যক্তির ঐ বাক্য যেমন হাস্যাস্পদ হয় সেইরূপ যখন শরীর নষ্ট হয় তখন যদি কেহ বলে হায় হায় আত্মা বিনষ্ট হইল সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মনে করেন আমি ইহাকে হত্যা করিব এবং হত্যাকারীকে দেখিয়া যে ব্যক্তি ভাবেন "হায় হায় আমি হত হইলাম" এই উভয় ব্যক্তিই অর্থাৎ যিনি আপনাকে কার্য্যের কর্ত্তারূপে মনে করেন, এবং যিনি আপনাকে কার্য্যের কর্মরূপে মনে করেন এই কর্ত্তৃত্বাভিমানী এবং ভর্ত্তৃত্বাভিমানী উভয়েই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জানেন না। কারণ আত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও দ্বারা হতও হন না। যাঁহা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় তিনি কর্ত্তা এবং যথায় গিয়া ক্রিয়া শেষ হয় তিনি কর্ম; কিন্তু এই আত্মা—

নিষ্কলং, নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরবদ্যং, নিরঞ্জনং।
অমৃতস্য পরম সেতুং দগ্ধেন্ধন মিবানলম্॥

আত্মা নিষ্ক্রিয় বলিয়া ক্রিয়ার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা কর্ত্তাও নহেন, কর্মও নহেন, করণও নহেন, সম্প্রদানও নহেন, না ইনি অপাদান না ইনি অধিকরণ। আত্মা অসঙ্গ বলিয়া আত্মার সহিত অন্য কাহারও সম্বন্ধ নাই। হে নচিকেত, তুমি সর্ব্বদা মনন করিবে "আমি অসঙ্গ, নির্মল আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ স্বভাব, চৈতন্যস্বরূপ" এই আত্মতত্ত্ব অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কারণ—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিত গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু—প্রাসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

এই আত্মা পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, মন হইতেও সূক্ষ্ম এবং কাল হইতেও আকাশ হইতেও মহান; সুতরাং ইহা নাশের অযোগ্য। এই নিত্য অবিনাশী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে ধর্ষণ করিবার জন্য মন্দিরে মন্দিরে, তীর্থে তীর্থে, পর্ব্বতগুহায়, সাগরতটে অন্বেষণ করিতে হইবে না। দর্শন-শাস্ত্রে, বিজ্ঞান শাস্ত্রেও এই আত্মাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। কারণ এই আত্মা প্রতি প্রাণীর নির্মল হৃদয়ে সতত অভিব্যক্ত। চিত্ত নির্মল হইলেই সেই বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। দশ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ চতুষ্টয় প্রাণ দেহকে ধারণ করে বলিয়া ইহারা "ধাতু" নামে অভিহিত হয়। ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে ঈশ্বরোপাসনা করিতে করিতে গুণত্রয় ও কর্ম হইতে উৎপন্ন

মলিনতা ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন চিত্ত প্রসন্ন বা নির্মল হয়। তখন ধাতু প্রসাদ বা নির্মলচিত্ত হওয়াই সাধক স্বীয় মহিমা অর্থাৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব অনুভব করেন। সেইজন্য তোমাকে বারবার বলি নচিকেতা তুমি পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাবে নিজেকে ভাবিত কর—

অণোরণীয়ান্ আমি, বড় হতে মহীয়ান্, জগন্নাথ জগতজীবন, সতত অপরিচ্ছিন্ন, সতত প্রকাশশীল, শান্ত, শিব, আমি নারায়ণ। অজর অমর আমি, অশোক অভয় আমি, অদ্বিতীয় পুরুষ মহান, সতত অকামহত, সতত অপাপবিদ্ধ, স্বেমহিম্নি সতত ভাস্বান্। যাঁহারা অবিবেকী, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে ঈশ্বর উপাসনা করিয়া চিত্তকে নির্মল না করিয়াছেন তাঁহারা কখনই প্রতি নামে, প্রতিরূপে রূপায়িত, বিশ্বরূপে বিভাত সর্ব্বধারা, সচ্চিৎ, সুখাত্মক আত্মতত্ত্বকে কখনই অবগত হইতে পারে না। যিনি অক্রতু অর্থাৎ বাসনারহিত ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ে বীতস্পৃহ যাঁহার মন একমাত্র আত্মতত্ত্ব প্রবণ তিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

এই আত্মতত্ত্ব অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়। কারণ কল্পিত উপাধিভেদে নানারূপ বিরুদ্ধ ধর্মভানরূপে এই আত্মা প্রতীয়মান হইয়া থাকেন বলিয়া অবিবেকীগণ কখনই এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। এই আত্মা—

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥

দেখ নচিকেতা এই আত্মা নিশ্চলরূপেস্থিত হইয়াও জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির সাক্ষী হইয়াও বহুদূর প্রদেশেও গমন করিয়া থাকেন। সুপ্ত হইয়াও

সর্ব্বত্র গমন করেন। স্থিতিশীল হইয়াও গতিশীল। লুপ্ত হইয়াও বিচরণ-শীল। আনন্দ এবং আনন্দরহিত এই আত্মাকে আমার ন্যায় তত্ত্বদর্শী ব্যতিত আর কে এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি নচিকেতা, আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রীয়, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ সচ্চিৎসুখাত্মক বস্তু। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্যরূপ বিভিন্ন উপাধি-ভেদে এই আত্মা বিভিন্নরূপে বিভিন্ন নামে প্রতীত হইয়া থাকেন। সেই জন্য তোমাকে বলিয়াছি যে এই আত্মা স্বরূপতঃ "আসীনঃ" অর্থাৎ নিষ্ক্রীয় হইয়াও দ্রুত গমনশীল মনকে সত্তা এবং প্রকাশ প্রদাতৃরূপে গমনশীল বলিয়া প্রতীত হন। মন জড়, চৈতন্যের সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি লইয়া মন চৈতন্যময় হইয়া মন্তব্য বিষয় মনন করিতে সমর্থ হয়। সেইজন্য মন ব্রহ্মলোকে যাইয়াও চৈতন্যের অভাব দেখিতে পায় না কারণ চৈতন্যের সহিতই মনকে যাইতে হয়; সুতরাং মনরূপ উপাধিহেতু চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও দ্রুতগমনশীল বলিয়া প্রতীত হন। প্রাণীগণ নিদ্রিত থাকিলেও এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিখিল ব্যাপিয়া বিদ্যমান থাকেন। প্রাণিগণের হৃদয়ে হর্ষ শোক ইত্যাদি যত কিছু ভাব উদীত হয় সেই সমস্তই চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হইয়াই হৃদয়ে উত্থিত হইয়া থাকে। আত্মা হর্ষশোকাদি বর্জ্জিত হইয়াও চিত্তধর্ম্মরূপ উপাধিহেতু হর্ষশোকযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন। সেইজন্য তোমাকে বলিয়াছি একমাত্র বিবেকী পুরুষই এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তুমি সমাহিত চিত্তে সর্ব্বদা মনন কর—

"হেন কোন কাল আমি নাহি করি দরশন, যথা নাহি হয় এর ভান।
হেন কোন দেশ আমি নয়নে না হেরি কভু, যথা আত্মা নহে বিদ্যমান।
হেন কোন ভাব আমি নাহি হেরি হৃদয়ের যথা ইহা নহে প্রকাশিত।
হেন কোন কার্য্য আমি নাহি করি সমাপণ যথা ইহা নহে বিরাজিত।
"আমি ও আমার" বলি' যত কিছু আছে মোর, যত কিছু করিগো চিন্তন,
আমার সবটা মাঝে আছে আত্মা বিদ্যমান তৈল রহে তিলেতে যেমন।"

একাগ্র হইয়া স্থির চিত্তে মনন কর নির্ম্মল আকাশবৎ স্বপ্রকাশ একটা ব্যাপ্তি একটা স্বপ্রকাশ বিরাট ভাব তোমার অন্তর, বাহির, অধঃ, ঊর্দ্ধ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইরূপ মনন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে স্থূল শরীর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন কেবলমাত্র আকাশবৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য সত্তাই উপলব্ধি হইতে থাকিবে, তখন আর মনন না করিয়া তুষ্ণিম্ভাবে অবস্থান করিবে। তখনই তুমি বীতশোক হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। তখন—

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

অব্রাহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত চরাচর সমস্ত দেহে সচ্চিদানন্দরূপে বিদ্যমান স্থূলসূক্ষ্মকারণ দেহত্রয় রহিত অনিত্য পরিণামশীল জগতে সর্ব্বদা নিত্য অপরিণামী স্বপ্রকাশ প্রত্যগাত্মারূপে বিদ্যমান, দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত সর্ব্বব্যাপি এই মহান্ আত্মাকে শান্তচিত্ত বিবেকী পুরুষ অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া স্বীয় স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হন। অজ্ঞানজনিত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাভিমান এবং আবরণ ও বিক্ষেপের অভাবহেতু তিনি শোকরহিত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন।

আত্মানুসন্ধান ব্যতিত কেবল বেদাধ্যয়ন, তর্ক, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। সেইজন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি তুমি একাগ্রচিত্তে এই আত্মতত্ত্বের মনন অভ্যাস কর। কারণ—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্ ॥

এই আত্মা বেদাধ্যয়ন কিংবা অধ্যাপনার দ্বারা লভ্য নহেন। শাস্ত্রার্থের অবধারণ শক্তিরূপ মেধাদ্বারা, গুরুপদিষ্ট উপনিষদ বাক্য বিচার ব্যতীত বহু শাস্ত্র পাঠ কিংবা শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ কিংবা অন্যের নিকট হইতে বহু শাস্ত্রকথা শ্রবণের দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। যে মুমুক্ষু সমাহিত চিত্ত হইয়া নিরন্তর আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করেন এবং "আমিই সচ্চিৎ সুখাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপে অভেদে আত্মাস্বরূপ মনন করিতে থাকেন, কেবলমাত্র তিনিই এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তাঁহারই নির্ম্মল হৃদয়ে স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দরূপ আত্মতত্ত্ব অপ্রতিবদ্ধ-ভাবে সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়। কিংবা আচার্য্যমূর্ত্তিতে অবস্থিত পরমেশ্বর যে মুমুক্ষুকে অনুগ্রহ করেন কেবল তিনিই স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হন। নচিকেত, তোমাকে যে আমি পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্ব লাভের সাধন বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, বার বার তোমার দৃষ্টি সাধনের দিকে আকর্ষণ করিতেছি তাহার কারণ হইতেছে তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত মুমুক্ষুদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে কর্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের আচরণ এবং অভেদে ঈশ্বরোপাসনা একান্ত আবশ্যক। কারণ—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ ॥

যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইন্দ্রিয় লালসা হইতে উপরত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, সেই বিক্ষিপ্ত চিত্ত ইন্দ্রিয়-লোলুপ পাপাচারণকারী ব্যক্তি কথনই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্ত, বিবেকী, বৈরাগ্যবান, আত্মতত্ত্ব পরায়ণ এবং আচার্য্যবান. সেই ব্যক্তিই আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্বোপলব্ধির একমাত্র সাধন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা এই এই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥

নচিকেতা, তোমাকে আবার বলি, সে ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন নহে সেই ইন্দ্রিয়লোলুপ অবিবেকী ব্যক্তি কথনই পরমেশ্বরকে'জানিতে পারেন না। তুমি জান নচিকেতা, কি দেবগণ, কি মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ই হইতেছে প্রধান। এই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দ্বারা উপলক্ষিত চরাচরাত্মক জগৎ যাঁহার ভোজ্য—যিনি কথনও কাহারও ভোগ্য হয় না সর্ব্বসংহারক কাল যাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ, দেশকাল কার্য্যকারণরূপা, সত্তরজস্তমোময়ী অবিদ্যা যাঁহাকে অবিভূত করিতে পারে না সেই পরমানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে কোন ব্যক্তি মাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় আত্মরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত। তন্মধ্যে জীবাত্মা স্বীয় কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করে। এই হৃদয়রূপ গুহা বা হৃদয়াকাশ পরমাত্মার উপলব্ধির স্থান বলিয়া ইহা ভৌতিক আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদগণ, পঞ্চাগ্নির উপাসক এবং তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়নকারী ব্যক্তিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি "অহং বা আমির" দুই রূপ। একটী হইতেছে বাচ্যরূপ, অপরটী হইতেছে লক্ষ্যরূপ; একটী হইতেছে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাবিশিষ্টরূপ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়রূপ উপাধি বিশিষ্ট সোপাধিক-রূপ; অপরটী হইতেছে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির প্রকাশক দেহত্রয় রহিত নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ, সদ্‌ঘন, চিৎঘন, আনন্দঘনরূপ। প্রথমটী হইতেছে অবিদ্যাকল্পিত, অনিত্য ব্যাভিচারীরূপ, আর দ্বিতীয়টী হইতেছে সর্ব্বকল্পনাবিহীন নিত্যরূপ। শোন নচিকেতা, তুমি যদি অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যের আলোকে দণ্ডায়মান হও তাহা হইলে তোমার ছায়া তুমি দেখিতে পাও। যদি একমাত্র আলোকই বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে আলোকের জ্ঞান হইত না। আঁধার বা ছায়া আছে বলিয়াই আলোকের জ্ঞান হইয়া থাকে। আলোক ব্যতীত অন্য একটা কিছু আছে বলিয়াই ছায়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ছায়া স্বপ্রকাশ নহে, ইহা আলোকদ্বারা প্রকাশিত। সেইরূপ "অহং" এর লক্ষ্য সচ্চিৎ আনন্দঘনের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়রূপ উপাধি হইতেছে ছায়া। এই উপাধির কারণ অবিদ্যা বা স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই হইতেছে প্রকৃত ছায়াস্বরূপ। এই অজ্ঞান কোন অভাব বস্তু নহে। কারণ সকলেই "আমি অজ্ঞ" এইরূপে অজ্ঞানকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। অজ্ঞানরূপ ছায়া স্বপ্রকাশ নহে। কারণ, "আমি জানিনা" এই জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান প্রকাশিত হয়। অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই অজ্ঞানের আশ্রয়, অজ্ঞানের

প্রকাশক "আমি" এই প্রত্যয়ের লক্ষ্যস্বরূপ পরমানন্দ আত্মতত্ত্ব মুমুক্ষুগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। চৈতন্য মাত্রস্বরূপ আত্মা [illegible] অজ্ঞানরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইলেই জীবনামে অভিহিত হন। তখন নির্মল আলোকে ছায়ার ন্যায় শুদ্ধ চৈতন্যে ছায়া সদৃশ জীবভাব কল্পিত হয়। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে ছায়া ও আতপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তোমাকে যদি কেহ বলেন গর্দ্দভের সহিত আমার পুত্র কাষ্ঠভার বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে তখন তুমি যেমন বুঝিয়া থাক যে কেবল মাত্র গর্দ্দভই কাষ্ঠভার বহন করিয়া আসিতেছে, উক্ত ব্যক্তির পুত্র তাহার সহিত রহিয়াছে মাত্র সেইরূপ একই হৃদয়াকাশে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করিলেও একমাত্র জীবই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। জীবের স্বরূপ পরমাত্মা কখনই কর্ম্মফল ভোক্তা হন না। জীব গন্তা, পরমাত্মা গন্তব্য ; অর্থাৎ গতির বিশ্রামস্থান। পূর্ব্ব উপদিষ্ট সাধন সম্পন্ন মুমুক্ষু জীব পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া জীবন সফল করেন। পঞ্চ অগ্নির উপাসক এবং তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়নকারী কোন্ ব্যক্তি তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান। তথাপি তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত মুমুক্ষুগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। পঞ্চ অগ্নি হইতেছেন, গার্হপত্য অগ্নি, আহবনীয় অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য অগ্নি, আবসথ অগ্নি। অগ্নি জড় অগ্নি নহে। এই অগ্নি হইতেছে অন্তঃ শরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃ, এই অগ্নিবিদ্যা পূর্ব্বেই তোমাকে প্রদান করিয়াছি। মনুষ্যের শরীর হইতেছে তাহার গৃহ। প্রত্যেক মনুষ্যই তাহার শরীররূপ গৃহের পতি। এই চৈতন্য জ্যোতিরূপ অগ্নি প্রত্যেক মনুষ্যের মূলাধারে সুপ্ত রহিয়াছে। গুরু যখন এই সুপ্ত অগ্নিকে জাগ্রৎ করিয়া দেন তখন মুলাধারে অভিব্যক্ত এই অগ্নিকে গার্হপত্য অগ্নিনামে অভিহিত করা হয়। এই গার্হপত্য অগ্নি বা মূলাধারে অভিব্যক্ত চৈতন্যজ্যোতি স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়কে উদ্ভাসিত করিয়া শিরোদেশে দিব্য চৈতন্য জ্যোতি রূপে অবস্থান করেন তখন শিরোদেশে

অভিব্যক্ত সেই চৈতন্য জ্যোতিকে আহরনীয় অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়। কারণ তখন সমস্তদিক হইতে দিব্য শক্তি সমূহ সাধক হৃদয়ে উপলব্ধ হইতে থাকে। যে চৈতন্য জ্যোতি বা অগ্নি মুমুক্ষু সাধককে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন তাহাকে দক্ষিণাগ্নি বলে। যে চৈতন্য জ্যোতি বা অগ্নি ইন্দ্রিয়গণ এবং অন্তঃকরণের মলিনতা দূর করিয়া তাহাদিগকে দিব্য চৈতন্যময়, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন করিয়া তুলেন তাহাকে সভ্য অগ্নি বলা হয়। যে অগ্নি বা চৈতন্য জ্যোতি মুমুক্ষু সাধককে অন্তরে বাহিরে নিখিল বিশ্বে স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে অনুভব করাইয়া দেয়,সেই অগ্নিকে আবসথ অগ্নিনামে অভিহিত করা হয়। মুমুক্ষু সাধক অন্তঃ-শরীরে এই চৈতন্য জ্যোতি বা অগ্নিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে যতই সাধনার উন্নততর স্তরে আরোহণ করিয়া থাকেন ততই তাঁহার নিকট স্বীয় দেহ ও জগৎ ম্লান হইতে হইতে ছায়ার ন্যায় প্রতাত হইতে থাকে। পরিশেষে জগৎ ও জগৎজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সাধক স্বীয় চৈতন্য মাত্র স্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপে পঞ্চাগ্নি উপাসকের নিকট দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পুরুষ, স্ত্রী, পৃথিবী অর্থাৎ নিখিল বিশ্বই অগ্নি বা চৈতন্য জ্যোতিঃরূপে বিভাত হইয়া থাকে। কেবল যে ব্রহ্মবিদ্‌গণ এবং পঞ্চাগ্নি উপাসকগণের এইরূপ অনুভূতি হয় তাহা নহে ত্রিণাচিকেতদিগেরও অজ্ঞান ও তৎকার্য্য জীবজগৎ ছায়ার ন্যায় প্রতীত হয়। তোমাকে যে অগ্নিবিদ্যা প্রদান করিয়াছি, যে, অগ্নিবিদ্যা তোমাকে ক্রমে ক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, এবং ঈশ্বর পদে উন্নীত করিয়াছে এবং যে অগ্নিবিদ্যা এক্ষণে তোমাকে আত্মতত্ত্ব বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত করাইয়া দিবে সেই অগ্নিই হইতেছে নাচিকেত অগ্নি। তোমাকে উপলক্ষ করিয়া নিখিল মুমুক্ষুদিগের জন্য এই নাচিকেত অগ্নি বিষয়ক উপদেশ পুনরায় প্রদান করিতেছি। "কিৎ" ধাতুর এক অর্থ হইতেছে কামনা। "চিকেত" মানে কামময়।

"ন চিকেত"=নচিকেত, অর্থাৎ যে সাধক ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়ের কামনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মকাম হইয়াছেন তিনিই নচিকেত। এই আত্মকাম মুমুক্ষু সাধক নিরন্তর একবৎসর অর্থাৎ ৩৬০ দিন এবং ৩৬০ রাত্রি এই ৭২০ অহোরাত্র ভগন্মুখী হইয়া অভেদে ঈশ্বরোপাসনা করিলে এই অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতি তাঁহার অন্তঃশরীরে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, তাঁহার ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে স্বরূপ প্রদান করেন। "ত্রিণাচিকেতাঃ" অর্থ হইতেছে যে মুমুক্ষু সাধকগণ অন্তঃশরীরে অভিব্যক্ত অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য এই তিনরূপে প্রকাশিত অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতির অভেদে উপাসনা করেন। "ত্রিণাচিকেতার" আরও এক অর্থ হইতে পারে। যে মুমুক্ষু সাধকগণ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নসময়ে এবং সায়ংকালে এই তিনবার নাচিকেত অগ্নির উপাসনা করেন তাঁহারা ত্রিনাচিকেতা, কিংবা যাঁহারা মূলাধারে হৃদয়ে এবং সহস্রারে এই অগ্নি বা চৈতন্য জ্যোতির তন্ময় হইয়া ধ্যান করেন তাঁহাদিগকেও ত্রিণাচিকেতা নামে অভিহিত করা হয়। বাহিরে যজ্ঞশালার কাষ্ঠে কাষ্ঠে বর্ষণ করিয়া যে জড় অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া উহাতে হোম এবং বলিপ্রদান করা হয় এবং ঐ অগ্নি হইতে অগ্নিচয়ন পূর্ব্বক উত্তর বেদীতে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয় উহা অন্তঃশরীরে অভিব্যক্ত অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতির প্রতীক মাত্র। এই ব্রহ্মবিদগণ, পঞ্চাগ্নির উপাসকগণ, এবং নাচিকেত অগ্নির আরাধনাকারীগণ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষী। শোন নচিকেতা,—

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি॥

আমরা এই নাচিকেত অগ্নিকে যজ্ঞ, মুমুক্ষু শিষ্য হৃদয়ে অভিব্যক্ত করাইয়া দিতে সমর্থ। কারণ আমরাও এই নাচিকেত অগ্নিকে স্বীয় অন্তঃশরীরে প্রজ্জ্বলিত করিয়া অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছি। এই নাচিকেত অগ্নি ভগবন্মুখী আত্মকাম মুমুক্ষু সাধকদিগের সেতু স্বরূপ। যাঁহারা সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, এই নাচিকেত অগ্নি তাঁহাদিগকে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য এই সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া অভয়, অমর, অশোক, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, দেশকাল-বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, শান্তং, শিবং, অদ্বৈতং, আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন।

হে নচিকেত, তোমার ন্যায় আত্মতত্ত্বের যোগ্য অধিকারীকে প্রাপ্ত হইয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তোমাকেই উপলক্ষ করিয়া আমি জগতের কল্যাণের জন্য জীবের দুইপ্রকার গতিমোক্ষ এবং সংসার প্রদর্শন করিতেছি।

আত্মানংরথিনং বিদ্ধি শরীরংরথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

আমরা যে কাজই করিনা কেন দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই উহা করিতে হয়। শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। রথে চড়িয়া যেমন লোকে অন্যত্র গমনাগমণ করে আমরা সেইরূপ শরীররূপ রথে আরোহণ করিয়া পাপ পূণ্য, ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি। রথে যেমন একজন রথী থাকে আমাদের এই শরীররূপ রথেরও একজন রথী আছেন। সেই রথী হইতেছেন আত্মা, স্বয়ং

আমি। আমি সর্ব্বদাই রথে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিয়া থাকি। দরিদ্রের মত পদব্রজে কখনও চলি না। রথের যেমন একজন সারথী থাকে আমার এই শরীররূপ রথেরও সেইরূপ একজন সারথী আছেন, সেই সারথী হইতেছেন বুদ্ধি। রথকে যেরূপ অশ্বগণ টানিয়া লইয়া যায় এবং সারথী অশ্বগণের মুখে লাগাম বন্ধ করিয়া অশ্বগণকে গন্তব্যপথে পরিচালিত করে সেইরূপ আমার এই শরীররূপ রথের সারথী বুদ্ধি কোন্ অশ্বগণকে কিরূপ লাগাম দিয়া এই শরীররূপ রথ পরিচালিত করে? ইন্দ্রিয়গণই হইতেছে আমার এই শরীররূপ রথের অশ্ব এবং মন হইতেছে লাগাম এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সমূহ হইতেছে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের বিচরণ স্থান। শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আমি মনীষিগণ কর্ত্তৃক ভোক্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকি। এই ভোক্তা আমি সর্ব্বদা দশটী অশ্বদ্বারা পরিচালিত এই শরীররূপ রথে আরোহণ করিয়া নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ রূপ অশ্বসমূহকে বুদ্ধিরূপ সারথী মনরূপ লাগামদ্বারা পরিচালিত করে। সারথীর দক্ষতার উপর রথের গতি নির্ভর করে, সেইজন্য—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥

যদি বুদ্ধিরূপ সারথী লাগামরূপ মনকে নিগৃহীত করিয়া অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানশূন্য হয় তাহা হইলে অনিগৃহীতমনা সেই বুদ্ধিরূপ সারথির ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে না। এবং উচ্ছৃঙ্খল অশ্বসমূহ যেরূপ রথকে আকর্ষণ করিয়া কুমার্গে লইয়া

গিয়া রথী, সারথী এবং রথের অনিষ্ট সাধন করে সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গণ কুমার্গে ধাবিত হইয়া এই শরীররূপ রথ, বুদ্ধিরূপ সারথী, মনরূপ লাগাম এবং রথীরূপ স্বয়ং আমি, আমাদের সকলেরই অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ যদি মনের বশীভূত হয় এবং মন বুদ্ধির বশে থাকে তাহা হইলে সেই নিগৃহীতমনা সুদক্ষ সারথীরূপ বুদ্ধির অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ সুপথে পরিচালিত হয়। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ রাজসিক ও তামসিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যকে কুপথে পরিচালিত করে। এই মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়াই কাম মনুষ্যকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। সেইজন্য প্রথমেই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া সত্ত্বঃ প্রধান করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাদিগকে নির্ম্মল করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে শ্রদ্ধা এবং ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা; তন্ময় হইয়া চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ নির্ম্মল হইতে থাকে; তখন তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির চিত্ত পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা শুদ্ধ হয় নাই সে কথনই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না। প্রথম হইতেই নিজেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। বিবেকবৈরাগ্য শমদমাদিগুণসমূহ এবং চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য ব্যাকুলতা না হইলে কখনই কেবল শাস্ত্র পাঠ দ্বারা, তর্কদ্বারা, মেধাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে না। সেইজন্য সাধনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথমেই কর্ত্তব্য। কারণ—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥

যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং বুদ্ধি সর্ব্বদা পাপাচরণ, পাপচিন্তায় নিমগ্ন থাকে সেই ব্যক্তি কখনই স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারেনা। সেই ভোগ সিক্ত মলিনচিত্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তির মন পবিত্র, চিত্ত নির্ম্মল, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় হইতে উপরত হইয়া ভগবন্মুখী হইয়াছে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সংসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই জন্মেই জীবন সফল করিতে সমর্থ হয়। সেই ব্যক্তি আর জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে ফিরিয়া আসে না। পরমাত্মা পরমেশ্বরই ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী, পুত্র, সব হইতেই প্রিয়তম। স্ত্রীপুত্রাদি অনিত্য পদার্থসমূহ কখনই তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। সেইজন্য নিত্য অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মপদ লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক মনুষ্যেরই নিরতিশয় প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥

যাঁহার বুদ্ধি পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা নির্মল হইয়াছে যাঁহার মন সমাহিত সেই নির্মলচিত্ত ব্যক্তিই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পান যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা বশীভূত করে বলিয়া উহারা ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বিষয়সমূহ আবার মনের গ্রাহ্য বলিয়া সূক্ষ্ম মন স্থূলবিষয়-সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ। আবার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধীন বলিয়া মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আমাদের এই ব্যষ্টি বুদ্ধি অপেক্ষা মহৎ বা সমষ্টি বুদ্ধি উৎকৃষ্ট। মহৎ তত্ত্ব হইতে সমস্ত জগতের বীজভূত মায়া বা অব্যাকৃত বা অব্যক্ত উৎকৃষ্ট। এই অব্যক্ত হইতে সমস্ত জড়বর্গের প্রকাশক পরিপূর্ণ স্বভাব চৈতন্য মাত্র স্বরূপ আত্মা উৎকৃষ্ট। এই পরিপূর্ণ স্বভাব স্বপ্রকাশ সচ্চিৎ-সুখাত্মক আত্মা হইতে আর কিছুই উৎকৃষ্ট নাই। কারণ এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতেছেন প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি। এই আত্মায় বিশ্রান্তিভূমি। সমস্ত গতির অবসান; কারণ এই আত্মা হইতেছেন নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীর অন্তর বাহির ভরপুর করিয়া এই সচ্চিৎ আনন্দ-ঘন আত্মা সতত বিরাজমান থাকিলেও মায়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকায় সকলের নিকট "আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমানন্দস্বরূপ" এইরূপে ব্যবহার যোগ্য হন না। কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি গুরূপদিষ্ট উপনিষদের মহাবাক্য বিচারের দ্বারা নির্মল হইয়াছে সেই নির্মল বুদ্ধি মুমুক্ষু আচার্য্যবান পুরুষই স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। কিন্তু সমাহিত না হইলে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব কখনও সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় না। সেই জন্য—

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥

চিত্তকে একাগ্র করিতে হইলে প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে মনে যত প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উত্থীত হয় সেই সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্প প্রথমে অতি সূক্ষ্ম বাক্‌রূপে মনে উদীত হইয়া থাকে। "আমি দেখিব, আমি শুনিব, আমি গমন করিব" ইত্যাদি অতি সূক্ষ্ম বাক্‌রূপে সঙ্কল্প বিকল্প চিত্তে উদিত হইয়া অপরাপর ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। যদি এই সূক্ষ্ম বাক্‌কে সংযত করা যায় তাহা হইলে মনের সঙ্কল্প বিকল্প আর কার্য্যকরী হইতে পারে না। তখন এই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে বুদ্ধিতে নিরুদ্ধ করিতে হয়। বুদ্ধি হইতেছে চিত্তের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। বুদ্ধি সঙ্কল্প বিকল্পকে নিশ্চয় করিয়া না দিলে মন বিষয়ে ধাবিত হয় না। সেই জন্য মনকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় ও মনোব্যাপার শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। এইরূপে অবস্থান করিলে আকাশবৎ নির্মল সমষ্টি বুদ্ধি বিজ্ঞান অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে। তখন ব্যষ্টি বুদ্ধিকে সমষ্টি বিজ্ঞানে রুদ্ধ করিয়া কেবল নির্মল আকাশবৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে নিমগ্ন করাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে বুদ্ধি বিজ্ঞান পরমানন্দে গলিত হইয়া গেলে স্বীয় স্বরূপ সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হইবে।

এই পরমানন্দস্বরূপ অমৃত অভয় পদ লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক মনুষ্যেরই আপ্রাণ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। হে নচিকেত, আমি তোমাকে উপলক্ষ করিয়া নিখিল বিশ্ববাসীকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ
কবয়ো বদন্তি ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমধ্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

উঠ, জাগ। আর কতকাল মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে? জন্ম জন্ম ধরিয়া কেবল ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়ে আসক্ত হওয়া হেতু স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছ। মুক্তির দ্বার স্বরূপ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এই জন্ম পুনরায় ব্যর্থ করিও না। ক্ষণ, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, বৎসর রূপ ধরিয়া মৃত্যু তোমাদিগকে গ্রাস করিতে করিতে চলিয়াছে, সুতরাং আর সময় নাই। কাল বিলম্ব না করিয়া মোহনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাগবত জীবনে, স্বীয় স্বরূপে জাগ্রত হইয়া নূতন দিব্য জন্ম লাভ কর। স্বীয় স্বরূপ হইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প ও সমাহিত চিত্ত হইয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ নিশ্চিতরূপে অবগত হও। তীক্ষ্ণ ক্ষুরের অগ্রভাগ পদদ্বারা অতিক্রম করা যেরূপ দুষ্কর সেইরূপ আত্মস্বরূপ জ্ঞান দুরূহ। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ যে সাধন পন্থা অবলম্বন করিয়া পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায় সেই শ্রেয়োমার্গ অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দুর্ব্বিজ্ঞেয়। কারণ এই আত্মতত্ত্ব শব্দগুণ-হীন, শ্রোত্রেন্দ্রিয়বর্জ্জিত; ইহা অশব্দ; ইহাতে স্পর্শগুণ নাই; ইহা স্পর্শেন্দ্রিয় রহিত, এই আত্মা অস্পর্শ; ইহার কোনরূপ বা আকার নাই; এই আত্মা নিরবয়ব, দর্শনেন্দ্রিয় রহিত ইহাতে তিক্ত, কষায়াদি রস নাই; ইহা রসনেন্দ্রিয় রহিত অরস; এই আত্মাতে সুগন্ধ, দুর্গন্ধাদি কোন গন্ধ-গুণ নাই, ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বর্জ্জিত; কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই আত্মাকে

অবগত হওয়া যায় না ; এই আত্মা অনাদি অনন্ত প্রকৃতি বা মায়ার অধিষ্ঠান, হ্রাস-বৃদ্ধিহীন। এই আদিহীন, অন্তহীন, নিত্য, নির্ব্বাকার, নিরবয়ব চৈতন্য মাত্র স্বরূপ আত্মাকে গুরূপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন করিয়া আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া মুমুক্ষু মানব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন। সেইজন্য আমি পুনঃ পুনঃ মানবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, হে মানবগণ! দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া মোহনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকিও না ; জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ অবগত হইয়া মনুষ্যজনম সফল কর।

শ্রেয়ঃ মার্গের পথ অত্যন্ত দুর্গম। কারণ —

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ—
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চীদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ—
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াত্মিকা, সত্ত্বরজস্তমোময়ী অপরাশক্তি সৃষ্ট্যুন্মুখী হইয়া স্পন্দিত হয় এবং মন বা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; এই মন বহিঃপ্রবন বলিয়া মনের বিভিন্ন বিকাশ দশ ইন্দ্রিয়গণও স্বভাবতঃ বহিঃপ্রবন হইয়া থাকে। যাঁহারা বিবেক বৈরাগ্যবান্, সমাহিত চিত্ত, তাঁহারা বাহ্য বিষয় হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ব্যাবৃত্ত করিয়া স্বীয়স্বরূপ অমৃতত্ব লাভের জন্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহারা উপলব্ধি করেন—আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। তরঙ্গে জলের ন্যায়, সুবর্ণহারে সুবর্ণের ন্যায়, মৃণ্ময় কলসীতে মৃত্তিকার ন্যায়, রজ্জু সর্পে রজ্জুর ন্যায় সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মা প্রতি শরীরের, প্রতি অনুপরমাণুর, নিখিল বিশ্বের, বীজ স্বরূপ, মায়ার অন্তর বাহির,

অধঃ, ঊর্দ্ধ ভরপুর করিয়া বিরাজমান আছেন। এই প্রত্যাগাত্মাকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া ধীমান্ মনুষ্যগণ জীবন সফল করিয়া থাকেন। যাঁহারা অবিবেকী, ভোগাসক্ত, তাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য-বিষয়ক কামনারূপ মৃত্যুর পাশে বা জালে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু মানব এই অনিত্য সংসারে কোন নশ্বর পদার্থ কামনা করেন না বলিয়া, নিত্য অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্ব তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে নচিকেত, তুমি যে আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহিতেছ, সেই আত্মতত্ত্ব তোমার প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতে, প্রত্যেক বোদ্ধ প্রত্যয়ে পরিস্ফুট। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ জড়, ইহাদের কোন পদার্থ প্রকাশ করিবার সামর্থ নাই। কিন্তু তবুও চক্ষু রূপকে প্রকাশ করে, জিহ্বা রসকে প্রকাশ করে, নাসিকা গন্ধকে প্রকাশ করে, কর্ণ শব্দকে প্রকাশ করে, মন বুদ্ধিও স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের বিষয় প্রকাশ করিবার এই সামর্থ্য কোথা হইতে আসিল? একমাত্র নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া উহারা চৈতন্যময় হয় এবং স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করে। মানুষ সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান বলে তাহা জ্ঞান নহে, তাহা চৈতন্য পরিব্যাপ্ত বুদ্ধির বিভিন্ন বিষয়াকারে পরিণাম মাত্র। প্রতি শব্দ জ্ঞানে, প্রতি স্পর্শ জ্ঞানে, প্রতিরূপ জ্ঞানে, প্রতিরস জ্ঞানে, প্রতি গন্ধ জ্ঞানে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি ভাবে এই চৈতন্য মাত্রস্বরূপ আত্মতত্ত্বই বিভাত হইতেছে। তুমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি জ্ঞানের একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকেই দর্শন কর। বুদ্ধির পরিণামরূপ রূপরসগন্ধাদি দেখিও না। তুমি যে আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলে প্রতিবোধে বিভাত সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, এই চৈতন্যই সেই আত্মতত্ত্ব। এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিখিল বিশ্বকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা সর্ব্বান্তর,

কালত্রয়েরও নিয়ন্তা, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির প্রকাশক। এই সর্ব্বব্যাপি দেশ কাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধভেদ রহিত, এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ডৈকরস, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ এই আত্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া ধীর মুমুক্ষু মানবগণ শোকমোহ হইতে বিনির্মুক্ত হন।

হে নচিকেত, তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের দুই শক্তি। একটী পরা, অপরটী অপরা; একটী বিদ্যা, অপরটী অবিদ্যা বা অজ্ঞান। পরাশক্তি অখণ্ডা একরসা সচ্চিদানন্দরূপিনী এই পরাশক্তি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সহিত অভিন্না এবং পরমানন্দকেই বিষয় করিয়া থাকে। অপর-পক্ষে অপরাশক্তি বা অজ্ঞান বা মায়া হইতেছে দেশকালকার্য্যকারণরূপা সত্ত্বরজোস্তমোময়ী জ্ঞানইচ্ছাক্রিয়াত্মিকা, খণ্ডা, জড়া, দৃশ্যা, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে বিশ্বাকারে পরিণতা। এই অপরা শক্তি ঈশ্বর হইতে ভিন্নাও নহে, অভিন্নাও নহে কিংবা ভিন্নাভিন্নও নহে। এই দুই শক্তিই সদ্‌ঘন, চিৎঘণ, আনন্দ মন আত্মাতে কল্পিত বা অধ্যারোপিত। শক্তি স্পন্দশীলা, সেইজন্য পরাশক্তি স্পন্দিত হইলে সেই অখণ্ডা আনন্দরূপিনী স্পন্দিতা চৈতন্য পরিব্যাপ্তা শক্তিতে অভিমানী আত্মচৈতন্য ঈশ্বরপদবাচ্য হন। এই পরাশক্তিবিশিষ্ট চৈতন্য বা ঈশ্বর সর্ব্বদা স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাতে স্বরূপাবরণ নাই। পরাশক্তি স্পন্দিত হইবা মাত্রই জ্ঞানইচ্ছাক্রিয়াত্মিকা অপরাশক্তিও স্পন্দিত হইতে থাকে। পরাশক্তি যেরূপ অখণ্ডরূপে স্পন্দিত হয় অপরাশক্তি সেরূপে স্পন্দিত হয় না। অপরাশক্তি ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে, কার্য্যকারণরূপে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং চৈতন্য পরিব্যাপ্তা এই অপরাশক্তি ঈশ্বরে জ্ঞানইচ্ছাক্রিয়াত্মক ভাব আরোপিত করিয়া জগৎরূপ ঐশ্বর্য্যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে অভিলাষিণী হয়। তখন এই অপরাশক্তির প্রতি ঈশ্বরের ঈক্ষণ হয় অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক অখণ্ডা মায়াবৃত্তিরূপ জ্ঞানের উন্মেষ হয়। এই

সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানোন্মেষই ঈশ্বরের তপস্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই তপস্যার পূর্ব্বেও পরাশক্তিবিশিষ্ট তাঁহার একরূপ বিদ্যমান থাকে। তাঁহার এই 'আনন্দময়' রূপ অপরা প্রকৃতির প্রতি ব্যষ্টি-সমষ্টি স্পন্দনে অনুস্যূত থাকে। পরাশক্তি বিশিষ্ট এই আনন্দময় রূপটী "যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতম্" কেবল পরমানন্দকে বিষয় করে বলিয়াই ইহাই সকলের স্বরূপ বা আত্মতত্ত্ব। শক্তি স্পন্দিত হইলেও চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর স্পন্দিত হন না। তিনি আপন স্বরূপে অবস্থান করিয়া শক্তির স্পন্দনে কেবলমাত্র বিবর্ত্তিত হইতে থাকেন। অপরাশক্তি ঈশ্বরের উপাধি মাত্র। তিনি প্রতি প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় সর্ব্বদা বিদ্যমান। নিখিল বিশ্বের নিয়ামক বলিয়া তিনি বিশ্বের পূর্ব্বেও বিদ্যমান এবং এই চরাচর নিখিল বিশ্বরূপে তিনিই বিভাত হইতেছেন। অজ্ঞানরূপ উপাধি বিহীন আবরণ-বিক্ষেপ বর্জ্জিত এই সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরই তোমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে অন্তঃশরীরে অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিঃ বা পরাশক্তির উদ্বোধন করিতে হয়। এই পরাশক্তি উদ্বোধিত হইলে, গর্ভিনী যেরূপ সুপথ্য দ্বারা গর্ভকে সুরক্ষিত করে, সেইরূপ আত্মকাম মুমুক্ষু সাধক নিরন্তর ভগবৎচিন্তা, আত্মসংযম ও বিবেকবৈরাগ্য দ্বারা স্বীয় অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত এই পরাশক্তিকে সযত্নে রক্ষা করেন। সযত্ন রক্ষিত এই পরাশক্তি সাধকের দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের পরিচ্ছিন্নত্ব বিদূরিত করিয়া সাধকের হৃদয়ে অখণ্ড অভেদ জ্ঞান প্রকাশ করেন। এই পরা-শক্তি সর্ব্বদেবতাময়ী। 'দেবতা' মানে দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের অপরিচ্ছিন্ন ভাব। "দিতি" মানে দ্বৈতভাবের উন্মেষকারিণী শক্তি। যে শক্তি দিতি নহেন তিনি অদিতি, অখণ্ডা, একরসা, চৈতন্যরূপিনী আনন্দরূপিনী পরাশক্তি। এই অদিতি বা পরাশক্তি বা অগ্নি আত্মতত্ত্ব প্রকাশিকা, প্রাপিকা বলিয়া ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব। এই সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে সূর্য্যোপ-

লক্ষিত চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন, স্থিত ও লীন হইতেছে। এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

হে নচিকেত, তুমি সতত আত্মৈকত্বে মন স্থির কর। তোমার ন্যায় বিবেক বৈরাগ্য-পূতঃ নির্মল হৃদয়েই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয়। এই অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বই সতত সর্ব্বত্র বিভাত হইতেছে—

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব
পশ্যতি। এতদ্বৈ তৎ ॥

এই আত্মতত্ত্বকে জানিতে হইলে প্রথমে আচার্য্যের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন-পূর্ব্বক নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের অভেদে উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের অভেদে উপাসনা করিতে করিতে চিত্ত ক্রমে ক্রমে চৈতন্যময় হইয়া নির্মল হইতে থাকে। তখন সে নির্মল চিত্তে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের উদয় হয়। অবিদ্যা বিদূরিত হওয়াই তখন একমাত্র আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ আত্মাই বিভাত হইতে থাকেন। এই আত্মা অখণ্ড অভেদ, ইহাতে নানার্থ নাই। অবিদ্যা হেতুই ইহাতে নানার্থ প্রতীত হইয়া থাকে। একমাত্র রজ্জু যেরূপ মূঢ় ব্যক্তির নিকট সর্পাকারে প্রতীত হয়, একমাত্র সুবর্ণ যেরূপ চুড়ী, বলয় প্রভৃতিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, জল যেরূপ তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি রূপে আকারিত বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ সদ্‌ঘন, চিৎঘন, আনন্দঘন, সর্ব্ববিধভেদরহিত অখণ্ড একরস আত্মতত্ত্বই বিভাত হইতেছে। যে অবিবেকী ব্যক্তি এই আত্মাতে সামান্য মাত্রও নানাত্ব দর্শন করে সে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া অনর্থই ভোগ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত হইয়া যে আত্মচৈতন্য

জীবরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, সমগ্র অজ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত হইয়া সেই একই চৈতন্য ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন। যে চৈতন্যরূপ ঈশ্বর সমস্ত জগতের নিয়ামক বলিয়া অভিহিত হন সেই চৈতন্যই ধূমবিহীন অগ্নিশিখার ন্যায় নির্মল আত্মচৈতন্যরূপে প্রতি প্রাণিহৃদয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। হে নচিকেতঃ, যাহা কিছু প্রতীত হইতেছে তৎসমস্তই এক অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্যই। এই অব্যয়, চৈতন্যমাত্র স্বরূপ অচ্যুত আত্মা ব্যতিত অন্য আর কিছুই নাই। তুমিও তাহা, আমিও তাহা এবং সমস্ত বিশ্বও একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ আত্মাই। তুমি সর্ব্বদা সমাহিত চিত্তে ভেদমোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই আত্মৈকত্ব মনন কর। পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে বৃষ্টি পতিত হইলে সেই বৃষ্টিধারা শতধাবিচ্ছিন্ন এবং মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যে মূঢ় ব্যক্তি প্রতিদেহে বিভিন্ন আত্মা দর্শন করে সেই ভেদদর্শনকারী অবিবেকী পুরুষ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়ার বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে নচিকেত, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কারণ তুমি গৌতম হইয়াছ, নিরতিশয় বৈদিক জ্ঞানে অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে তোমার অন্তঃকরণ বিভূষিত হইয়াছে, নির্মল হইয়াছে, তোমার চিত্ত এই আত্মৈকত্বজ্ঞানে স্থির হইয়াছে। তোমার ন্যায় মননশীল আত্মকাম সাধকের অনুভূতি এই প্রকার হইয়া থাকে—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥

যেরূপ নির্মলজলে নির্মল জল নিক্ষিপ্ত হইলে উহা একই ভাব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ নিরন্তর চৈতন্যমাত্র স্বরূপ আত্মতত্ত্বের মননকারী পুরুষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হন। এক্ষনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ

তোমারই আত্মা সর্ব্বান্তর। তোমারই আত্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম। এই আত্মাকে আপন হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে। আমি আশ্চর্য্য হই মনুষ্য কেন তাহার হৃদয়কে নিরবয়ব, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের অভেদে উপাসনা দ্বারা নির্ম্মল করিয়া তাহারই হৃদয়স্থিত এই অমৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করে না। কারণ—

পুরমেকাদশদ্বার মজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥

দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা গহ্বর, মুখ, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভি,উপস্থ এবং পায়ু এই একাদশ দ্বারবিশিষ্ট এই শরীরই হইতেছে উৎপত্তি বিনাশহীন, অখণ্ড মায়াবৃত্তি জ্ঞানযুক্ত নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের পুরী। মানব আপন হৃদয়ে অবস্থিত এই চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভক্তির সহিত নিরন্তর অভেদে ধ্যান করিয়া স্বীয়স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করে। তখন সে অনুভব করে যে সে সর্ব্বদাই অজ্ঞান বিনির্ম্মুক্ত ছিল। স্বরূপতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত হইয়াও কেবল স্বরূপবিষয়ক ভ্রান্ত জ্ঞানহেতু এতদিন সে নিজেকে ক্ষুদ্র এবং জন্মমৃত্যুর অধীন বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে সেই ভ্রান্ত জ্ঞান বিদূরিত হওয়াই স্বরূপতঃ বিমুক্ত সেই ব্যক্তি মুক্ত-স্বরূপে অবস্থান করিয়া আবরণ বিক্ষেপরূপ শোকমোহ হইতে উত্তীর্ণ হন।

হে নচিকেত, তুমি আর নামরূপের প্রতি দৃষ্টি করিও না। প্রতি নামে অভিহিত, প্রতিরূপে রূপায়িত সেই একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকেই নিরীক্ষণ কর। এই আত্মা—

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্—
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।

নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমস—
দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা
ঋতং বৃহৎ ॥

দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে, অন্তরিক্ষে বায়ুরূপে, নিখিল বিশ্বে আধারস্বরূপ বাসুদেব নারায়ণরূপে, যজ্ঞশালায় অগ্নিরূপে, পৃথিবীরূপ বেদীতে সেই একই আত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। যজ্ঞশালায় স্থাপিত কলসী মধ্যস্থ সোমরসরূপে, প্রত্যেক মনুষ্যে, দেবগণে তিনিই বিরাজমান। সত্যে এবং যজ্ঞে এই আত্মা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আকাশকেও পরিব্যাপ্ত করিয়া এই নির্মল চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বদা দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। জলজ, পৃথিবীজ এবং পর্ব্বত হইতেও যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন অবিতথ ফলস্বরূপ, সত্যস্বরূপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, দেশকালবস্তু-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এই আত্মা আপন মহিমাই আপনি অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বরূপে, জীবজগৎ ঈশ্বররূপে, জড় ও চেতনারূপে যাহা কিছু প্রতীত হইতেছে তৎসমস্তই একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ, সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, চিৎস্বরূপ আত্মাই। অবিদ্যা কল্পিত উপাধি বশতঃই একই আত্মা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। যেরূপ—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

অগ্নি যেরূপ দীর্ঘ, সরল, ছোট, বক্র, দাহ্য পদার্থের আকার অনুসারে দীর্ঘ, সরল, বক্ররূপে প্রতীত হয় এবং উক্ত দাহ্য পদার্থের বাহিরেও স্বীয়

স্বরূপে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা প্রতি নাম রূপে রূপায়িত হইয়াও নামরূপাত্মক জগতের বাহিরেও স্বীয় সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। নাম রূপাত্মক জগতের অন্তর বাহির ভরপুর করিয়া বর্ত্তমান সচ্চিৎ সুখাত্মক আত্মা কখনও উপাধির দোষগুণে দূষিত হন না, কখনই স্বীয় স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। যেমন সূর্য্য দূষিত পদার্থকে প্রকাশ করিয়াও সেই পদার্থের দোষে লিপ্ত হন না সেইরূপ চরাচর জগতের স্বরূপ সচ্চিৎ, সুখাত্মক আত্মা জগৎকে সত্তা ও স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়া প্রতিনামরূপের অনুবর্ত্তন করিয়া নামরূপের দোষে দুষ্ট হন না। জীবগণ কেবল প্রাণাপানের দ্বারাই জীবন ধারণ করেন না। এই সচ্চিৎ আত্মাই সমস্ত জীব জগৎকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সচ্চিৎ সুখাত্মক বস্তুই যাহাতে প্রাণাপানাদি সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে, সেই বস্তুই হইতেছে তোমার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব। আমি তোমার প্রতি বড়ই প্রীত হইয়াছি, তোমাকে বলি শোন—

যোনিমন্যে প্রপদন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—মানব মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শেষ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মৃত্যুর পরেও মানবের আত্মা থাকিয়া যায়। এই মৃত্যু রহস্য তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে। আমি এতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে এই আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছি। তুমি নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ যে সমস্ত জীবেরই আত্মা এক এবং এই আত্মা সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অজর, অমর, অশোক, অভয়, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। এই আত্মার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। কিন্তু মানব

যতক্ষণ তাহার এই আত্মস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকে ততক্ষণ সে নিজেকে জাত, মৃত, সুখী, দুঃখী, বদ্ধ, মুক্ত বলিয়া বৃথায় অভিমান করিয়া থাকে। যাহার ক্ষুদ্র দেহত্রয়ে অভিমান আছে যে অবিবেকী সেই মূঢ় ব্যক্তিই মৃত্যুর পর স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং জড়ায়ুজ প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যিনি তোমার ন্যায় কেবল আত্মকাম, বিবেক বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু তিনি এই দেহেই জীবমুক্ত হইয়া দেহাপগমে বিদেহ মুক্তিরূপ স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অদ্বৈত আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। এই আত্মতত্ত্বরূপ পরমানন্দ অনুভব করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ কৃতকৃত্য হইয়াছেন। অনিত্য জগতের মাঝে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এই আত্মাকে যে সমুদয় সম্যক্দর্শী মুনিগণ স্বীয় নির্ম্মল হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তাঁহারাই শাশ্বত সুখ ও শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হন। এই চৈতন্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ আত্মা অবিবেকীর নিকট পরোক্ষ হইলেও, অনির্দ্দেশ্য হইলেও সম্যক্দর্শী শুদ্ধচিত্ত মুনিগণের সর্ব্বদা অপরোক্ষ হইয়া থাকেন। তোমাকে আবার বলি—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

এই চৈতন স্বরূপ আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, অগ্নি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি কেহই এই আত্মাকে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির বিষয়রূপে জানিতে পারে না। এই প্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আছেন বলিয়াই সূর্য্যচন্দ্র সমন্বিত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহ সত্তা লাভ করিয়া

সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে। এই নিত্য সৎঘন, চিৎঘন, আনন্দঘন আত্মাই প্রকৃত তুমি। এক্ষণে একাগ্রচিত্তে এই আত্মতত্ত্ব মনন কর।

ঊর্দ্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি
কশ্চন। এতদ্‌বৈ তৎ॥

অনাদি প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া প্রতীত সংসাররূপ বৃক্ষ অত্যন্ত নশ্বর; এই জন্যই ইহাকে অশ্বত্থ নামে অভিহিত করা হয়। যাহা আগামী কল্য বিদ্যমান থাকে না তাহাই অ-শ্বত্থ। এই দৃষ্ট নষ্ট অবিরত পরিণামশীল অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ সংসারে মূল হইতেছেন সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। এই আত্মা আছেন বলিয়াই স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক যত কিছু পদার্থ আছে তৎসমস্তই আত্মসত্তায় সত্তাবান হইয়া আত্মচৈতন্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মাতিরিক্ত উহাদের এবং উহাদের কারণ মায়া বা অবিদ্যার কোন পৃথক বাস্তব সত্তা নাই। মায়া ও তৎকার্য্য আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এই সংসারের আত্মাতিরিক্ত কোন পৃথক বাস্তব সত্তাও প্রকাশ না থাকায় সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকেই নশ্বর জগতের মূল কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আত্মা বস্তুতঃ কাহারও কারণ নহেন। কারণ তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, দেব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গাদিরূপে এবং আকাশ, বায়ু প্রভৃতি শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নিম্নদিকে প্রসৃত রহিয়াছে। নিখিল বিশ্বের আশ্রয় এই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা শুদ্ধ, দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং অমৃতস্বরূপ। কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি এবং সর্ব্ব-

সংহারক কলিরূপ মৃত্যুও এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার বশবর্ত্তী হইয়াই স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই সর্ব্বাধার, সর্ব্বনিয়ামক, চৈতন্য বস্তুই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব। এই সচ্চিৎ,সুখাত্মক আত্মবস্তুকে মানব মুক্তির দ্বার স্বরূপ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যদি এই দেহে এই জন্মেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে না পারে তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। মনুষ্যের হৃদয়ে এই আত্মা সুস্পষ্ট ও উপলব্ধ হন। এত নিকটে থাকিতেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে মানুষ সাগরে, পর্ব্বতে, গহনে, আশ্রমে আশ্রমে, মন্দিরে মন্দিরে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করে। হৃদয়ে বুদ্ধিতে, মনে, চিত্তে, অহঙ্কারে ইন্দ্রিয়গণের মলিনতা, ঈশ্বরোপাসনা, জনহিতকর নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা বিদূরিত না করিয়া, হৃদয়কে নির্ম্মল না করিয়া, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইলে স্বীয় স্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। নির্ম্মল দর্পনে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান মুখবিম্বের ন্যায় নির্ম্মল হৃদয়ে এই আত্মতত্ত্ব সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে—

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে
তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে
তথা গন্ধর্ব্বলোকে চ্ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥

এক ব্রহ্মলোক ব্যতীত চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কোন লোকেই আত্মতত্ত্ব সুস্পষ্ট অনুভূত হয় না। কি দেবলোক, কি গন্ধর্ব্ব লোক সর্ব্বত্রই আত্মতত্ত্ব অতি অস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। অন্ধকার হইতে আলোক যেরূপ পৃথকরূপে সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে এবং মনুষ্যের বিশুদ্ধ চিত্তে অবিদ্যাস্পর্শ-বিরহিত নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি মনুষ্যের পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য, কিন্তু মনুষ্য

সর্ব্বদাই নিজের নিজের হৃদয়, চিত্ত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ সঙ্গে সঙ্গে লইয়াই সর্ব্বদা বাস করে। সর্ব্বদা প্রাপ্ত এই ইন্দ্রিয় ও চিত্তের নির্মলতা সাধন করিলে যখন অমৃতত্ব লাভ করা যায় তখন মনুষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য স্বীয় চিত্তের নির্মলতা সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

প্রথমে বেদবাক্যে, ঋষিবাক্যে, গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস, ঐকান্তিকী শ্রদ্ধার প্রয়োজন। তৎপরে—

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥

নিখিল জগতের আশ্রয়, চরাচর বিশ্বের স্বরূপ, সচ্চিৎ সুখাত্মক আত্মা নিশ্চয়ই আছেন। এইরূপ উপলব্ধি করিয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে থাকিলে সাধকের নির্মল চিত্তে আত্মতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। যে আত্মচৈতন্যে ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ্যলাভ করিয়াছে সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ কি প্রকারে তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া, তাহাদের বিষয় করিয়া জ্ঞেয়রূপে জানিতে সমর্থ হইবে? এই আত্মতত্ত্ব একমাত্র উপলব্ধ হয় তখনই যখন—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

যখন অন্তঃকরণের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্ব স্ব ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে তখনই আত্মতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। এই কথায় ভাবিওনা যে মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তিতে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইবে।

ঈশ্বরোপাসনা এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকিলে আনন্দস্বরূপ আত্মার অল্প অল্প অনুভূতি হইতে থাকে। আনন্দের অনুভূতি যতই নিবিড় ও গভীর হয় ইন্দ্রিয়গণ ও মন ততই স্থির হইতে থাকে, অবশেষে আনন্দে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিস্পন্দ হইয়া যায়। এই অবস্থাতেই আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। কারণ তখন আবরণ বিক্ষেপাত্মক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া যায়। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি সর্ব্বপ্রকার গতির বিশ্রামভূমি। কারণ এই আত্মতত্ত্ব পরমানন্দ অমৃত স্বরূপ।

হে নচিকেত, গুরু, আচার্য্য এবং শাস্ত্রের উপদেশ হইতে কেবল পরোক্ষরূপে অমৃতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে। শাস্ত্র পাঠ দ্বারা বাক্য ও পদার্থের জ্ঞান হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর উপলব্ধি হয় না। আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি আপন হৃদয়ে করিতে হইবে। স্বীয় স্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে মন্দিরে, গ্রন্থে, তীর্থে বা কোন প্রতীকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তাঁহাকে আপন হৃদয়েই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হয়। মনুষ্য শরীরই উৎকৃষ্ট মন্দির। মনুষ্যের মনই হইতেছে সমস্ত গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মনুষ্যের হৃদয়ই হইতেছে সমস্ত তীর্থের সার। তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্ব মেতি
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

গৃহ যেমন স্তম্ভকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে মনুষ্যের শরীররূপ গৃহও

সেইরূপ মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই মেরুদণ্ডে হস্ত পদাদির অস্থিসমূহ সন্নিবিষ্ট আছে। হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র এবং মস্তিস্ক এই মেরুদণ্ডে সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। গৃহেতে যেরূপ মৃত্তিকা বা চূণ, ইষ্টক চূর্ণ দ্বারা লেপন করিতে হয় সেইরূপ মৃত্তিকাস্থানীয় মাংস দ্বারা এই শরীররূপ গৃহ লিপ্ত রহিয়াছে। রজ্জুদ্বারা যেরূপ বেষ্টনী বদ্ধ থাকে সেইরূপ নাড়ীসমূহ দ্বারা মাংসাদি শরীরে বদ্ধ রহিয়াছে। শরীরের নাড়ী সমূহের মধ্যে কতকগুলি নাড়ী একত্রিত হইয়া মেরুদণ্ডে বিভিন্ন নাড়ীকেন্দ্র বা নাড়ীচক্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নাড়ী সমূহের মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রধান। এই তিনটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত মূলাধারস্থিত আকাশ হইতে লম্বালম্বি ভাবে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রার ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। নাড়ী বলিতে বিশেষ বিশেষ শক্তিকেই তুমি বুঝিবে। নাড়ীসমূহ শক্তির উপলক্ষণ মাত্র। শক্তিকে দেখা যায় না। সেইজন্য স্থূল নাড়ীদ্বারা বিভিন্ন শক্তিকে উপলক্ষিত করা হয় মাত্র। বিভিন্ন নাড়ীকেন্দ্রে বা চক্রে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। নাড়ী সমূহে অবস্থিত এই শক্তি বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। স্থূলদেহে অবস্থিত নাড়ী চক্রের অনুরূপ সূক্ষ্ম শক্তিকেন্দ্র মানবের সূক্ষ্মদেহে বিদ্যমান আছে। স্থূল দেহের বিশেষ বিশেষ নাড়ীকেন্দ্রে ধ্যান করিলে সেই সেই কেন্দ্রের অনুরূপ সূক্ষ্মদেহস্থ বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র সমূহ স্পন্দিত হইতে থাকে এবং সেই স্পন্দিত শক্তিকেন্দ্র সমূহ অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া নিখিল বিশ্বময় হইয়া পড়ে; এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে বিশ্বজনীন ভাবের উন্মেষ করিয়া থাকে। যে শক্তি সুষুম্না নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রকে ভেদ করিয়া উর্দ্ধগামিনী, উহা পরাশক্তি নামে অভিহিত। সুষুম্না নাড়ীতে ধ্যান করিলে মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম আকাশ স্পন্দিত হয়। তখন এই পরাশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এই পরাশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বীতস্পৃহ আত্মকাম

শমদমাদি গুণ সম্পন্ন মুমুক্ষু মানব অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা
যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র
ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, লজ্জা, ভয়, মান, অপমান, ইত্যাদি চিত্তেরই ধর্ম। উহারা আত্মার ধর্ম নহে। অজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বিষয়ক ভ্রান্ত জ্ঞানদ্বারাই উক্ত গুণ বা ধর্মসমূহ আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র। হৃদয়স্থ কামনাসমূহ যখন শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে ঈশ্বরোপাসনা এবং আত্মস্বরূপের মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম মুমুক্ষু মানব উক্ত কামনাসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয় তখনই এই দেহে এই জন্মেই স্বীয় অমৃতস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অজর, অমর, অশোক ও অভয় পদ লাভ করে। তখন তাহার ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি অর্থাৎ অহং-উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যের সহিত জড়, অবিদ্যার বন্ধনরূপ চিজ্জড় গ্রন্থিসমূহ, প্রারব্ধ, সঞ্চিত, ক্রিয়মান এবং আগামি কর্ম্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মানব চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে অবস্থান করে। সেইজন্য তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিখিল বিশ্ববাসীকে পুনঃ পুনঃ এই অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান

করিতেছি। কামনা বিহীন নির্মল হৃদয়েই অমৃতস্বরূপ এই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ইহাই হইতেছে ঋষিদিগের এবং সমগ্র বেদের উপদেশ। নিখিল জগতের স্বরূপ সচ্চিৎ-সুখাত্মক আত্মা সতত মানবহৃদয়ে বিদ্যমান। পুত্র, বিত্ত এবং স্বীয় কলত্রাদি হইতেও প্রিয়তম, অতি নিকটতম অমৃতস্বরূপ এই আত্মাকে অবগত হও।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা,
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥

মনুষ্যের নির্মল হৃদয় হইতেছে আত্মোপলব্ধির উৎকৃষ্ট স্থান। মনীষিগণ এইজন্য বলিয়া থাকেন "হৃদ্ + অয়ম্ = হৃদয়ম্"। অয়ম্ অর্থাৎ সতত অপরোক্ষ এই আত্মা হৃদয়। হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমান বলিয়া হৃদয় দ্বারা উপলক্ষিত, হৃদয়াকাশস্থিত নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশ অনন্ত। উহা দেহ পরিচ্ছিন্ন নহে। সুষুম্নায় ধ্যান করিতে করিতে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যান করিতে করিতে এই অনন্ত হৃদয়াকাশ অভিব্যক্ত হয়। তখন সাধকের মন ও পরিচ্ছিন্নভাব বিমুক্ত হইয়া দিব্যমনে পরিণত হয়। সেই সময় এই দিব্যমনে পরমানন্দের অনুভূতি হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সাধকের দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের পরিচ্ছিন্নত্ব বিদূরিত হইতে থাকে। অনন্তর তাঁহার দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের যোগ্যতালাভ করে। দেহ-ত্রয়ে আর আত্মাভিমান থাকে না, তখন উপলব্ধি হয়, হৃদয়াকাশাস্থিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বান্তর। 'জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি হইতে পৃথক,

দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, অবিপরিলুপ্তচৈতন্যমাত্রস্বরূপ সর্ব্বান্তর একমাত্র আত্মাই বিভাত হইতেছেন, আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। এই চৈতন্যস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ আত্মাকে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত উপলব্ধি করিতে হইবে। গুরু ও আচার্য্য উপদিষ্ট পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে জন্ম জন্মান্তরের এবং বর্ত্তমান জন্মের গুণকর্ম্মজনিত নানাবিধ সংস্কার সাধন পথের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া থাকে। এই সংস্কারসমূহ চিত্তে উত্থিত হইয়া সাধককে সাধনাভ্রষ্ট করিয়া দেয়। সাধনপথে একবার, দুইবার পদস্খলন হইলেও নিরাশ হইতে নাই। মুঞ্জা-তৃণের মধ্যভাগস্থিত অতিশয় কোমল শলাকারূপ তৃণটীকে যেরূপ অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে হয় সেইরূপ অভ্যাস, বৈরাগ্য, বিবেক, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, বিচার, পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্বের মনন এবং শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভক্তির সহিত অভেদে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা, অতিশয় ধৈর্য্য ও নিপুণতার সহিত দেহত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, দেহত্রয়ের প্রকাশক, অমৃতস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

হে নচিকেত, তোমাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিলাম। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে তোমার বিবেকবৈরাগ্যপূত চিত্ত আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বে লীন হইয়া যাইতেছে। তুমি শীঘ্রই স্বীয় অমৃতস্বরূপে অবস্থান করিবে। তোমার ন্যায় বিবেকবৈরাগ্যবান্ আত্মকাম মুমুক্ষু যে কোন মনুষ্যই গুরুপরম্পরাগত এই বৈদিক পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন পথে স্থিরচিত্তে অগ্রসর হইবে সেই ব্যক্তিই স্বীয় স্বরূপ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, অজর, অমর, অভয়, অশোক, অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া এই দেহে, এই জন্মেই কৃতকৃত্য হইবে। তোমার সাধনপথে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক উপশান্ত হউক। নিখিল বিশ্ববাসী তাপত্রয় বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দে তৃপ্তিলাভ করুক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট

আমার অতি প্রিয়তম বাংলার বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণ, আমি তোমাদের জন্য "উপনিষদের কথা" আরম্ভ করিয়াছি। পৃথিবীতে যত কিছু ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, যত কিছু দার্শনিক এবং অধ্যাত্ম বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে সেই সমুদয় গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেছে উপনিষদ্। তোমরা সকলেই বর্ত্তমানে স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী ; আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—"তোমরা স্বাধীনতা চাও কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তর বৈদিক ঋষিগণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "স্বাধীনতায় আমার স্বরূপ, সেইজন্য আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বাধীনতা লাভের অদম্য অভীপ্সা উত্থীত হইতেছে। আমি স্বয়ং স্বরাট বলিয়া দেহের, ইন্দ্রিয়ের, অন্তঃকরণের কামক্রোধাদি রিপুর অধীনে থাকিতে চাহি না। আমি ক্ষুদ্র দেহ পরিচ্ছিন্ন নহি। আমি অনন্ত, নিত্য অবিকারী, আদিহীন, নিখিল জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ, অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্, সচ্চিৎ-সুখাত্মক সর্ব্বান্তর, আমার সত্তায় ও প্রকাশে, নিখিল জগৎ সত্যবৎ প্রতীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। আমি অমৃতস্বরূপ ; সেইজন্য আমি জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে চাহি না, মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে আমি সতত অভিলাষী। নিত্য পরমানন্দই আমার স্বরূপ, সেইজন্য আমি দুঃখ চাহি না, দুঃখের আত্যান্তিক নিবৃত্তিসাধন করিতেই আমি সতত প্রয়াসী।"

তোমরা সকলে স্বাধীন হও, শক্তিমান হও এবং তোমাদের দেশবাসীকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিয়া তোলো।

তোমাদের শুভাকাঙ্খী

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি।